"নিশ্চয় এই ইলম হচ্ছে দ্বীন। তাই তোমাদের দ্বীন কার কাছ থেকে শিখ
তাকে আগে দেখে নাও।" (সহিহ মুসলিম, ১/১৪ পৃ.)

ডাক্তার জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন

(১ম খণ্ড)

গ্রন্থনা ও সংকল
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদ

Click here

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

ডা.জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন

(প্রথম খণ্ড)

কৈফিয়ত ঃ ডাক্তার জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ মুসলমানগণ যেন তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করেন এবং তার বিভ্রান্তি মূলক বক্তব্যগুলোর পরিচয় ও খণ্ডন জানতে পারেন, সে জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা।

অনুরোধ ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ বইটি পড়ুন এবং একটু চিন্তা করে দেখুন, কার বক্তব্য পবিত্র কোরআন-হাদিসের আলোকে সঠিক ও যুক্তি পূর্ণ বলে মনে হয়। অনুরূপ মনবল নিয়ে সম্পূর্ণ বইটি পড়ুন ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

পরিবেশনায়

ইমাম আযম (রহঃ) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

facebook// পেইজ ঃ ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার

ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন
গ্রন্থনা ও সংকলনে ঃ
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
প্রতিষ্ঠাতা, ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩-৯৩৩৩৯৬
সম্পাদনা পরিষদ ঃ
মুফতি মুহাম্মদ আলী আকবার
ইসলামী বহু গ্রন্থ প্রণেতা।
মুফতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী
ইসলামী বহু গ্রন্থ প্রণেতা।
নিরীক্ষণে ঃ
মুফতি কাযি আব্দুল ওয়াজেদ (মা. জি. আ)
ফকিহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রথম প্রকাশ ঃ
৮ই জানুয়ারী, ২০১৬ইং, রোজ, শুক্রবার।
পরিবেশনায় ঃ ইমাম আযম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
কম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণ বিন্যাস ঃ
মুহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ (আক্কাস)
মোবাইল ঃ ০১৮১১৩৫৫৯৬০
শুভেচ্ছা হাদিয়া ৩২০/= টাকা

যোগাযোগ ঃ দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ- মোবাইল ঃ ০১৮৪২- ৯৩৩৩৯৬

উৎসর্গ

শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নুরুল ইসলাম ফারুকী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর শ্রদ্ধায়।

হৃদয়ে গাঁথা নাম

*সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

কে বলেছে
ফারুকী মরেছে!
মাওলানা ! না না না
মরে নাই, মরে নাই,
লাখো শত হৃদয়ে
হয়েছে তাঁহার ঠাঁই।
তারাই তো মরেছে
যে বা যারা করেছে
নৃশংস নির্মম
ঘটনা এমন
কি বলে নিন্দা
করা যায় তাদেরে
শত ঘৃণা, ধিক্কার
তাহাদের তরে।
পশুতুল্য করলে হবে
পশুর অপমান,
পশুও চিনে রাসূল প্রেমিক
আছে তার প্রমাণ।
আর ওরা! ওরা নরাধম
পাপিষ্ঠ, ঘৃণ্য, জঘন্য

আর ফারুকী
জগৎ বরেণ্য ।
মরিয়া ফারুকী
হয়েছে অমর,
জিন্দাবস্থায়ই বুঝি
পাপিষ্ঠদের কবর ।
পেরেছিস কি অবিশ্বাসী
মুছে দিতে প্রিয় নাম?
নিশ্চয় না, রবে তাঁর নাম
বাংলার বুকে চির বহমান ।
আর তাই মোরা দেখি
প্রিয় মুখ ফারুকী,
প্রেমিক প্রাণের স্পন্দনে
বাংলার প্রতি গৃহকোণে
উচ্চারিত হচ্ছে নাম
শায়খ নুরুল ইসলাম ।
লাখো প্রেমিকের
হৃদয়ের স্পন্দন,
ধন্য ধন্য ফারুকী
ধন্য তব জীবন ।
সুন্নিয়তের তরে
তোমার অবদান,
ভুলবেনা কোন দিন
বাংলার মুসলমান ।
স্মরণে রবে তুমি
কভু হারাবেনা,
সালাম তোমায়
হে প্রিয় মাওলানা ।

------ o -----

সূচীপত্র

*অবতরণিকা/১১-১৩

ক. প্রথম অধ্যায় ঃ ডা. জাকির নায়েকের পরিচয় পর্ব-

১. কেন লিখলাম ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে?/১৪
২. যে কোন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানে অসতর্কতাই তার পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল কারণ/১৫
৩. কে এই ডা. জাকির নায়েক?/২৭
৪. জাকির নায়েকের উত্থানের মূলে কী?/২৮
৫. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্রের পরিচয়/২৯
৬. ডা. জাকির নায়েক কাদের অনুসারী?/২৯
৭. জাকির নায়েক হানাফী মাযহাবকে খৃষ্টান ধর্মের সাথে তুলনা/৩৩
৮. জাকির নায়েকের মাযহাবের ইমাম শায়খ আলবানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়/৩৫
৯. আলবানী কর্তৃক ইমাম তিরমিযির সমালোচনা/৩৭
১০. আলবানী কর্তৃক ইবনে কাসিরের সমালোচনা/৩৮
১১. আলবানী কর্তক আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সমালোচনা/৪০
১২. আলবানী কর্তৃক ইমাম যাহাবী, মুনযিরী, হাকিম নিশাপুরীর সমালোচনা/৪৩
১৩. আলবানী কর্তৃক ইমাম সুয়ূতীর এবং ইমাম সুবকির সমালোচনা/৪২
১৪. আলবানীর এরূপ সমালোচনার কারণ উল্লেখ করেন শায়খ আজমী/৪৪-৪৫
১৫. আলবানীর খণ্ডনে পৃথিবীর বিজ্ঞ আলেমদের গ্রন্থাবলী/৪৫-৪৬
১৬. জাকির নায়েক আহলে হাদিস হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ/৪৭
১৭. জাকির নায়েকের আসল ব্যাপারটা কী/৪৭
১৮. ডা. জাকির নায়েক সালাফী ও মওদুদীদের বন্ধু/৪৭
১৯. কেন জাকির নায়েকের কথা অনুসরণ করা যাবে না/৪৮

খ. দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এক নজরে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ-

১. শিয়া সুন্নিদের পার্থক্য রাজনৈতিক বলে ভ্রান্ত মতবাদ/৫০

২. আল্লাহকে ব্রাহ্ম, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে ডাকা যাবে বলে মন্তব্য/৫২
৩. চারজন মহিলা নবি এসেছিলেন বলে উক্তি/৫৪
৪. রাম ও কৃষ্ণ নবী হতে পারেন বলে উক্তি/৫৫
৫. হিন্দুদের দেবতা শ্রী কৃষ্ণের নামের পূর্বে ভগবান বলা/৫৬
৬. হিন্দুদের বেদ আল্লাহর বাণী হতে পারে বলে ভ্রান্ত মতবাদ/৫৬
৭. ডা. জাকির নায়েকের হিন্দু ধর্মের দালালীর নমুনা/৫৭
৮. ডা. জাকির নায়েকের বৌদ্ধ ধর্মের দালালীর নমুনা/৫৮
৯. উপরোক্ত এসব বক্তব্যে ইসলামের কী উপকার করলেন?/৫৮
১০. আমার বক্তব্য হলো যা..../৫৮
১১. জাকির নায়েকের যার যে কোনো ধর্ম পালনের ভ্রান্ত থিউরি/৫৯
১২. সকল ধর্মের সাদৃশ্য পালনে ডাক্তার জাকির নায়েকের মতবাদ/৫৯
১৩. সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনার অভিযোগ/৬২
১৪. আদম ও হাওয়া থেকে মানুষের সৃষ্টি বিষয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/৬৫
১৫. পবিত্র কুরআনে ভুল আছে বলে মন্তব্য/৬৩
১৬. ডা. জাকির নায়েক টিভিকে দাজ্জাল বলে ধূম্রজাল সৃষ্টি/৬৫
১৭. আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ সম্পর্কে নতুন ধর্মমতের থিউরি/৬৬
১৮. রাসূল (ﷺ)-এর সাথে মিডিয়াকে জড়িয়ে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত থিউরি/৬৯
১৯. সাহাবীগণের বায়াত প্রসঙ্গে ভ্রান্ত মতবাদ/৬৯
২০. অমুসলিমদের সালাম দেয়ার ব্যাপারে ভ্রান্ত মতবাদ/৭০
২১. ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে হিন্দু বলে ঘোষণার দুঃসাহস/৭২
২২. 'ক্বালব' এর অর্থ প্রসঙ্গে তার ভ্রান্ত মতবাদ/৭৩
২৩. মহিলাদের হায়েজ অবস্থায় কুরআন পড়া সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ/৭৪
২৪. নামাজের আদায়ের গ্রহণযোগ্য পোষাক নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/৭৭
২৫. খৃষ্টানদের 'টাই' সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ/৭৭
২৬. ডা. জাকির নায়েকের মুখে টাই পড়ার ইতিহাস/৭৮
২৭. কুরআন শরীফ স্পর্শ করার ক্ষেত্রে পবিত্রতা লাগে না বলে ভ্রান্ত মতবাদ/৭৯

২৮. সুবহে সাদিক হলেও সাহরী খাওয়ার বিষয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/৮১
২৯. তারাবীর নামায সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ/৮২
৩০. ঈদের নামায পড়লে জুমু'আর নামায পড়া লাগে না বলে ভ্রান্ত মতবাদ/৮৩
৩১. এক সঙ্গে তিন তালাকের হুকুমে ভ্রান্ত মতবাদ/৮৫
৩২. দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে পানাহারের ব্যাপারে এবং হাদিসের অর্থ বিকৃতি/৯১
৩৩. ইসলামে নারী ও পুরুষের সাক্ষ্যের ব্যবধানের বিষয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/৯৩
৩৪. নামাযকে ব্যায়ামের সাথে তুলনার ধৃষ্টতা/৯৪
৩৫. আযানকে মুসলমানদের জাতীয় সঙ্গীত বলে ভ্রান্ত মতবাদ/৯৫
৩৬. আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে জাকির নায়েকের আরেকটি ভ্রান্ত মতবাদ/৯৫
৩৭. 'আল্লাহ মানুষ হতে পারেন' বলে ধারণার বিষয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/৯৬
৩৮. যে কোন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে আলেম বলে ভ্রান্ত মতবাদ/৯৭
৩৯. প্রত্যেক ব্যক্তির ফতোওয়া দেয়ার অধিকার দেখিয়ে বিভ্রান্তি/৯৭
৪০. নারী-পুরুষ সবার মসজিদে ই'তিকাফ বৈধ বলে ভ্রান্ত মতবাদ/৯৯
৪১. রোযার কাফ্ফারা নির্ণয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১০০
৪২. ফিতরা নিয়ে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ/১০১
৪৩. নারী, শিশু সবার ঈদের নামায পড়া নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১০২
৪৪. ঈদের নামাযের তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১০৫
৪৫. জুমু'আর খুতবা যে কোন ভাষায় দেয়া যাবে বলে ভ্রান্ত মতবাদ/১০৭
৪৬. সফরে পাঁচ ওয়াক্তে নামায তিন ওয়াক্তে পড়া নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১১০
৪৭. কুরআনের দিকে পিঠ করে বসা নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১১২
৪৮. কুরআন খতম পড়া নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১১৩
৪৯. দু'আর পর মুখে হস্তদ্বয় বুলানো বিদ'আত বলে ভ্রান্ত মতবাদ/১১৪
৫০. জামা'আতবদ্ধভাবে জিকির করা নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১১৭
৫১. মায়ের গর্ভে কী আছে তা সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ/১১৭
৫২. মুরতাদের শাস্তির হুকুমের আয়াত ডাকাতির ও সন্ত্রাসের শাস্তি বলে চলিয়ে দিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ/১১৮

৫৩. কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অপব্যাখ্যা/১১৯
৫৪. সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করা প্রসঙ্গে ভ্রান্ত মতবাদ/১১৯
৫৫. রাসূল (ﷺ) কি নিরক্ষর বা মূর্খ ছিলেন বলে ভ্রান্ত মতবাদ/১২৩
৫৬. হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের ঘটনার সাথে পবিত্র কুরআনের তুলনা/১২৫
৫৭. মহিলাদের মুখ খোলার বিষয়ে ভুয়া ফাতওয়া/১২৫
৫৮. নবীজির যুগে মিথ্যা প্রচারণায় ইসলামের লাভ হয়েছিল বলে ভ্রান্ত মতবাদ/১২৮

গ. তৃতীয় অধ্যায় ঃ মাযহাবের নিন্দায় তার বিভিন্ন বক্তব্যের খণ্ডন

১. চার মাযহাব মানা কী প্রচলিত ভুল ধারণা?/১২৮
২. জাকির নায়েকের এক মুখে দুরকম কথা; লক্ষণে তো মুনাফিক ছাড়াই কিছুই বুঝা যায় না/১৩৪
৩. চার মাযহাব কী কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত?/১৩৪
৪. আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পরিচয়/১৪২
৫. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে অনুসরণের মূলনীতি/১৫১
৬. চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ কি ভুল ফাতওয়া দিয়েছেন?/১৫১
৭. চার মাযহাবের ইমামদের থেকে বড় মুজতাহিদ হওয়ার দাবীর ধৃষ্টতা/১৫৩
৮. চার মাযহাবের ইমামদের থেকে কি আলবানী বড় ইমাম হয়ে গেলেন?/১৫৩
৯. চার মাযহাবের ইমামদের ভুল ধরার নব কৌশল/১৫৩
১০. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ)'র ভুল সিদ্ধান্ত/১৫৩
১১. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)'র ভুল সিদ্ধান্ত/১৫৫
১২. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম মালেকের (রহিমাহুল্লাহ)'র ভুল সিদ্ধান্ত/১৫৬
১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ কি ভুল?/১৫৬
১৪. মাযহাবের ভুল সংজ্ঞা/১৫৭
১৫. ইমামদের ইখতিলাফ বা মতভেদকে নিষিদ্ধ দল সৃষ্টির সাথে তুলনা/১৬৭
১৬. চার মাযহাব কী কুরুনে সালাসা ও কুরআন সুন্নাহের বাহিরে?১৭৯
১৭. জাকির নায়েকের ভুয়া দাবী শুধু চার মাযহাব মানব কেন?১৮৫

১৮. অধিকাংশ মুসলমান কি মাযহাব মেনে গোমরাহী বা ভুল পথে রয়েছেন?/১৮৯
১৯. ডা. সাহেবের দেয়া স্বীকৃত সঠিক দল আহলে হাদিসেরাও অনেক দলে বিভক্ত/১৯০
২০. জাকির নায়েকের এ জ্ঞান যোগ্যতা নিয়েই বড়াই/১৯১
২১. তার জঘন্য উক্তি এক মিলিয়ন হাদিস এক ডিস্কে পাওয়া যায় তাই মাযহাব মানার প্রয়োজন নেই/ ১৯১
২২. আমাদের নবী কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? প্রশ্ন করে বিভ্রান্তি?১৯৭
২৩. প্রত্যেক ইমামই তাদের অনুসারীদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এ বক্তব্যটি কাদের উদ্দেশ্যে বলা?/১৯৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ এক নজরে তার বিভিন্ন হাদিস বিকৃতি ও ভুল ফাতওয়া ঃ

১. নামাযের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ/২২৪
২. নামাযে শয়তানের উপস্থিতির হাদিসকে অপব্যাখ্যা/২২৪
৩. বাইবেল, গীতা, রামায়ণ, বেদ ইত্যাদি পড়া কি মুস্তাহাব?/২২৫
৪. ডা. জাকির নায়েকের বাইবেল, গীতা, রামায়ণ, বেদ ইত্যাদি পড়ার উপদেশ/২২৫
৫. মুসলমান কি শুধু 'হাদিসে সহিহ' ই অনুসরণ করবে?/২২৬
৬. নবির হাদিস কত প্রকার?/২২৭
৭. রাসূল (ﷺ) কে মানা কী আমাদের জন্য হারাম?/২২৯
৮. দাড়ি রাখা কি ফিকহী সুন্নাত?/২৩০
৯. ডা. জাকির নায়েক হায়াতুন্নবী (ﷺ) সংক্রান্ত আক্বিদা অস্বীকার/২৩০
১০. শহীদগণ জীবিত থাকার বিষয় অস্বীকার/২৩১
১১. হায়াতুন্নবী (ﷺ) অস্বীকারকারী ইসলামের দৃষ্টিতে কী?/২৩৫
১২. পুরুষদের একাধিক বিবাহ কি মহিলাদের বেশ্যা হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য?/২৩৫
১৩. রাসূল (ﷺ) কি অধিক বিবাহ করেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে?/২৩৫
১৪. কুরআন কী উচ্চ মানের আরবী বই?/২৩৬
১৫. কাফির ইয়াযিদের প্রসংশায় **"রহমতুল্লাহি আলাইহি"** বলেছেন জাকির নায়েক/২৩৬

১৬. ডা. জাকির নায়েকের সমাবেশে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার/২৪৭
১৭. মি.প্যাষ্টর রুকনি এর ভ্রান্ত বক্তব্যকে মৌন সমর্থন/২৪৮
১৮. মি. প্যষ্টর রুকনি বনী ইসরাঈলের কাহিনী বলেন/২৪৯
১৯. জাকির নায়েক কে দিয়ে খৃষ্টানদের সূক্ষ ষড়যন্ত্র/২৫১
২০. ডা. জাকির নায়েকের সমাবেশে হিন্দু ধর্মের প্রচারের নমুনা/২৫৩
২১. হিন্দু পণ্ডিত খুশি হয়ে যা বললেন?/২৫৩
২২. ইসলাম প্রচারে ডা. জাকির নায়েকের ভুল তরীকা/২৫৪
২৩. মহিলা ও পুরুষের নামাযে ব্যবধান নেই বলে ভ্রান্ত মতবাদ/২৫৬
২৪. পুরুষের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ শরীয়তে কী বলে?/২৬২
২৫. প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসী হতে আহবান করেছেন ডা. জাকির নায়েক/২৬৬
২৬. নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদিস নিয়ে তার বিভ্রান্তি/২৭১
২৭. তাক্বলীদ কী শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য?/২৮১
২৮. চার মাযহাবকে বিকৃত খৃষ্টান ধর্মের সাথে তুলনা/২৮১
২৯. কুরআনের আয়াতে অর্থ বিকৃতি নারী-পুরুষ সমানাধিকার ও ভুয়া রেফারেন্স/২৮২
৩০. তারাবিহ নামায কী যত খুশি পড়া যায়?/২৮৫
৩১. তারাবিহ নামাযে খতমে কুরআন প্রসঙ্গে ভ্রান্ত মতবাদ/২৮৬
৩২. জান্নাতে হুর পুরুষও হতে পারে বলে ভ্রান্ত মতবাদ/২৮৭
৩৩. মক্কা ও মদিনাকে ক্যান্টনমেন্টের সাথে তুলনা/২৯০
৩৪. দাড়ির পরিমাণ নির্ণয়ে মনগড়া সিদ্ধান্ত এবং হাদিসের মনগড়া অনুবাদ ও কারচুপি/২৯০
৩৫. শ্রীলংকায় বাহাসে না পেরে জাকির নায়েকের পলায়ন/২৯২
৩৬. ডা. জাকির নায়েকের উপরে কি কুফরের ফাতওয়া দেয়া যায়?/২৯২
৩৭. বিভিন্ন স্থান হতে ডা. জাকির নায়েকের উপরে কাফির ফাতওয়া/২৯৩
৩৮. উপরের সমস্ত আলোচনায় যা বুঝলাম এ যুগের ভয়ঙ্কর ফিতনাবাজ ডা. জাকির নায়েক/২৯৭
৩৯. ডা. জাকির নায়েকের গোমরাহী থেকে দেশকে বাঁচাতে তার পিস টিভি ও তার লেকচারের সকল ধরনের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা সময়ের দাবী/২৯৮
৪০. তথ্যপুঞ্জি/২৯৯

অবতরণিকা.....

প্রায় দেড় হাজার বছর গত হয়ে গেল ইসলাম ধর্ম এ পৃথিবীতে এসেছে। এর মধ্যে অনেক বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে এ পবিত্র ধর্মকে। হুযুর (ﷺ)'র সুশোভিত এ উদ্যানের উপর দিয়ে অনেক প্রলয়ঙ্করী ঝড়-তুফান বয়ে গেছে। কিন্তু খোদার লাখো শুকরিয়া যে, এ বাগান পূর্ববৎ সজীব ও প্রাণবন্ত রয়েছে। এ ধর্ম কখনো কুখ্যাত ইয়াযিদের শাসনামলে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে, কখনও হাজ্জাজের আমলের নির্যাতনে ধূলিধূসরিত হয়েছে, কখনো খলিফা মামুনের আমলে বাতিলপন্থীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে, আবার কখনও তাতারীগণ বীর-বিক্রমে এর উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, কখনও খারেজীগণ এর মোকাবেলা করেছে, রাফেজীরাও একে সমূলে বিনাশ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে আহলে হাদিসসহ বিভিন্ন ফিতনাও ইসলামকে বিনাশ সাধনের জন্য ইসলামকে কেচি দ্বারা শর্ট প্যান্টের মত ছোট করা শুরু করেছে। কিন্তু ইসলাম এমন এক পাহাড়, যার সম্মুখে কোন শক্তিই টিকে থাকতে পারেনি। এটা যেমনি ছিল তেমনি মজবুত রয়েছে।

আর যতগুলো বাতিল দলই উদ্ভাব হোক না কেন সকল বাতিল মতবাদের মুখোশ উন্মোচনে তার থেকে একটি হকপন্থি সত্যান্বষী দল কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, যারা রাসূল (ﷺ) এবং তার সাহাবিদের এবং সালফে সালেহীনের আক্বিদা, আমল, মত এবং পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সে দলের নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

এ বিষয়ে হযরত ইবনে আমর (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- "আমার উম্মতের যে সমস্ত জিনিসের আবির্ভাব ঘটবে, যা বনী ইসরাইলের মধ্যেও ছিল, দুটি জুতার একটি অপরটির সাথে যেমন মিল রাখে। এমনকি বনী ইসরাইলের কেউ যদি প্রকাশ্যে মায়ের সাথে যিনা করে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে তা করবে। নিশ্চয় বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতীত। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, তারা কারা? রাসূল (ﷺ) উত্তর দিলেন, قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وأصحابي -"আমি এবং আমার সাহাবার আদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"[১] উপরের এ হাদিসের ব্যাখ্যায় সর্বজন গৃহীত

১ .খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬১পৃ. কিতাবুল ই'তিসাম বিস্-সুন্নাহ, হাদিস নং.১৬১, তিরমিযি, আস্-সুনান, ৫/২৬পৃ. হাদিস, ২৬৪১, আহলে হাদিস আলবানী সুনানে তিরমিযির তাহক্বীকে হাদিসটি 'হাসান' বলেছেন, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/৩০পৃ. হাদিস, ৬২, ১৪/৫২পৃ. হাদিস,

মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং আহলে হাদিস আলেমগণও বলেছেন নাজাত প্রাপ্ত দলটিই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত; এ বিষয়ে বিস্তারিত উক্ত কিতাবেই আলোকপাত করা হয়েছে দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।[২]

মুসলমানদের এই ক্রান্তিলগ্নে মাযহাবের উপর আলোচনা একটি গৌণ বিষয়। মুসলমানদের মাঝে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হক্ব বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানো কোনোভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানদেরই একটা শ্রেণী এই অপচেষ্টায় তৎপর। এরা লা-মাযহাবী নামে পরিচিত।

এরা সর্বসাধারণের মাঝে চার মাযহাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অমূলক উক্তি ও প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে থাকে। তারা অনেক আক্বিদা ও কিছু কিছু শাখাগত মাস'আলা নিয়ে অযৌক্তিক বিতর্ক সৃষ্টি করে ফিতনার জন্ম দেয় এবং সাধারণ মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহের বীজ বপন করে। এদের যুক্তি হলো, "এক কুরআন, এক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তবে চার মাযহাব মানব কেন ? কিন্তু তাদের এ স্লোগান মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের মাঝেও আক্বিদা থেকে শুরু করে শাখাগত অসংখ্য বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, "স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবৃত্তিপূজার" কারণে তাদের এক দলই আরেক দলকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি বলে থাকে যার আলোচনা সামনে আসছে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ বারশ বছর যাবৎ মুসলমান উম্মাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে চার মাযহাবের উপর আমল করা সত্ত্বেও তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, ঐক্য ও সংহতি বজায় রয়েছে। অন্যকে বাতিল বলা তো দূরে থাক, অন্য মাযহাবের কারও প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব রাখার বিষয়টিকেও নিন্দনীয় মনে করা হয় এবং প্রত্যেক মাযহাবের ইমামগণও তাদের অনুসারীদেরকে যারপরনাই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় হলো ডা. জাকির নায়েক সেই ভ্রান্ত আহলে হাদিসদের অনুসারী।[৩] ডা. সাহেব বিভিন্ন ধর্ম তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আর তাতেই যদি তিনি সিমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে আর কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কোন আকায়েদ এবং ফিকহের মাস'আলা বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করায় তাহার উচিত ছিল আলেমদের উপর তাহা অর্পন করা। আর তা না করে তিনি মুফাস্সির, মুফতি কিংবা

১৪৬৪৬, মাকতুবাতু ইবনে তাইমিয়া, কাহেরা, মিশর, প্রকাশ.১৪১৫হি. বায়হাকি, ই'তিক্বাদ, ১/২৩৩পৃ. বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২১৩পৃ. হাদিস, ১০৪

২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত **"আকায়েদে আহলে সুন্নাহ"** দেখুন।

৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত **"আহলে হাদিসদের মুখোশ উন্মোচন"** অথবা "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন ২য় খণ্ড" দেখুন।

মুহাদ্দিস না হয়ে যখন ফাতওয়া দেয়া শুরু করলেন এবং চার মাযহাবের ইমামদের কারও মতের প্রতি তোয়াক্কা না করে তিনি ইবনে তাইমিয়া, আলবানী, ইবনে বায, উছাইমিনের ফাতওয়ার উপরে রায় বা মত প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তার বুঝার উচিত ছিল যে, ডাক্তারী বই পড়ে যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না তেমনিভাবে ইসলামী কিছু অনুবাদিত বই পড়ে আলেম হওয়া যায় না। তার এ মিশনের এক মাত্র উদ্দেশ্য হল একটিই তা হল আহলে হাদিসদের বাতিল আক্বিদা ও মতবাদ প্রচার।

আহলে হাদিস ডা. জাকির নায়েকের সে সব বিভ্রান্তি থেকে সহজ সরল মুসলমানের সতর্কতার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্রপ্রয়াস। পুস্তকের নামকরণ করেছি **"ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন"**। এটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত করবো বলে আমি আশাবাদী। এখানে আমি ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য প্রথমে উল্লেখ করেছি; তারপর আমি কুরআন সুন্নাহে এবং বিজ্ঞ ইমাম ওলামাগণ এ বিষয়ে কী বলেছেন তা উল্লেখ করেছি। এখন আধুনিক যুগ সত্য মিথ্যা যাচাই করা একদমই সহজ। আমি জাকির নায়েকের যে লেকচার থেকে ডকুমেন্ট দিয়েছি তার অধিকাংশ ভিডিও ক্লিপ আমার কাছে মওজুদ আছে। আর এ ভিডিওর অধিকাংশই তার সিডি ক্যাসেট ও ইউটিউব থেকে নেয়া। **আপনারা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে যেকোনো মুহূর্তে আমার রিসার্চ সেন্টারের যেকোনো সদস্য আপনাদের কাছে সত্য প্রকাশের স্বার্থে আপনাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেবেন ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার আকুল আবেদন থাকবে আপনারা যাচাই না করে আমার বিষয়ে মন্তব্য করবেন না। যাচাই করতে ব্যর্থ হলে কিতাবটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠার যোগাযোগের ঠিকানার সে নাম্বারটিতে ফোন করুন।**

গ্রন্থাকারে রূপদেয়ার পর বইজুড়ে অনুপম নজর দিয়ে আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন, মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবায়ের রযভী, **মাওলানা হাফেজ জাবের আল-মানছুর মোল্লা**, মাওলানা ক্বারী গোলাম কিবরিয়া এবং মাওলানা ইকবাল হোসাইন আল-কাদেরী। বইয়ের বাংলা বানান সংশোধনীতে কৃতার্থ করেছে, বি. জেনারেল খোরশিদ আলম ও মুহাম্মদ মাহবুব আলম মজুমদার।

প্রিয় পাঠক মহল! নাতিদীর্ঘ এই পুস্তক পরোপুরি পড়ে বিবেকের আদালতে মুখোমুখি হবেন। এতে আপনার অন্তর চক্ষু খুলে যাবে, ইনশাআল্লাহ! সফলতার মুখ দেখবে আমার পরিশ্রম।

অধম রচয়িতা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

তারিখ.১.০১.১৬ইং

প্রথম অধ্যায় ঃ ডাক্তার জাকির নায়েকের পরিচয় পর্ব

১. কেন লিখলাম ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে ?

এক সময় অনেক মানুষ ডা. জাকির নায়েকের লেকচার শুনার জন্য বসে থাকতো। কেননা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের উপর ডা. জাকির নায়েক বর্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। দুঃখজনক হলো, বর্তমানে ডা. জাকির নায়েক তার দাওয়াতের ক্ষেত্রেও পরিমণ্ডল অতিক্রম করেছেন। তিনি মুফতি, মুহাদ্দিস কিংবা মুফাস্‌সির নন। মাস'আলা-মাসায়েল বা ফতওয়া প্রদানের যোগ্য না হয়ে কারো জন্য এ পথে অগ্রসর হওয়াটা কখনও যৌক্তিক হতে পারে না। তিনি যদি নিজেকে ইসলামের একজন সত্যিকার দাঈ মনে করতেন তার উচিত ছিল কঠিন কোন মাস'আলার মনগড়া ব্যাখ্যা না দিয়ে বিজ্ঞ উলামাদের কাছে সে বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া। এটিই ছিল সকল উলামাদের রীতিনীতি। কিন্তু তিনি কী করলেন! নিজের ইলমের বাহাদুরী দেখিয়ে বললেন-"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যথেষ্ট যুক্তিবুদ্ধি আমাকে দিয়েছেন।"[৪] ডা. জাকির নায়েক বলতে চাচ্ছেন তার জ্ঞান যথেষ্ট হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

প্রকৃতপক্ষে তিনি যেহেতু মাস'আলার সমাধান দেয়ার যোগ্য নন, এ জন্য তিনি সমস্ত মাস'আলা মূলত সালাফী বা আহলে হাদীসদের থেকে নিয়ে থাকেন।

ডা. জাকির নায়েকের যে কোন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানে অসতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন; এটিই তার সমালোচিত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ। ইসলামে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ আমল ফিকহ শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের জন্ম থেকে কবরে দাফনসহ যাবতীয় আমল ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে। ইবাদাত ছাড়াও লেনদেন, ব্যবসা-বানিজ্য, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এককথায় একজন মুসলমানর জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ফিকহ শাস্ত্রের বিষয়গুলো এমন যে **এ ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন ব্যতীত কোনো মতামত দেওয়া নিতান্তই বোকামি।** আর যারা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এ বিষয়ে কোনো মতামত দিতে গেলে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু কোন ফিকহী মাসায়েল বিষয়ক প্রশ্ন ডাক্তার জাকির নায়েকের কাছে আসলে তার অবস্থা দেখুন তিনি কোন মুজতাহিদ

৪ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/১০০পৃ. পিস পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

হবেন তো দূরের কথা ভাল কোন আলেমও নন; তারপরও সে এক মুহূর্ত সময় বিবেচনা এবং সতর্কতা করেন না। সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, চার ইমাম, মুজতাহিদ বিভিন্ন ফকিহগণের অবস্থা দেখুন তারা ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে কিরুপ সতর্কতা অবলম্বন করতেন; আর ডা. জাকির নায়েকের তাদের তুলনায় একজন ক্ষুদ্র মানুষ, অথচ সেই মহান পূর্ববর্তীদের হাজার ভাগের এক ভাগও সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন এজন্যই করতেন কেননা, তাঁরা জানতেন যে আমার নবির মহান বাণী হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَمْرٍ، وَهُوَ يَرَى الرُّشْدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ خَانَهُ

-"যে ব্যক্তি এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি, তবে সে জাহান্নামে নিজের জন্য একটি ঘর তৈরি করল। **আর যাকে ইলম ব্যতিত ফাতওয়া প্রদান করা হলো, এর গোনাহ ফাতওয়া প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে।** আর যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন বিষয়ে পরামর্শ দিল, যার বিপরীত বিষয়ের মাঝে সে কল্যাণ দেখছে, তবে সে তার সাথে প্রতারণা করল।"[৫] আহমদ ইবনে ইউসুফ রুবায়ী সান'আনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন- رواه أحمد وأبو داود، ورجال إسناده أئمة ثقات -"হাদিসটি আবু দাউদ ও আহমদ সংকলন করেছেন আর এ সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[৬] আলবানী সুনানে আবু দাউদের তাহকীকে সনদটি 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন।[৭] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন-

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ

৫ . আহমদ ইবনে হাম্বল, ১৪/৩৮৪পৃ. হাদিস নং ৮৭৭৬, আবু দাউদ, আস্-সুনান, ৩/৩২১পৃ. হাদিস নং.৩৬৫৭, ইমাম ইবনুল বার্, জামিউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী, ২/৮৬০পৃ. হাদিস নং ১৬২৫
৬ .সান'আনী, ফতহুল গাফ্‌ফার, ৪/২০৫৬পৃ. হাদিস নং ৫৯৮৪
৭ .আলবানী, সহিহুল সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং.৩৬৫৭

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইলম ব্যতীত মানুষকে ফাতওয়া দিল তার উপর আসমান ও যমিনের সমস্ত ফিরিশতাদের লা'নত বা অভিশাপ।"[৮] দুনিয়া বিখ্যাত ফকিহ[৯] তাবেয়ী ইবনে আবী লাইলা (রহ.) বলেছেন-

قال عبد الرحمن: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة " من الأنصار من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ما أحد منهم يحدث حديثاً إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولايسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

-"তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রহ.) বলেন, আমি এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ১২০ জন আনসারী সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁদের কাউকে যখন কোনো হাদিস এবং ফাতওয়া বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো, প্রত্যেকেই পছন্দ করতেন, তাঁর আরেক ভাই এর উত্তর প্রদানে যথেষ্ট (আমার থেকেও বেশী জ্ঞান রাখেন)।"[১০] তিনি অন্য বর্ণনায় ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) {ওফাত.২০৭হি.} বর্ণনা করেন; সেখানে তিনি এভাবে সংকলন করেন-

عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقَدْ أدركت عشرين ومائة من الأنصار مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم – إذا سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ أَحَبَّ أَنْ يَكْفِيَهُ غيره.

-"ইমাম আতা ইবনে সায়িব (রহ.) বলেন, আমি ইবনে লাইলা (রহ.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি ১২০ জন আনসারী সাহাবীদেরকে সাক্ষাৎ লাভ করেছি তখন দেখেছি তাঁদের নিকট যখন কোন মাস'আলার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত করা

৮ .ইবনুল কাইয়্যিম যওজী, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, ৪/১৬৭পৃ.

৯ . তিনি কত বড় ফকিহ ছিলেন সে সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহ.) তার বিখ্যাত কিতাবে উল্লেখ করেন- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: كان أفقه أهل الدنيا -"ইমাম আহমদ ইবনে ইউনুস (রহ.) বলেন, তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা (রহ.) দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন।" (তথ্য সূত্র ঃ যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৬৭পৃ.)

১০ . ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ৩৬/৮৬পৃ. ইমাম ইবনে সাদ, আত্-তবকাতুল কোবরা, ৬/১৬৬পৃ.

হতো, তখন তারা পছন্দ করতেন আরেক ভাই এর উত্তরে যথেষ্ট (জ্ঞান রাখেন)।"[১১] এ তাবেয়ী থেকে আরও একাধিক সূত্রের বর্ণনা রয়েছে।[১২] অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে-

قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: أَدْرَكْتُ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فَيَرُدُّهَا هَذَا إلَى هَذَا وَهَذَا إلَى هَذَا حَتَّى تَرْجِعَ إلَى الْأَوَّلِ

-"তাবেয়ী ইবনে লাইলা (রহ.) বলেন, আমি ১২০ জন আনসারী সাহাবীদেরকে সাক্ষাৎ লাভ করেছি তাঁদের নিকট যখন কোন মাস'আলার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত করা হতো, তখন তাদের আরেক ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, এভাবে এক পর্যায়ে (প্রশ্নকারী) এক এক সবার কাছে ঘুরতে ঘুরতে (সকলই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণে) আবার প্রথম ব্যক্তির নিকট ফিরে আসতেন।"[১৩]

وَلِذَلِكَ كَانَ الشَّيْخَانِ أَبُو بكر وَعمر إذا لم يكن لَهما علم فِي الْمَسْأَلَة يسألان النَّاس عَن حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

-"হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রাঃ) কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে অন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা আছে কি না, সেগুলো জিজ্ঞেস করতেন। [আল- ইনসাফ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.), পৃষ্ঠা-১৮]

হযরত উমর (রাঃ) কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে বদরী সাহাবীদেরকে একত্র করে তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান দিতেন। তাই বলে জাকির নায়েকের মত সকল ধরনের প্রশ্ন আসলে কোন চিন্তা বিবেচনা এবং সময় না নিয়েই ফাতওয়া প্রদান করতেন না। প্রথমিক অবস্থায় তাকে কোন ফিক্হী বিষয়ে প্রশ্ন আসলে তিনি বলতেন যে, এগুলো আমার আয়ত্তের বাহিরে; যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন তখন নিজের

১১ . ইমাম ইবনে সাদ, আত্-তবকাতুল কোবরা, ৬/১৬৬পৃ.

১২ . জানতে দেখুন-ইমাম ইবনে সাদ, আত্-তবকাতুল কোবরা, ৬/১৬৬-১৬৭পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৩ . ইবনুল কাইয়্যিম যওজী, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, ৪/১৬৮পৃ.

দল আহলে হাদিসদেরতে বেগবান করার জন্য সকল বিষয়ে ফাতওয়া দিতে শুরু করলেন, আর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হলেন। মুফাসসির কুল শিরোমণি বিখ্যাত মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেছেন-

وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ كُلَّ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ لَمَجْنُونٌ

-"ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, আমাকে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলেন, ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং সকল বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করে, সে অবশ্যই পাগল।"[১৪]

আহলে হাদিসদের ইমাম আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম তার কিতাবে এ হাদিসটি সংকলন করে উল্লেখ করেছেন-

وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فَهُوَ مَجْنُونٌ.

-"এটি সহিহ সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, তারা উভয়ই বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং **সকল বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করে, সে অবশ্যই পাগল**।"[১৫] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! **এ দুজন মহান মুজতাহিদ সাহাবীর ফাতওয়ায় ডা. জাকির নায়েক কী হবেন ?** আহলে হাদিসদের ইমাম আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এ দলিল পেশ করে ডা. জাকির নায়েকের মত লোকদের বিষয়ে বলেছেন-

الْجُرْأَةُ عَلَى الْفُتْيَا تَكُونُ مِنْ قِلَّةِ الْعِلْمِ وَمِنْ غَزَارَتِهِ وَسِعَتِهِ، فَإِذَا قَلَّ عِلْمُهُ أَفْتَى عَنْ كُلِّ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ

-"ফাতওয়া প্রদান করতে উদ্যত হওয়াটা কম ইলমের কারণেও হতে পারে, আবার অধিক ইলমের কারণেও হতে পারে। অতএব যখন কারও **ইলম কম** থাকে, তখন তাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করা হয়, না **জেনে সে সকল বিষয়ে সমাধান দেয়**।"[১৬]

১৪ .ইবনুল কাইয়্যিম যওজী, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, ১/২৮পৃ.
১৫ .ইবনুল কাইয়্যিম যওজী, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, ২/১২৭পৃ.
১৬ .ইবনুল কাইয়্যিম যওজী, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, ১/২৮পৃ.

তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরিন (রহ.) বলেন-

لَأَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ جَاهِلًا خَيْرٌ لَهُ من أن يقول بلا علم

-"অজ্ঞতাবশত কথা বলার চেয়ে কোনো ব্যক্তির জন্য মূর্খ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা শ্রেয় বা উত্তম।"[১৭] এ বিষয়ে তাঁর আরেকটি বক্তব্য রয়েছে তিনি বলেছেন-

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَأَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ جَاهِلًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ.

-"কোন বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাস করলে সে না জেনে অজ্ঞতাবশত কথা বলার চেয়ে তার মূর্খ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় অথবা তার বলে দেওয়া উচিত হবে আমি এ বিষয়ে জানি না।"[১৮] বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে ওহাব (রহ.) বলেন আমি ইমাম মালেক (রহ.) কে বলতে শুনেছি, -

وقال القاسم بن محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول عَلَى اللَّه مالا يعلم.

-"তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ও আওলাদে রাসূল (ﷺ) ইমাম কাসেম (রহ.) এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাবশত কোনো কথা বলার চেয়ে কোনো ব্যক্তির জন্য অজ্ঞ-মূর্খ থাকাটা অধিক শ্রেয় অথবা তার বলা উচিত হবে আমি এ বিষয়ে জানি না।"[১৯] এ কথা উল্লেখ করে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এটি অনেক ভারী কথা। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) এর ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষভাবে তাঁকে যে ইলম ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, সেটি আলোচনা করলেন। অতঃপর বললেন, "হযরত আবু বকর (ﷺ) এর সময়ে তিনি বলতেন যে, "আমি জানি না। কিন্তু বর্তমানে এরা কেউ বলে না যে আমি জানি না।" ইমাম ইবনে ওহাব (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.) কে বলতে শুনেছি,

১৭ . আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনু মুফলিহ (রহ.), খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৫
১৮ . ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ২/১২৭পৃ.
১৯ .ইমাম ইবনে আসাকির (৫৭১হি.), তারিখে দামেস্ক, ৪৯/১৭৬পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৫হি. ইবনে আবি ই'য়ালা (ওফাত.৫২৬ হি.), তবকাতুল হানাবালাত, ১/৭০পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন।

وَقَالَ مَالِكٌ: مِنْ فِقْهِ الْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ: " لَا أَعْلَمُ " فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَتَهَيَّأَ لَهُ الْخَيْرُ.

-"বুদ্ধিমান আলেমের কর্তব্য হলো সে যেন বলে দেয় যে, "আমি জানি না।"। কেননা এর দ্বারা হয়তো তার জন্য উত্তম কোনো বিষয়ের ব্যবস্থা করা হবে।"[২০] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন-

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْفَتْوَى فَهُوَ آثِمٌ عَاصٍ، وَمَنْ أَقَرَّهُ مَنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ أَيْضًا.

-"যে ব্যক্তি মানুষকে ফাতওয়া দেওয়ার যোগ্য না হয়েও ফাতওয়া প্রদান করল, সে গোনাহগার ও আল্লাহর অবাধ্য এবং শাসকদের যারা তাকে এ কর্মে নিয়োগ দেবে তারাও গোনাহগার হবে।"[২১] হযরত আবু ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْت أَرَى الرَّجُلَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَإِنَّهُ لَيَدْخُلُ يَسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ فَيَدْفَعُهُ النَّاسُ عَنْ مَجْلِسٍ إلَى مَجْلِسٍ حَتَّى يُدْفَعَ إلَى مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَرَاهِيَةَ لِلْفُتْيَا

-"আমি সেই যুগে দেখেছি, যখন এক ব্যক্তি কোনো একটি বিয়য়ে কাউকে জিজ্ঞেস করত, তখন একজন-আরেকজনের নিকট প্রেরণ করত। অবশেষে লোকটি হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) এর মজলিশে এসে উপনীত হতো। ফাতওয়া প্রদানে তাদের অপছন্দ থাকায় মানুষ তখন এটি করত।[২২] হযরত ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

وَقَدْ رَأَى رَجُلٌ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ اسْتُفْتِيَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ، وَظَهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قَالَ: وَلَبَعْضِ مَنْ يُفْتِي هَهُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنْ السُّرَّاقِ.

২০. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ২/১২৮পৃ.
২১. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ৪/১৬৬পৃ.
২২. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ১/২৮পৃ.

-"জনৈক ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে হযরত রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রহ.) এর নিকট গিয়ে দেখেন তিনি তিনি ক্রন্দন করছেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কী কারণে ক্রন্দন করছেন? আপনার ওপর কি কোনো মুসিবত আপতিত হয়েছে? রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান উত্তর দিলেন, আমি অযোগ্য লোকের নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেছি। ইসলামের মাঝে মারাত্মক একটি জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি বলেন, "বর্তমানে যারা ফাতওয়া দেয়, তাদের কেউ কেউ চোরদের চেয়েও বেশি জেলে আবদ্ধ থাকার যোগ্য।"[২৩]

রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। এবং হাফেজে হাদীস ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মালেক (রহ.) ফিক্হ শিখেছেন। তিনি ১৩৬ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইসলামের দ্বিতীয় শতকে যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন, তবে আমাদের সময়ের জাকির নায়েকের মত অজ্ঞ-মূর্খদের যুগে কী বলা হবে?। এ প্রসঙ্গে আহমাদ বিন হামদান হারানী (রহ.) [মৃত্যু-৬৯৫ হি.] লিখেছেন-

فَكيف لَو رأى زَمَاننَا وأقدام من لَا علم عِنْده على الْفتيا مَعَ قلّة خبرته وَسُوء سيرته وشؤم سَرِيرَته وَإِنَّمَا قَصده السمعة والرياء ومماثلة الْفُضَلَاء والنبلاء والمشهورين المستورين وَالْعُلَمَاء الراسخين والمتبحرين السَّابِقين وَمَعَ هَذَا فهم ينهون فَلَا ينتهون وينبهون فَلَا ينتبهون قد أملي لَهُم بانعكاف الْجُهَّال عَلَيْهِم وَتركُوا مَا لَهُم فِي ذَلِك وَمَا عَلَيْهِم فَمن أقدم على مَا لَيْسَ لَهُ أَهلا من فتيا أَو قَضَاء أَو تدريس أثم فَإِن أَكثر مِنْهُ وأصر وَاسْتمرّ فسق وَلم يحل قبُول قَوْله وَلَا فتياه وَلَا قَضَاؤُهُ هَذَا حكم دين الْإِسْلَام

-"যদি রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান আমাদের এ সময়টি দেখতেন? তিনি যদি বর্তমান সময়ের অজ্ঞ লোকদের ফাতওয়া প্রদানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন? নিজেদের অযোগ্যতা- অনভিজ্ঞতা, নিকৃষ্ট চারিত্রিক অবস্থা, অভ্যন্তরীণ কলুষতা, লৌকিকতা ও প্রশংসাপ্রিয়তা এবং পূর্ববর্তী গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত থাকা সত্ত্বেও তাদের নিকট অজ্ঞ লোকদের ভিড় তাদেরকে জরাগ্রস্ত করেছে, ফলে তারা তাদের গ্রহণীয়-বর্জনীয় সকল বিষয় পরিত্যাগ করেছে; অথচ তাদেরকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা সতর্ক হয় না। সুতরাং কেউ ফাতওয়া, বিচার

২৩. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ১/১৫৯পৃ.,আহমাদ বিন হামদান হারানী, সিফাতুল ফাতওয়া, পৃষ্ঠা-১১

কিংবা পাঠদানের যোগ্য না হয়েও যদি সে কাজে অগ্রসর হয়, তবে সে গোনাহগার হবে। এ ধরনের বিষয় যদি তার নিকট থেকে বারবার প্রকাশ পেতে থাকে অথবা সে যদি এর ওপর অটল থাকে, তবে সে ফাসেক হয়ে যাবে। এ ধরনের ব্যক্তির কোনো কথা, ফাতওয়া এবং কোনো ফয়সালা গ্রহণ করা জায়েয নয়। এটি ইসলামের শাশ্বত বিধান।"[২৪] ইমাম আহমাদ ইবনে হামদান (রহ.) মৃত্যুবরণ করেছেন ৬৯৫ হিজরি সনে। অর্থাৎ এখন থেকে ৭০০ বছর পূর্বে তিনি এ কথাগুলো বলেছেন সুতরাং বর্তমান যুগের যে কী করুণ অবস্থা, তা সহজেই অনুমেয়। তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) বলেন-

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّمَا يُفْتِي النَّاسَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ: مَنْ يَعْلَمُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ، أَوْ أَمِيرٌ لَا يَجِدُ بُدًّا، أَوْ أَحْمَقُ مُتَكَلِّفٌ

-"সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, মানুষকে ফাতওয়া প্রদান করে তিন ব্যক্তির কোনো এক ব্যক্তি- (১.) কোরআনের নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি। (২.) ফাতওয়া প্রদানে বাধ্য আমির বা শাসক। (৩.) অথবা নিরেট মূর্খ লোক। তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.) বলেন, আমি প্রথম দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নই। সুতরাং আমি তৃতীয় ব্যক্তি হতে চাই না।"[২৫] পূর্ববর্তী বুজুর্গদের স্বভাব ছিল, যখন তাঁদেরকে কোনো ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হতো, তাঁরা যদি এর সুস্পষ্ট উত্তর জানতেন, তখন তা বলে দিতেন। কিন্তু যদি এ বিষয়ে কোনো উত্তর জানা না থাকত, সাথে সাথে বলে দিতেন, আমি জানি না। আর যদি একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরের সম্ভাবনা থাকত, তখন তাঁরা বলতেন, এটি আমার নিকট পছন্দনীয়। আমার নিকট এটি ভালো মনে হয়। যেমন ইমাম মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ফাতওয়া প্রদান করলে অনেক সময় বলতেন-

إِنْ نَظُنُّ إِلا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ -"আমি শুধু ধারণাই রাখি, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত নই।"[২৬] হযরত আলী (রা.) বলেন-

২৪. আহমাদ বিন হামদান হারানী, সিফাতুল ফাতওয়া, পৃষ্ঠা-১১
২৫. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ১/২৮পৃ.
২৬. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ১/৩৫পৃ.

قال علي بن أبي طالب عليه السلام: وابردها على الكبد! إذا سئل أحدكم عن ما لا يعلم، أن يقول: لا أعلم.

-"আমার নিকট অধিক প্রশান্তিকর হলো, তোমাদের নিকট কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করে, আর তোমরা সে সম্পর্কে না জেনে থাকো, তবে বলে দেবে,"আল্লাহই ভালো জানেন।"[২৭] ইমাম ইবনে কাসেম (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.) কে বলতে শুনেছি-

قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن.

-"আমি প্রায় ১০ বছর যাবৎ একটি মাস'আলা নিয়ে চিন্তা করছি, এখন পর্যন্ত উক্ত মাস'আলায় সমাধানে আসতে পারিনি।"[২৮] তিনি আরো বলেন-

قال ابن مهدي: سمعت مالكاً يول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلي.

-"অনেক সময় আমার নিকট মাস'আলা পেশ করা হয়, আমি রাতের পর রাত সেগুলো নিয়ে গবেষণা করি।"[২৯] এই হলো আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা। এটিকে বর্তমান অবস্থার সাথে একটু তুলনা করুন। টিভি, রেডিও, পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন টক শোতে অবাধে ফাতওয়ার ছড়াছড়ি। প্রত্যেকেই নিজের মতমতো ফাতওয়া দিচ্ছে। যার যা মনে চাচ্ছে, শরীয়তের বিষয়ে অবলীলায় তা বলে দিচ্ছে। শরীয়ত যেন লা-ওয়ারিস সম্পদ! ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.) উত্তম কথা বলেছেন-

لاتحسب الفقه تمرا أنت اكله
لن تبلغ الفقه حتى تلعق الصبرا

২৭. ইমাম ইবনুল যওজী, তা'যিমুল ফাতওয়া, ১/৮৩পৃ. হাদিস নং ২৩
২৮. ইমাম কাযি আয়াজ, তারতিবুল মাদারেক, ১/১৭৮পৃ.
২৯. ইমাম কাযি আয়াজ, তারতিবুল মাদারেক, ১/১৭৮পৃ.

-"ফিকহ শাস্ত্রকে তুমি একটি খেজুর মনে করো না যে তা মুখে পুরে খেয়ে ফেলবে। তুমি কখনও ফিকহ অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষন না তুমি ধৈর্যধারণ ও অধ্যবসায় গ্রহণ করবে।" তিনি আরও বলেছেন-

إذ لو كان الفقه يحصل بمجرد القدرة على مراجعة المسألة من مظانها لكان أسهل شئ ولما احتاج إلى التفقه على أستاذ ماهر وفكر ثاقب باهر. لو كان هذا العلم يدرك بالمنى ما كنت تبصر فى البرية جاهلا-

-"কেননা <u>কিতাব দেখে মাস'আলা প্রদানের যোগ্যতার নাম যদি ফিকহ হতো</u>, তবে এটি সর্বাধিকত সহজ বিষয় হতো এবং এর জন্য কোনো দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উস্তাদের সংস্পর্শেও প্রয়োজন হতো না। "এই ইলম যদি এমনিতেই অর্জিত হতো, তবে তুমি পৃথিবীতে কোনো অজ্ঞ লোক দেখতে পেতে না।"

বর্তমানে অনেককে দেখা যায়, প্রশ্ন করার পূর্বেই উত্তর প্রদানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শরীয়তের বিষয়ে তাদের এ ধরনের সবজান্তা ভাব কখনও কাম্য নয়। তাদের ভাবখানা এমন যে তারা জানে না, এমন কোনো বিষয় পৃথিবীতে নেই। অথচ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অবস্থা কী ছিল? হযরত উকবা ইবনে মুসলিম (রা.) বলেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ شَهْرًا فَكَثِيرًا مَا كَانَ يُسْأَلُ فَيَقُولُ: «لَا أَدْرِي» ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَيَّ فَيَقُولُ: «تَدْرِي مَا يُرِيدُ هَؤُلَاءِ؟ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا ظُهُورَنَا جِسْرًا لَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ

-"আমি ৩৪ বছর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর সংস্পর্শে থেকেছি । তাঁকে যে প্রশ্ন করা হতো, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, "লা আদরি" (আমি জানি না)। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ করে বলতেন, <u>"এরা আমাদের পিঠকে জাহান্নামের সেতু বানাতে চায়</u>।"[৩০] ফকিহ সাহাবী ইবনে উমর (রা.) কী জাকির নায়েক হতেও কম জ্ঞানী ছিলেন? তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রহ.) বলেন-

৩০ . ইবনে আব্দুল বার্, জামেউল বায়ানিল ইলমী ও ফাযলিহি, খ.২, পৃষ্ঠা-৮৪১, হাদিস নং. ১৫৮৫

وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ فَيَتَكَلَّمُ وَإِنَّهُ لَيَرْعَدُ

-"আমি এমন সম্প্রদায়কে দেখেছি, যাদের নিকট কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করা হলে তারা <u>সে বিষয়ে কোনো কথা বলতে গিয়ে কাঁপত</u>।"[৩১] [কোনো ধরনের ত্রুটি হওয়ার ভয়ে কাঁপত] বিখ্যাত ইমাম ও হাদিস বিশারদদের ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন-

وَقَالَ سُفْيَانُ: أَدْرَكْتُ الْفُقَهَاءَ وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يُجِيبُوا فِي الْمَسَائِلِ وَالْفُتْيَا حَتَّى لَا يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَنْ يُفْتُوا وَقَالَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْفُتْيَا أَسْكَتُهُمْ عَنْهَا وَأَجْهَلُهُمْ بِهَا أَنْطَقُهُمْ

-"আমি এমন ফকীহদেরকে পেয়েছি, যারা মাস'আলা ও ফাতওয়া প্রদান করতে অপছন্দ করতেন। নিতান্ত নিরুপায় হলে তাঁরা ফাতওয়া প্রদান করতেন। ফাতওয়ার <u>ক্ষেত্রে সর্বাধিক জ্ঞাত সেই ব্যক্তি, যে চুপ থাকে</u>, এ ক্ষেত্রে যে অধিক কথা বলে, সে হলো চরম মূর্খ।"[৩২] হযরত আব্দুল মালিক বিন আবি সুলাইমান (রহ.) বলেন-

سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ «لَا أَعْلَمُ» ، ثُمَّ قَالَ: " وَيْلٌ لِلَّذِي يَقُولُ لِمَا لَا يَعْلَمُ: إِنِّي أَعْلَمُ

-"হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর (রহ.) কে কোনো একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "আমি জানি না"। অতঃপর তিনি বলেন, সে ধ্বংস হোক! যে জানে না অথচ বলে যে <u>আমি জানি</u>।"[৩৩]

ইমাম মালেক (রহ.) কে কখনো ৫০ টি প্রশ্ন করা হলে তিনি একটিরও উত্তর দিতেন না।তিনি বলতেন-

৩১ . ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ৪/১৬৭পৃ. আল্লামা শাতেবী, মুয়াফাকাত, ৪/২৮৬পৃ.
৩২ . আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনে মুফলিহ (রহ.), খ. ২, পৃষ্ঠা-৬৩, আজরী বাগদাদী (৩৬০ হি.), আখলাকুল উলামা, ১/১০২পৃ.
৩৩ . ইবনে আব্দুল বার্, জামেউল বায়ানিল ইলমী ও ফাযলিহি, খ.২, পৃষ্ঠা-৮৩৬, হাদিস নং. ১৫৬৮

وَكَانَ مَالِكٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ – يَقُولُ: مَنْ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَيَنْبَغِي لَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِيبَ فِيهَا أَنْ يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَكَيْفَ يَكُونُ خَلَاصُهُ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ يُجِيبَ فِيهَا.

-"যে ব্যক্তি কোনো মাস'আলার সমাধান দিল, উত্তর প্রদানের পূর্বে তার জন্য কর্তব্য হলো, সে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করবে এবং পরকালে তার কিভাবে মুক্তি হবে, এটি চিন্তা করবে, অতঃপর তার উত্তর প্রদান করবে।"[৩৪] ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন-

وَصَحَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُلٌّ وَإِهَانَةٌ لِلْعِلْمِ أَنْ تُجِيبَ كُلَّ مَنْ سَأَلَكَ

-"ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর প্রদান ইলমের প্রতি অবমাননা ও লাঞ্ছনা প্রদর্শন।"[৩৫]

এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই যারপরনাই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং এভাবেই যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শরীয়তের বিষয়ে কারো জন্য যেমন সবজান্তা হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি ফাতওয়া বা মাস'আলা দেওয়ার যোগ্য না হয়েও মাস'আলা দেওয়া জায়েয নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে মূর্খ লোকেরাই নিজেদেরকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করে থাকে। এদের সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য-

الجَاهِلُ لاَ يَعلَمُ رُتْبَةَ نَفسِه، فَكَيْفَ يَعْرِفُ رُتْبَةَ غَيْرِه.

-"মূর্খ লোকেরা নিজের অবস্থা সম্পর্কেই অবগত নয়, তবে তারা অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে কিভাবে অবগত হবে?"[৩৬] অতএব, ফাতওয়া বা মাস'আলা প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যে এটি আমার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন! আমীন। বাস্তব সত্য হলো, মাস'আলা সমাধান দেয়ার

৩৪. ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ৪/১৬৭পৃ.
৩৫. আদাবুশ শরইয়্যাহ, আল্লামা ইবনু মুফলিহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯
৩৬. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন আন নুবালা, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩২১

ক্ষেত্রে ডা. জাকির নায়েক কথিত সালাফী বা লা-মাযহাবীদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কবির ভাষায়-

"ভাঙ্গা তরীতে পাড়ি দিয়েছি
অথৈ সাগর মোরা;
যেখানেই পানি কম ছিল হায়!
তরী ডুবে হলো সারা"।

ডা. জাকির নায়েক ফিক্‌হের বিষয়ে অভিজ্ঞ না হয়েও বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করায় তিনি সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত হয়েছেন। তার এ সমস্ত ভুল মাস'আলা এবং বাতিল সালাফি তথা আহলে হাদিস আক্বিদা/মতবাদ সম্পর্কে অনেকে ভাল আলেম হয়তো অবগত। ফিকহের বিষয়ে ভুল মাস'আলা দেয়ার পাশাপাশি তিনি মাযহাব প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বে এবং বিশেষভাবে **"ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ"** শিরোনামের লেকচারে বিভিন্ন ধরনের অমূলক উক্তি করেছেন। অপরদিকে রাসূল (ﷺ), আওলিয়ায়ে কেরামদের শানে অসংখ্য বেয়াদবী করেছেন যা নিম্নে সবিস্তারে আলোকপাত করা হবে। **"ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ"** লেকচারে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাযহাবকে ইসলাম বহির্ভূত একটি বিষয় হিসেবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছেন। ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাব সম্পর্কে যে সমস্ত অমূলক উক্তি করেছেন সামনে সে সমস্ত বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

২. কে এই ডা. জাকির নায়েক ?

তার পূর্ণ নাম জাকির আবদুল করীম নায়েক। তার জন্ম ১৯৬৫ সনের ১৮ অক্টোবরে ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের মুম্বাই শহরে। তার বংশ কোঙ্কনী। দ্বীনী ক্ষেত্রে তিনি গাইরে মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবি (আহলে হাদিস) সম্প্রদায়ের মতাদর্শের অনুসারী। যা নিম্নে আলোকপাত করা হবে। লেখাপড়া হিসেবে তিনি কখনো কোন মাদরাসায় বা অভিজ্ঞ আলেম-উস্তাদের নিকট ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেননি। তিনি ডাক্তারী পড়াশোনা করেছেন।[৩৭]

সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনে তিনি খৃষ্টান ও হিন্দুদের সংস্পর্শে কাটানোর কারণে লেবাস-পোশাকে বিধর্মীদের বেশভূষার অনুসরণ এবং নারী-পুরুষের বেপর্দা সহাবস্থানের

৩৭. দ্রষ্টব্য ঃ http : Wikipedia, the free encyclopedia/Dr Zakir Naik এবং এ বিষয়ে প্রত্যেক লেকচার সমগ্রের ভূমিকায় তার জীবনী দেয়া আছে দেখুন।

পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। আর তিনি তো 'টাই' পড়াকে জায়েয বলেই ফাতওয়া দিয়েছেন। যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে পাবেন।

৩. জাকির নায়েকের উত্থানের মূলে কী ?

বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারক শায়খ আহমদ দিদাদ খৃষ্টান ও ইহুদিদের ধর্ম গ্রন্থ বাইবেল সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করে বহুদিন যাবৎ ইসলামের সত্যতার পক্ষে দলিল পেশ করে এবং ইহুদি খৃষ্টানদের ধর্ম মতের অসারতা প্রমাণ করে তাদের মোকাবেলা করে এসেছেন। তিনি "দি চয়েস" নামক গ্রন্থে বাইবেলের বিভিন্ন উক্তি দ্বারা জোরালোভাবে প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলধারীদের ধর্ম ভ্রান্ত এবং ইসলাম ধর্ম সত্য। তার এ পদক্ষেপ সারা পৃথিবীতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। শায়খ আহমদ দিদাত ১৯৯৪ইং সনে বিশেষ দাওয়াতী সফরে মুম্বাই শহরে এলে ডা. জাকির নায়েক তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার থেকে বিধর্মীদের ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি সমূহসহ বিধর্মীদের মোকাবিলা করে ইসলাম প্রচারের কৌশল আয়ত্ত করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ http : //Dr Zakir Naik biography>>Search with YouFind!)

শায়খ আহমদ দিদাদ থেকে দীক্ষা লাভ করে তিনি তার স্টাইলে বিধর্মীদের ধর্ম গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে অন্যান্য ধর্ম রদ এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু করেন। আর এ কাজের সুষ্ঠু ইন্তিজামের জন্য তিনি তার এলাকার আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ইসলামী রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আই আর এফ) নামে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তুলেন। অতঃপর এর মাধ্যেমে তিনি ডিজিটাল প্রচারযন্ত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে বিভিন্ন কনফারেন্স এর আয়োজন এবং পিস টিভি নামে চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া অন্য টিভি চ্যানেলে (গোফত্ গো) এ পর্যায়ে ডা. জাকির নায়েক বিধর্মীদের ধর্মগ্রন্থের অনর্গল উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের ধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে এবং ইসলামের সত্যতা প্রকাশে লেকচারে পদ্ধতি ও প্রশ্নোত্তরগুলো চ্যানেলের মাধ্যমে এবং সিডি ও বই আকারে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এতে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে তার বক্তব্য সুবিস্তৃত প্রচারণা পায় এবং তিনি এর মধ্যদিয়ে অভূতপূর্বভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থহন। ভারত ও পাকিস্তানে তার লেকচারসমূহ উর্দু ভাষায় সিডি ও (খুতবাতে ডাক্তার জাকির নায়েক) নামে বই আকারে এবং বাংলাদেশে তার লেকচার বাংলা সংস্করণ সিডি ও **"ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র"** নামে বই পাওয়া যায়। ডাক্তার জাকির নায়েকের এ পদ্ধতি কৌশলগত দিক হল, বিষয়ভিত্তিক উদ্ধৃতিসমূহ গৎবাঁধাভাবে মুখস্থ করা। যদ্দরুন মানুষ অনবরত উদ্ধিতি শুনে অভিভূত হয়ে যায় এবং তাকে এ সম্পর্কিত বড় বিদ্যান ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ভাবতে থাকে। অথচ তার কারিশমা সেই উদ্ধৃতি পর্যন্ত শেষ, এর বাইরে ইলমের যে বিশাল

সাগর-মহাসাগর রয়েছে, সেখানে তার পদচারণা অপ্রতুল। এমনকি যে হাদিস ও আয়াত তিনি পেশ করেন, তার আগের ও পরের আয়াত/হাদিস তার মুখস্তের আওতায় থাকে না এবং সেগুলোর অনেকটার অর্থও তিনি বুঝেন না। কারণ,. আরবী ভাষাজ্ঞান তার নেই-এ কথা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার বক্তব্যের দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য এটা আলেমগণ ধরতে পারেন, সাধারণ জনগণের এটা ধরতে না পারা স্বাভাবিক।

৪. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্রের পরিচয় ঃ

আমার এ পুস্তকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি ইন্টানেটের (ওয়েবসাইটের) তথ্যের পাশাপাশি ডা.জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্রের উদ্ধৃতি দিয়েছি। জমাকৃত বক্তব্যকে একত্রে করে ভারত ও পাকিস্তানে তার লেকচারসমূহ উর্দু ভাষায় সিডি (خطبت ڈاکٹر ذاکر نا یك) 'খুতবাতে ডাক্তার জাকির নায়েক' নামে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশে তার লেকচারের বাংলা সংস্করণ সিডি এবং বাংলায় অনুবাদ করে "ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র" নামে প্রকাশ করেন পিস পাবলিকেশন, ঢাকা, ৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট , বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ হতে । প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় জুন ২০০৯ ইং সালে। এ পর্যন্ত (২০১৫ ইং সাল) তার লেকচার ৫ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া মহিলাদের প্রশ্নের জবাবেও এক ভলিয়মে এ প্রকাশনা থেকে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তার খুতবাও বের হয়েছে।

৫. ডা. জাকির নায়েক কাদের অনুসারী ?

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় হাবিব (ﷺ) কে অনেকক্ষেত্রে সরাসরি এবং কখনো হযরত জিবরাঈল (عليه السلام) এর মাধ্যমে দ্বীন শিখিয়েছেন। সাহাবীগণ সরাসরি রাসূল (ﷺ) এর নিকট দ্বীন শিখেছেন। সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) তাবেয়ীদেরকে এবং তাবেঈগণ তাদের ছাত্র তাবে-তাবেঈগণকে দ্বীন শিখিয়েছেন। এভাবে ইসলামী শিক্ষার ধারা অদ্যবধি চলে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে একটি দুঃখজনক বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, একশ্রেণীর মানুষ দ্বীনি ইলম শিক্ষার এই ধারার প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে স্বশিক্ষিত হওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন এবং তাদের নিজস্ব বুঝ অনুযায়ী দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত অবলীলায় পেশ করে যাচ্ছেন।

প্রাথমিকভাবে ইসলাম প্রচার ও বিধর্মীদের রদ ইস্যুতে চমক লাগানো কৌশল গ্রহণ করে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জনের পর ডা. জাকির নায়েক তার স্বরূপ পাল্টে ফেলেন। তিনি তার সেই বিশাল অর্জনকে গাইরে মুকাল্লিদ বা আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের মতাদর্শ প্রচার এবং অন্য সকল মাসলাকের বিরুদ্দে বিষোদগারের ক্ষুদ্র

কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন। আমরা প্রত্যেকেই অবগত যে, ডা. জাকির নায়েক পেশাগত একজন ডাক্তার। দ্বীনের বিষয়ে তিনি মৌলিক জ্ঞানের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা করেননি। তিনি তার বক্তৃতা কিংবা বাস্তব জীবনে কাদের মতাদর্শ অনুসরণ করেন এবং কাদের উপর নির্ভর করেন, সে বিষয়টির উপর তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করছে। তিনি কাকে অনুসরণ করে থাকেন, ডাক্তার জাকির নায়েকের কথা গ্রহণ করার পূর্বে সে বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

ডা. জাকির নায়েক তার- Unity in the Muslim Ummah শিরোনামের লেকচারে শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী সম্পর্কে বলেছেন- ১. Many of my talks are based on his research, Mashallah. "মাশাআল্লাহ! আমার অনেক লেকচার শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীর গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি।"

২. I am nothing compare to him, I am not even a drop in the ocean compare to Nasiruddin Albani. -"আমি তার তুলনায় কিছুই নই। নাসিরুদ্দিন আলবানী সাগরতুল্য হলে আমি তার তুলনায় এক ফোঁটা পানির সমতুল্যও নই।"[৩৮] (http://qaazi.wordpress.com /2008/0728/variouss-public-lectures-by-dr-zakir-naik/

উপরোক্ত আলোচনাটি ইউটিউবে এ শিরোনামে পাওয়া যাবে- Dr. Zakir Naik talks about salafi.s.AHL E HADITH – You Tube)

৩.সে যে একজন আহলে হাদিস তা তার নিম্নের এ বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। সে বলে- "Say for example I am lay, what I say in talk I do my research, but more knowledge in my head or my brain, which I haven't checked up, but yet I classify. For example, if I hear a statement from Sheikh Nasiruddin Albani, Mashallah, who has died recently, according to me he is one of great Muhaddis of the recent times. What he says, I follow on the face of it, because I checked up, the scholar Mashallah following Quran and Sahih Hadith.

-"উদাহরণস্বরূপ! আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি আমার লেকচারে যা বলি, সেগুলো নিয়ে আমি গবেষণা করে থাকি। **কিন্তু আমার মাথায় বা ব্রেনে আরও অনেক জ্ঞান রয়েছে,** যেগুলো আমি অনুসন্ধান করতে পারি না। তবে আমি এর জন্য

৩৮ .ডা.জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র ভলিয়ম নং.৫ এর ১০১পৃষ্ঠা.

স্কলারদের শ্রেণীবিভাগ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, যদি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীর পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা পাই, আমার মতে তিনি বর্তমান সময়ের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস। তিনি যা বলেন, আমি সে অনুসারে চলি। কেননা আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি, মাশাআল্লাহ ! তিনি কুরআন ও সহিহ হাদিস অনুসরণ করেন।

(http://www.youtube.com/watch?v=Szzn9lfg9n0 ইউনিট ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/) এ বক্তব্যটি আপনারা ইন্টারনেট ছাড়াও তার লেকচার সমগ্র ৫ম খণ্ডের ৯২ পৃষ্ঠায় পাবেন।

৪. So if some one gives the Fatwa, local person from here and Nasiruddin Albani, I believe Nasiruddin Albani, if I don't have time. But what I say in the lecture I check up, because I am responsible for that. But for my own knowledge, if I have to make a opinion, I can't check up every Hadith, difficult! Difficult for a lay man.

-'এখানকার কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো ফতওয়া প্রদান করে এবং শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী যদি কোনো ফাত্ওয়া প্রদান করেন, তবে আমি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীকে বিশ্বাস করবো, যদি আমার নিকট যথেষ্ট সময় না থাকে। কিন্তু আমার লেকচারে আমি যা বলি, সেগুলো আমি যাচাই করে থাকি। কেননা এর জন্য আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু আমার নিজের জ্ঞানের জন্য যদি কোনো বিষয়ে আমার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তবে আমি সব হাদিস যাচাই করে দেখতে পারি না। এটি অনেক কঠিন! একজন সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কঠিন! (প্রাগুক্ত)।"[৩৯]

ইসলামী বিষয়ে ডা. জাকির নায়েক তার লেকচারের জন্য শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী উপর নির্ভর করেন এবং তাকে অনুসরণ করে থাকেন। তা তার নিজের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম।

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীকে সালাফীরা বর্তমান সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মনে করে থাকেন। যেমনটি ডা. জাকির নায়েকও মনে করেন। সালাফী মাযহাবকে যারা বেগবান করেছে, বর্তমান সময়ে শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানীকে তাদের পুরোধা বলা যায়। ডা. জাকির নায়েক যেহেতু শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীসহ অপরাপর সালাফী বা আহলে হাদীসদের উপর নির্ভর করেন এবং তাদের শিক্ষা প্রচার করে থাকেন, এ

৩৯ . জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৯২পৃ.

জন্য ডা. জাকির নায়েককে লা-মাযহাবী দলের প্রচারক বা তাদের ব্যাখ্যাকার বলা যায়।

He is regarded as an exponent of the Salafi ideogy.

"ডা. জাকির নায়েককে সালাফী মাযহাবের ব্যাখ্যাকার মনে করা হয়"।

(Roel Meijer's Global Salafism: Islam's new religious movement, Columbia University Press, 2009 Warikoo, Kulbhushan; Religion and security in South and Central Asia, Taylor & Francis, 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Zakir_Naik#cite_note-4)

এক বক্তব্যে জাকির নায়েক নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে নিজেকে তার তুলনায় এভাবে অধম বলে বিনয় প্রকাশ করেন "আমি শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর কাছে একেবারেই তুচ্ছ, সমুদ্রের মধ্যে একফোঁটা পানির মতো।"(ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/১০২পৃ.)

অবশ্য ডা. জাকির নায়েক **"ইউনিট ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ"** শিরোনামের লেকচারে সালাফী ও আহলে হাদীসদের সমালোচনা করেছেন; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সালাফী লা-মাযহাবী মাযহাবে বিশ্বাসী নন। (ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/১০১-১০২পৃ.) শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীসহ অন্য সালাফীদের অনুসরণ এবং তাদের মতাদর্শ প্রচার করাটাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এ ছাড়া একজন লা-মাযহাবীর লেখা একটি বই পড়ুন এবং ডা. জাকির নায়েকের লেকচার শুনুন! এ দুয়ের মাঝে মৌলিক দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। (বিশেষ করে লেকচার ভলিয়ম ৫ম খণ্ড) মাযহাবীদের ব্যাপারে তারা যে সমস্ত অভিযোগ করে থাকে, ডা. জাকির নায়েক তার লেকচারে হুবহু সেগুলো উল্লেখ করেছেন, বরং অনেকে ক্ষেত্রে তিনি তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

সালাফীদের কারণে মুসলিম উম্মাহের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো **"ফিতনাতুত তাকফীর"** তথা অন্যকে কাফের বলার প্রবণতা। ইসলামের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের প্রতি ন্যূনতম কোনো সম্মান তো তারা প্রদর্শন করেই না, বরং তাদেরকে কাফের-মুশরিক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে। এই ফিতনা এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, পূর্ববর্তী কোনো কোনো বুযুর্গের প্রতি কোনো সম্মান তাদের নিকট যেন কোনো বিবেচনার বিষয়ই নয়। অথচ তারা

নিজেদেরকে "সালাফী" (পূর্ববর্তীদের অনুসারী) হিসেবে প্রকাশ করে থাকে। ইমাম তাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা বর্ণনা করেন-

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل

-"পূর্ববর্তী যুগের 'সালাফে সালিহীন' (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলেমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদীস অনুসারীগণ এবং ফকীহ-মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কটূক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।"[৪০] তাই ডা. জাকির নায়েকও সেই ভ্রান্ত পথের অনুসারী হয়েছেন চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যান্য বুযর্গদের সমালোচনা করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বর্তমান সময়ে সালাফী আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি বেগবান করেছেন, শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী। তিনি তার মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিখ্যাত কোনো মুহাদ্দিস বা ফকীহকেই তার সমালোচনা থেকে বাদ দেননি। তিনি শুধু সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, অনেক ক্ষেত্রে অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছেন, যা কোনো আলেম নন বরং সাধারণ শিক্ষিতের কাছে থেকে আশা করা যায় না। এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা ঃ

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী হানাফী মাযহাবকে খ্রিস্টধর্মের সাথে তুলনা করে লেখেন-

هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا, ويقضي بالكتاب والسنة, لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه!. "مختصر صحيح مسلم" (ص ٥٤٣)

-"এ থেকে স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের (আহলে হাদিস) শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন এবং কিতাব ও সুন্নাহের মাধ্যমে বিচার করবেন। তিনি ইঞ্জিল, হানাফী ফিক্হ কিংবা এ-জাতীয় অন্য কিছু দ্বারা বিচার করবেন না।"[৪১]

---

৪০. ইমাম তাহাবী, আকিদাতুত তাহাবী, (শুধু মতন), ১/৮২পৃ. ক্রমিক.৯৭ তাঁর এ বক্তব্যটি অনেক আকায়েদের কিতাবে সংকলিত হয়েছে।

৪১. আলবানী, মুয়াস্সাতুল আকায়েদ, ৯/২৬৫পৃ. বাব নং :১৫৯৯, মাকতুবাতুল শামিলা, এবং আল্লামা মুনযীরি (রহ.) কৃত "মুখতাসারু সহিহীল মুসলিম" এর ওপর শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীর টিকা সংযোজন, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, আল-মাকতাবুল ইসলামী, পৃষ্ঠা-৫৪৮

এখানে শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী খুব সহজে হানাফী মাযহাবকে খ্রিষ্টধর্মের বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেছেন; অথচ তিনি এতটুকু চিন্তা করেননি যে, তার নিজের পিতা একজন সুদৃঢ় হানাফী আলেম। আমরা সকলেই জানি, কেউ যদি ইঞ্জিল অনুযায়ী বিবাহ-শাদী করে, তবে ইসলামে তার বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী তার পিতা এমন একটি মতবাদের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, যা বিকৃত ইঞ্জিলের সমগোত্রীয়। এখন তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে বিকৃত ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেন, তবে আমাদের কারও আপত্তি করার পূর্বে তার নিজেরই সতর্ক হওয়া উচিত। কেননা এ কথা বলার দ্বারা তার নিজের পিতা-মাতারই বিবাহ বিশুদ্ধ হয় না। আর সে হিসেবে তিনি 'জারজ' সন্তান বলে বিবেচিত হবেন।

এ ছাড়া তিনি জীবনের দীর্ঘ একটি সময় নিজেও হানাফী ছিলেন। তার জীবনীতে লেখা হয়েছে- الحنفي (قديمًا) ، ثم الإمام المجتهد (بعد)

-"প্রথম জীবনে হানাফী, পরবর্তী জীবনে নিজেই মুজতাহিদ ইমাম।"[৪২]

তিনি যদি হানাফী মাযহাবকে ইঞ্জিলের সমতুল্য মনে করে থাকেন, তবে তিনি প্রথম জীবনের যে সময়টাতে হানাফী ছিলেন সে সময়ে তিনি কি মুসলমান ছিলেন?

ডা. জাকির নায়েকের উস্তাদের অবস্থা যদি হয় এই, তবে তার অনুসারী হিসেবে তার কী অবস্থা হবে? ডা. জাকির নায়েক এমন এক ব্যক্তিকে অনুসরণীয় বানিয়েছেন, যিনি সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে এবং হককে বাতিলের সঙ্গে মিশ্রিত করতে সামান্যতম দ্বিধা করেন না।

শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানীর মতো ডা. জাকির নায়েকও একই পথে অগ্রসর হয়েছেন। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীর উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে ডা. জাকির নায়েকের নিচের বক্তব্যটি মিলিয়ে দেখুন।

Imam Abu Hanifa never came to start a new Hanafi Madhab. Imam Malek never came to start a new Maleki Madhab. Imam Shafi never came to start a new Shafi Madhab. Imam Ahmad Ibn Hambol never came to start a new hamboli Madhab. All of them followed the Madhab of the Rasul. Like how the

৪২. সাবাতু মুয়ালাফাতিল আলবানী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আশ্-শামরানী, পৃষ্ঠা-২, ১৬

Christian misunderstood Jesus (pbuh) never came to start Chrstianity, he came to Islam.

-"ইমাম আবু হানীফা নতুন কোনো হানাফী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম মালেক নতুন কোনো মালেকী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম শাফেঈ নতুন কোনো শাফেঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠার জন্য আগমন করেননি। এদের মাযহাব ছিল রাসূল (ﷺ) এর মাযহাব। বিষয়টি খ্রিস্টানদের মতো, অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যেমন ভুল বুঝে থাকে যে, হযরত ঈসা (আ.) খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন; মূলত তিনি এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য।"[৪৩]

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, পার্ট-৩, ২ মিনিট ১৩ সেকেন্ড, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

বর্তমান বিশ্বে ৯২.৫ ভাগ মুসলমান চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করে থাকে এবং অবশিষ্ট ৭.৫ ভাগ লোক শিয়া মতাবলম্বী।

(How Many Shia Are in the World?". Islamic Web.com. http://islamicweb.com/?folder=beliefs/cu lts&file=shia. population. 2006-10-18.)

দীর্ঘ তেরশ বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ মাযহাবের অনুসরণ করে আসছে, তবে কি তিনি সব মুসলমানকে খ্রিষ্টানদের মতো পথভ্রষ্ট ছিল বলে মনে করেন?

এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, ডা. জাকির নায়েক যাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী, তারা মাযহাব মানাকে কুফুরী-শিরকী মনে করে থাকে। তাদের অনুসারী হয়ে ডা. জাকির নায়েকের পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করাটা অস্বাভাবিক নয়। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী যেমন হানাফী মাযহাবকে খ্রিষ্টধর্মের সাথে তুলনা করেছে, তার অনুসারী হয়ে ডা. জাকির নায়েকেও হুবহু তা-ই করেছে।

৬. জাকির নায়েকের মাযহাবের ইমাম শায়খ আলবানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

আমি আমার এ পুস্তকটি মূলত ডা. জাকির নায়েকের খণ্ডনের জন্য লিখেছি কিন্তু ডা. জাকির নায়েক যেহেতু আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিসে আযম আলবানীর মাযহাবের বা তার অনুসারী সেহেতু তার মাযহাবের ইমামমের সংক্ষিপ্ত ভণ্ডামীর মুখোশ উন্মোচন সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। আহলে হাদিসের তথাকথিত ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃত.১৯৯৯ইং) ১৯১৪ ঈসায়ী সালে

৪৩. ডা.জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৬৭পৃ. পিস পাবলিকেন্স, ঢাকা।

ইউরোপের একটি দেশ আলবেনিয়া রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করার কারণে তাকে **আলবানী** বলা হয়। তার পুরো নাম হলো **'আবু আবদুর রাহমান মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী'**। তার পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী আল-হানাফী। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন প্রসিদ্ধ হানাফী আলেম। আলবানীও প্রাথমিক যুগে হানাফী ছিলেন যা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এবং সে তার সম্মানিত পিতার বন্ধু **শায়খ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট হানাফি মাযহাবের অনেক ফিক্হের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন**।"[৪৪] পরে সে নিজে পথভ্রষ্ট হয়ে সকল মাযহাবকেই অস্বীকার করে বসে এবং মাযহাব মানাকে হারাম, শিরক পর্যন্ত ঘোষণা করে বসে। অথচ তার সম্মানিত পিতা ও সে নিজেও প্রাথমিক অবস্থায় হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল।

আলবানী এমন কোন **হাদিস গবেষক নয়, তার অধিকাংশ সময় কেটেছে ঘড়ি মেরামত করে**।[৪৫] আহলে হাদিসগণের ঘড়ির ডাক্তার আলবানী ও দাঁতের ডাক্তার জাকির নায়েকের কথা মানতে কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু আমরা একজন তাবেয়ী ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা মানলে তাদের এত অসুবিধা। অথচ তার অনুসারীরা তার প্রশংসায় লিখেছে যে *"পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাকে দিয়েছেন তাদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহ.) ও হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর পর আল্লামা মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন আলবানী (রহ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।"*[৪৬] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাদের কাছে হাফেযুল হাদিস ইমাম সুয়ূতি (রহিমাহুল্লাহ) সহ অনেক বিজ্ঞ হাদিস বিশারদ যারা ইলমে হাদিসের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, সে মুহাদ্দীসদের কোন নাম তাদের মুখে আসলো না, আসলো

৪৪ .যা আমি লিখলাম সেগুলো হুবহু আহলে হাদিস আবুল কালাম আযাদ আলবানীর জীবনীতে এবং তার একটি আরাবী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ "ছহিহ হাদিসের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি" বইয়ের ৭-৮পৃষ্ঠায় তা লিখেছেন। (আযাদ প্রকাশন ,আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম) এ ছাড়া সৌদি আরব থেকে তাঁর আরাবীতে বিশাল জীবনী গ্রন্থ "সাবাতু মুয়ালাফাতিল আলবানী" (যা লিখেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আশ্-শামরানী) বের হয়েছে সেখানেও লিখা হয়েছে তিনি প্রথমে হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন পরে মুজতাহিদ হয়ে গেছেন। (পৃ.২ ও ১৬)

৪৫ আবুল কালাম আযাদ আলবানীর জীবনীতে এবং তার একটি আরাবী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ "ছহিহ হাদিসের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি" বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় তা লিখেছেন। (আযাদ প্রকাশন, শাহী জামে মসজিদ,আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম)

৪৬ আবুল কালাম আযাদ আলবানীর জীবনীতে এবং তার একটি আরবি পুস্তকের বাংলা অনুবাদ "ছহিহ হাদিসের পরিচয় ও হাদীছ বর্ণনার মূলনীতি" বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় তা লিখেছেন। (আযাদ প্রকাশন ,আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম)

পৃথিবীর সবচেয়ে ভুয়া তাহক্বীককারী আলবানীর নাম! অথচ সে ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)'র সমালোচনা করেছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হবে।

আলবানী অসংখ্য মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসকেও দ্বঈফ ও মওদ্বু বা জাল বলে তার বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৪৭] সেগুলো আমি এখানে দ্বিতীয়বার আলোচনা করতে চাই না কারণ আমি আমার লিখিত গ্রন্থ "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" এর ১ম, ২য় ও তৃতীয় খণ্ডে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হাদিসের আলোচনায় তার এ ভুয়া তাহক্বীকের জবাবে আলোচনা করেছি। আর আপনারা যদি আলবানীর আক্বিদা ও তার ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ১ম খণ্ড ৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দেখুন এবং আমার প্রকাশের পথে **"পৃথিবীর সবচেয়ে ভুয়া তাহকীককারী শায়খ আলবানীর পরিচয়"** দেখুন, আশা করি সে কী তা আপনারা বুঝতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ!

এ আলবানী নামক লোকটির সমালোচনা থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞবিজ্ঞ ইমামগণও মুক্ত ছিলেন না। সে তার 'সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অনেক ইমামদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তা আমি এ গ্রন্থে ব্যাপকভাবে আনতে চাইনা। কেননা, এ বিষয়ে আমার ভিন্ন আলাদা পুস্তক রয়েছে। তবে ধারণার জন্য সামান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১.আলবানী কর্তৃক ইমাম তিরমিযির সমালোচনা ঃ

তিরমিযীর ব্যাপারে লিখেছেন

كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية؟ !

-"ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে কত যে মওদ্বু বা জাল ও অত্যন্ত দুর্বল সনদকে যে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলে ফেলেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই।"[৪৮] অন্য স্থানে তাঁর একটি হাদিসের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখেন-

فقد أخطأ من قلد الترمذي في تحسينه

৪৭ . বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ১ম ও ২য় খণ্ড দেখুন।

৪৮ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ, ১/৮৫পৃ. অপরদিকে ইমাম তিরমিযীর উপর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের অনুরূপ আপত্তি তুলেছেন তার "হাদিসের নামে জালিয়াতি" (চতুর্থ সংস্করণ) বইয়ের ২০১পৃষ্ঠায়। তার বক্তব্যে বুঝা যায় সে মূলত আলবানীরই একজন উত্তরসূরী।

-"এ হাদিসকে ইমাম তিরমিযির 'হাসান' বলাটা ভুল, আর এটা হয়েছে সে তাক্বলীদ অনুসরণের কারণে।"[৪৯] নাউযুবিল্লাহ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আলবানীর এ আপত্তিগুলোর খণ্ডন জানতে আপনারা আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* গ্রন্থের প্রথম খন্ডের এর ৬৯-৭০ এবং ৬৩-৬৮পৃষ্ঠা দেখুন। সেখানে আমি সবিস্তারিতভাবে তার জবাব দিয়েছি।

২.আলবানী কতৃক ইমাম ইবনে কাসিরের সমালোচনা ঃ

ইবনে কাসিরের নিম্নের এ বক্তব্য-

أنه التزم فيه أن لا يورد فيه الأحاديث الضعيفة

-"নিশ্চয় এ কিতাবে দ্বঈফ হাদিস বর্ণনা না করাটাকে আমি নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছি।"

আলবানী তার এ বক্তব্যকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলেন-

فقد ذكر في كتابه هذا عشرات الأحاديث الضعيفة والمنكرة

-"কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি তার তাফসীরে ইবনে কাসিরে ১০টি দ্বঈফ এবং মুনকার হাদিস এনেছেন।"[৫০]

৩. শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর প্রতি অভিশাপ ঃ

সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী লেখেন-

اشل الله يدك وقطع لسانك يدعو على العلامة الشيخ عبد الفتاح ابى غدة يقول عنه : انه غدة كغدة البعير ثم يقول مستهزأ ضاحكا : اتعرفون غدة-

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমার হাত অবশ করে দিক এবং তোমার জিহ্বাকে কর্তন করুক।"[৫১]

৪৯ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ, ১২/৩৩২পৃ.
৫০ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ, ৩/২১৫পৃ. হাদিস ঃ ১০৯৪
৫১ . আলবানী, কাশফুন নিকাব, পৃষ্ঠা-৫২

তিনি আরও বলেন, সে হলো উটের প্লেগ রোগের মতো একটা মহামারি (গুদ্দাতুল বায়ীর)। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে উপহাস করে বললেন, তোমরা কি জান, উটের প্লেগ কী ?

(http://www.youtibe.com/watch?v=RpKoWWUECU&feature=player_embedded)

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ঃ

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (১৩৩৬/১৯১৭-১৪১৭/১৯৯৭) যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্যতম। মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এবং কিং সাউদ ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ১৯৭৬ সালে সুদানের টস Durman Islamic University: এবং ১৯৭৮ সালে ইয়েমেনের সানআ' ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। শায়েখের জীবদ্দশায় তার ৬৫ খানা কিতাব প্রকাশিত হয়।

শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী মূলত ইবনে হাযম যাহেরীর অনুসরণ করে থাকেন। ইবনে হাযম যাহেরী যে সমস্ত ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, অধিকাংশ পদ্ধতি শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানীর মাঝে পাওয়া যায়। যেমন, হাদীস সহীহ বা দ্বয়ীফ বলার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা। এমন সব বিকৃত মাসআলা প্রদান, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষভাবে, উলামায়ে কেরামের প্রতি অশালীন শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত। আমার ধারণা মতে, এ বিষয়টিও তিনি ইবনে হাযম এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনে হাযম সম্পর্কে লেখেন-"ইমামদের প্রতি সে অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছে বরং তাদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছে, তাদেরকে গালি দিয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে অশ্লীল উক্তি করেছে। সুতরাং তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে তার লাগামহীন ভাষার কারণে সে মুসীবতের সম্মুখীন হয়েছে।"[৫২]

৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সর্ম্পকে আলবানীর উক্তি :

ড. ইউসুফ আল-কারযাবী আলবানীর ভুয়া তাহক্বীক তার বিভিন্ন গ্রন্থে করায় তিনি তাঁর সম্পর্কে লিখেন-

صرف نظرك عن القرضاوى واقرضه قرضا-

৫২ .যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড- ১৮, পৃষ্ঠা-১৮৪

-"তুমি ইউসুফ কারযাবী থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখো এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো।"

তিনি ড. ইউসুফ আল-কারযাবী সম্পর্কে আরও বলেছেন-

ان يوسف القرضاوى يفتى الناس بفتاوى مخالفة للشريعة وله فلسفة خطيرة-

"ইউসুফ আল-কারযাবী শরীয়তবিরোধী ফতোয়া প্রদান করে, তার কাছে রয়েছে ভয়ঙ্কর সব দর্শন।"

(http://www.youtube.com/watch?v=yRpKpWWUECU&feature=player_embedded)

৫.আহলে হাদিসদের শায়খুল ইসলাম ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে তার বক্তব্য :

হাদীসুল গদীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী তাদের (আহলে হাদিসদের) ইমাম ইবনে তাইমিয়া[৫৩] সম্পর্কে লেখেন-

أني رأيت شيخ الإسلام بن تيمية، قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأماالشطر الآخر، فزعم أنه كذب ! وهذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها. والله المستعان.

-"আমি শায়খ ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি, তিনি হাদিসের প্রথম অংশকে দুর্বল বলেছেন এবং হাদিসের শেষ অংশকে তিনি মিথ্যা মনে করেছেন। আমার ধারণামতে, হাদিসকে দ্বঈফ বলার ক্ষেত্রে এটি ইবনে তাইমিয়া এর বাড়াবাড়ি, যা তাকে হাদিসটি দ্বঈফ বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে; অথচ তিনি হাদিস বর্ণনার বিভিন্ন সনদ খতিয়ে দেখেননি এবং এ ব্যাপারে গভীর দৃষ্টিপাত করেননি।"[৫৪]

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহের সমালোচনা করেছে। সালাফীদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এবং আব্দুল ওহাব নজদী কে তাদের মাইলফলক মনে করে থাকে। কিন্তু শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী সমস্ত আলেমের ক্ষেত্রে সব ধরনের নিয়ম-কানুনের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে এবং যেখানে যেভাবে ইচ্ছা তাদের সমালোচনা করেছে। আহলে হাদিসদের

৫৩. ইবনে তাইমিয়া হাদিসটি সম্পর্কে তার প্রসিদ্ধ কিতাব "মাজমূউল ফাতওয়ার ৪/৪১৭-৪১৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছিলেন।

৫৪. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস্-সহীহা, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ৩৪৩-৩৪৪, হাদীস নং-১৭৫০

ইমাম ইবনে তাইমিয়া "কালিমুত তাইয়্যিব" নামক বিখ্যাত একটি কিতাব রচনা করেছেন। শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী সে কিতাবের হাদিসগুলো বিশ্লেষণ করে একটি কিতাব লিখেছে, 'সহীহুল কালিমিত তাইয়্যিব'। এ কিতাবে নাসিরুদ্দিন আলবানী লিখেছে-

انصح لكل من وقف على هذا الكتاب (الكلم الطيب لابن تيمية) وغيره :ان لا يبادر الي العمل بما فيه من الاحاديث الا بعد التأكيد من ثبوتها وقد سهلنا له السبيل الي ذلك بما علقنا عليه فما كان ثابتا منها عمل به.....والاتركه-

-"যারা ইবনে তাইমিয়ার এ কিতাবটি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তাদেরকে নসীহত করবো, এ কিতাবে যে সমস্ত হাদিস রয়েছে, <u>সেগুলোর প্রতি তারা যেন আমল করতে অগ্রসর না হয়।</u> যতক্ষণ না হাদিসগুলো শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়। আমি এর উপর যে টীকা সংযোজন করেছি, এর মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং যে সমস্ত হাদিস প্রমাণিত হবে, সেগুলোর উপর আমল করা হবে, নতুবা সেটি পরিত্যাগ করা হবে"। [সহীহুল কালিমিত তৈয়্যব, পৃষ্ঠা-৪]।

নাসিরুদ্দিন আলবানীর এ কথা উল্লেখ করে আল্লামা হাবীবুর রহমান আজমী (রাহিমাহুল্লাহ) লেখেন-

وليس يعنى الالبانى بذلك الا انه يجب على الناس ان يتخذوه اماما ويقليدا اعمى" فى الثقات الا حاديث حتى يسألوا الالبانى وير جعوا الى تحقيقاته-

-"নাসিরুদ্দিন আলবানীর এ কথা বলার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন আবশ্যকভাবে <u>তাকে ইমাম বানায়</u> এবং তার <u>অন্ধ অনুকরণ করে</u> এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আলবানীকে জিজ্ঞেস না করবে এবং তার বিশ্লেষণকে গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লামা ইবনে তাইমিয়াসহ অন্য কোনো বিশ্বস্ত ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহাদ্দিসের হাদিসের উপরও নির্ভর করবে না।"[৫৫]

মূলত শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত অধিকাংশ মুহাদ্দিসের হাদিসের সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি হাদিসশাস্ত্রের কোনো মূলনীতিরও তোয়াক্কা করেননি। বড় বড় মুহাদ্দিসগণ যে সমস্ত হাদিসকে সহিহ বলেছেন, আবার তারা যেটাকে দ্বয়ীফ বলেছেন, তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সেগুলোকে সহিহ বলেছেন।

সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি আব্দুল্লাহ ইবনে বাযের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানী একটি হাদিসকে এক কিতাবে সহিহ বলেছে, অন্য কোথাও সেটিকে আবার দ্বঈফ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের সমকালীন

৫৫. হাবিবুর রহমান আজমী, আল-আলবানী শুযুযুহু ও আখতাউহু, পৃষ্ঠা-৪০

অন্যতম মুফতি আব্দুল্লাহ বিন বায্ (মৃত. ১৪২০হি.) তাঁর ফাতওয়ার গ্রন্থে আলবানী সম্পর্কে প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন-

ج : بسم الله والحمد لله، الشيخ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا الثقات المعروفين بالعلم والفضل والعناية بالحديث الشريف تصحيحا وتضعيفا، وليس معصوما بل قد يخطئ في بعض التصحيح والتضعيف، ولكن لا يجوز سبه ولا ذمه ولا غيبته، بل المشروع الدعاء له بالمزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل، ومن

-"আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহর শোকর.....তিনি এমন নয় তিনি মা'ছুম বা নিষ্পাপ ছিলেন, বরং তিনি হাদিস সহিহ যঈফ নির্ণয়ে ভুল ভুল করেছেন।" (মাজমাউয়ায়ে ফাতওয়া, ২৫/৭১পৃ., ও ইবনে বায, দারুস ইবনে বায, ১১/২৬পৃ.) ইবনে বায এবং সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ হাম্বলী ফকিহগণ রুকুর পরে হস্তদ্বয় একত্র করে দেহের উপর রাখাকে 'সুন্নাত' বা সুন্নাহ নির্দেশিত 'মুস্তাহাব' বলে গ্রহন করেছেন। আলবানী বিদআত বললে ইবনে বায তার কিতাবে লিখেন-

خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها

-"এটি তার প্রকাশ্য ভুল। আমাদের জানা মতে তাঁর পূর্বে কোনো আলিম এ কথা বলেন নি। তার বক্তব্য অনেক সহিহ হাদিসগুলোর বিপরীত।" (মাজমাউল ফতোয়ায়ে ইবনে বায, ১১/১৩৮পৃ.)

প্রমাণিত হলো যে, সে যে ভুয়া তাহকীককারী সেটা তাদের দলের মুফতিই স্বয়ং স্বীকার করলেন। এ ধরনের হাদিসের সংখ্যা একটি-দু'টি নয়। অসংখ্য হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি এ ধরনের স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছেন; অথচ ডা. জাকির নায়েক শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানীকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মনে করে থাকেন। তিনি এমন ব্যক্তির হাদিসের উপর নির্ভর করেছেন, যিনি হাদিস শাস্ত্রের কোনো মুহাদ্দিসকে তার সমালোচনা থেকে মুক্তি দেননি এবং হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে তার সুপ্রমাণিত কোনো সনদ নেই।

৬. আলবানী কর্তৃক ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) এর সমালোচনা ঃ

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহ.) {ওফাত. ৯১১হি.} তার কিতাবে একটি আলবানীর দৃষ্টিতে অত্যন্ত দ্বঈফ হাদিস সংকলন করেছেন বলে সে তাঁর সম্পর্কে লিখেন-

فيا عجبا للسيوطي كيف لم يخجل من تسويد كتابه " الجامع الصغير " بهذا الحديث؟ !

-"কী আশ্চর্য! জালালুদ্দিন সূয়ূতি তার জামে সগীরে কিতাবে এ হাদিস উল্লেখ করতে একটু লজ্জাবোধ করলেন না![৫৬]

তার এ কিতাবের অন্য স্থানে আরও লেখেন- وجمع حوله السيوطي في " اللآلىء

-"জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রহ.) হাঁকডাক (তার উদ্ধৃতি দেয়া মানে হট্টগোল করার মত) ছেড়ে থাকেন।"[৫৭] ইমাম সুয়ূতী (রহ.) তার 'জামেউস সগীর' কিতাবের ভূমিকায় বলেন- أنه صانه عمّا تفرد به كذّابٌ أو وضّاعٌ، -"আমি মনগড়া হাদিস থেকে এবং মিথ্যুকদের বর্ণনা থেকে এ গ্রন্থকে হিফাযত করেছি।"[৫৮] আলবানী তার এ কথার প্রতিবাদে লিখেন-

كما تراه مفصلاً في "ضعيف -"আমি (আলবানী) দেখতে পাচ্ছি তার এ বক্তব্যটির মাঝে দুর্বলতা আছে।"[৫৯]

আলবানী কর্তৃক ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবি এবং আল্লামা মুনযিরির সমালোচনা ঃ

ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবি এবং আল্লামা মুনযিরি (রহ.) সম্পর্কে আলবানীর উক্তি- নাসীরুদ্দিন আলবানীর দৃষ্টিতে একটা হাদিস সহিহ নয়, অথচ অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে সহীহ বলায় তিনি হাদিসের বিখ্যাত তিন মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম, ইমাম যাহাবী ও ইমাম মুনযিরী (রহ.) সম্পর্কে বলেছেন-

وقال الحاكم: صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! وأقره المنذري في " الترغيب " (٣/١٦٦) ! وكل ذلك من إهمال التحقيق، والاستسلام للتقليد، وإلا فكيف يمكن للمحقق أن يصحح مثل هذا الإسناد،

-"হাকেম বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ইমাম মুনযিরী (রহ.) "তারগীব ও তারহীব" নামক কিতাবে তার

---

৫৬ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭৯, হাদীস নং-১৩১৪

৫৭ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৯, হাদীস নং-১৬৯৩

৫৮ . সুয়ূতী, জামেউস সগীর, ১/৫পৃ. দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ.১৪১২হি.

৫৯ .আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ, ৩/২৪পৃ. হাদিস,২ দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদি, প্রকাশ.১৪১২হি.

স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এটি হয়েছে, তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রতি আত্মসমর্পণ তাক্বলীদের (অন্ধানুকরণ), নতুবা একজন বিশ্লেষণধর্মী আলেম কিভাবে একে সহিহ বলতে পারেন।"[৬০] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম যাহাবী (রহ.) যাঁর আসমাউর রিজালের কিতাব না পড়লে কেউ হাদিসের সনদ নিয়ে আলোচনা করতে অক্ষম, তাকে 'ঘড়ি মেরামতকারী' আলবানী হাদিস সহিহ, দ্বঈফ শিখাতে চাচ্ছেন! ইমাম হাকেম নিশাপুরী তার যুগে তার মত কোনো মুহাদ্দিস ছিল না। (দেখুন বুস্তানুল মুহাদ্দিসীনে তাঁর জীবনীতে)

আলবানী কতৃক ইমাম হাফেয তাজুদ্দিন সুবকী (রহ.)'র সমালোচনা ঃ

হাফেয তাজুদ্দিন সুবকী (রহ.) সম্পর্কে নাসীরুদ্দিন আলবানী মন্তব্য করেছেন-

ولكنه دافع عنه بوازع من التعصب المذهبي، لا فائدة كبرى من نقل كلامه وبيان ما فيه من التعصب

-"মাযহাব অনুসরণের গোঁড়ামি তাকে প্ররোচিত করেছে। তার কথা উল্লেখ করে এবং তার গোঁড়ামির কথা আলোচনা করার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো উপকারিতা নেই।"[৬১] ইমাম আবু নসর তাজুদ্দিন আব্দুল ওহাব বিন আলী বিন আব্দুল কাফী (৭১৭-৭৭১হি.)। তাজুদ্দিন সুবকি (রহ.) শায়খুল ইসলাম ও কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) তকিউদ্দিন সুবকি (রহ.) এর ছেলে। তিনি বিখ্যাত কিছু কিতাব রচনা করেছেন- আল-কাওয়াইদুল মুশতামিলা আলাল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, জামউল জাওয়ামে' ইত্যাদি।

আলোচনা থেকে যা বুঝলাম ঃ

আহলে হাদিস আলবানীর যদি এমন অবস্থা হয় তা হলে তার অন্ধভাবে অনুসরণকারী ডা.জাকির নায়েকের অবস্থা কী হবে?

এখানে সামান্য কয়েকটি কিতাবের নাম দেয়া হলো সামনে আলবানীর খণ্ডনে পুস্তকে বিস্তারিত পাবেন ইনশাআল্লাহ। শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন,

الشيخ ناصر الدين الالبانى شديد الولوع بتخطئة الحذاق من كبار علماء الاسلام ولا يحابى فى ذلك أحدا كائنا من كان فتراه يوهم البخارى ومسلما ومن دونهم ويغلط ابن عبد البر وابن حزم والذهبى وابن حجر والصنعانى ويكثر من ذلك

৬০. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্ব-দ্বঈফা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৪১৬, হাদীস নং- ১২৫৯
৬১. আলবানী, সিল-সিলাতুল আহাদিসু দ্বয়ীফাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫, হাদিস নং-৮৮১

حتى يظن الجهلة والسذج من العلماء ان الالبانى نبغ فى هذا العصر نبوغا يندر مثله-

-"শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী পৃথিবী বিখ্যাত গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেমদের ভুল ধরার ব্যাপারে চরম বেপরোয়া। এ পথে তিনি কাউকেই মুক্তি দেননি। আপনি দেখবেন! সে ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিমসহ অপরাপর ইমামদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইবনে আব্দুল বার (রহ.), ইবনে হাযাম (রহ.), ইমাম যাহাবী (রহ.) ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.), ইমাম সানআনী (রহ.)সহ আরো অনেককে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ অনেক অজ্ঞ এবং সাধারণ আলেম তাঁকে বর্তমান যুগের বিরল ব্যক্তিত্ব মনে করে থাকেন।" (শায়খ হাবিবুর রহমান আজমী, আলবানী শুযুযুহু ও আখতাউহু, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯) বর্তমান বিশ্বের যে সমস্ত আলেম শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর এ সমস্ত ভ্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং এ সম্পর্কে কিতাব লিখেছেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো–

১.শায়খ হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.)। তাঁর রচিত কিতাবের নাম

الألبانى شذوذه وأخطاؤه

২. উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আল-গুমারী (রহ.)। তাঁর কিতাবের নাম হলো-

القول المقنع فى الرد على الألبانى المبتدى

৩.শায়েখ আব্দুল আযীয গুমারী-

بيان نكث الناكث المقعدى بتضعيف الحارث

৪.শায়েখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-খাজরাযী

الألبانى تطرفه

৫. উস্তাদ বদরুদ্দিন হাসান দিয়াব দামেশকী-

أنوار المصابيح على ظلمات الألبانى فى صلاة التراويح

৬. শামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ আল-হারারী,

التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث

৭. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.)

اين يضع المصلى يده فى الصلاة بعد الرفع من الركوع

৮. শায়েখ ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আনসারী (রহ.)

تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة والرد على الألبانى فى تضعيفه

৯. শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)

كلمات فى كشف أباطل وافراءات

১০. শায়েখ হাসান ইবনে আলী আস-সাক্কাফ

قاموس شتائم الألبانى وألفاظه المنكرة فى حق علماء الأمة وفضلائها وغيرهم

১১. শায়েখ হাসান বিন আলী আস-সাক্কাফ,

البشارة والاتحاف فيما بين ابن تيمية والألبانى فى العقيدة من الاختلاف

এখানে সমান্য কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো। শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানীর ভ্রান্ত বিষয়গুলোর সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ অধিকাংশ আলেম স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। "সাবাতু মুয়াল্লাফাতিল আলবানী"-এর গ্রন্থকার এ ধরনের ৫টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। এ সমস্ত গ্রন্থে শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর ভ্রান্তিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। গাইরে মুকাল্লিদ আলেমদের মধ্যে যারা শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী এর এ সমস্ত ভ্রান্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো– ১. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায। ২. শায়েখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ। ৩. ড. বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ। ৪. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আদ-দাবীশ ৫. সফর বিন আব্দুর রহমান। ৬. মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান সা'আদ। ৭. শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মা'নে আল-উতাইবি। ৮. শায়েখ ফাহাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সুনাইদ। ৯. আবু আব্দুল্লাহ মুস্তফা আল-আদাবী। জামেয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ-এর দাওয়া বিভাগের প্রধান ড. আব্দুল আযীয আল-আসকার শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী এবং তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে লিখেছেন,

الألبانى وتباعه ليسوا سلفيه

"আলবানী এবং তার অনুসারীরা মূলত সালাফী নয়" অর্থাৎ এরা সালাফী (পূর্ববর্তীদের অনুসারী) হওয়ার দাবি করে; কিন্তু বাস্তবে এরা সালাফী নয়। (জারিদাতু উকায, মাজালুর রায়, http://www.soufia.o rg/alalbany_as kar.html) সুতরাং ডা. জাকির নায়েক যাদেরকে অনুসরণ করছেন, যাদের মতাদর্শ সমাজে প্রচার করছেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যেমন সমগ্র বিশ্বের মানুষের নিকট সংশয় রয়েছে, তেমনি কেউ যদি তাদের মতাদর্শ প্রচার করে, তবে তার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা অনুমেয়। অতএব, সর্বশেষ কথা হলো, তাবেয়ী ইবনে সিরিন (রহ.) বলেছেন-

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

-"নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং লক্ষ রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।"(সহিহ মুসলিম, ১/১৪পৃ.)

৭. জাকির নায়েক আহলে হাদিস হওয়ার সুস্পষ্টতার প্রমাণ ঃ

জাকির নায়েক আহলে হাদিস হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায় তার তথ্য গ্রহণ করা স্টাইলে। সে বুখারী মুসলিম ছাড়া কোন হাদিস বললেই বলে আলবানী এ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন বা হাসান, দ্বঈফ বলেছেন বলে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া ইবনে তাইমিয়া, শাওকানীসহ সকল লা-মাযহাবি ইমামদের দলিলে তার লেকচার পরিপূর্ণ।[৬২] এক স্থানে জাকির নায়েক বলেন-"আমি শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীকে শ্রদ্ধা করি, আহলে হাদিসদেরকে শ্রদ্ধা করি। আর অন্যান্যরাও আমার সাথে একমত হবেন যে, সালাফীরা আহলে হাদিসরা কুরআন হাদিসের সবচেয়ে কাছাকাছি।"[৬৩] তাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো সে যে একজন আহলে হাদিস বা লা-মাযহাবী। বাংলাদেশের অন্যতম সুপরিচিত একজন লা-মাযহাবী শায়খ রাজ্জাক বিন ইউসুফ ডা. জাকির নায়েকের প্রশংসায় বলেন-"*জাকির নায়েককে মানুষ যারা যারা কাফের বলছে, ঠিক তাদের কাফের বলা কথাটি আকাশের দিকে থুথু দেয়া। আকাশের দিকে থুথু দিলে মুখের উপরেই পড়বে। অতএব, তাই জাকির নায়েক কে কাফের বলে এসব মিডিয়া ঠেকানো যাবে না।*"[৬৪] বাংলাদেশের অন্যতম বাতিল আক্বীদা পোষণকারী মওদূদী মার্কা আলেম দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তাঁর এক বক্তব্যে জাকির নায়েকের প্রশংসায় বলেন-"আমার মনে হয় (জাকির নায়েক) মুসলিম মিল্লাতের জন্য আল্লাহর এক নেয়ামত। আল্লাহ জাকির নায়েকের হায়াত দারাজ করে দাও, তার স্মৃতি শক্তি আরও বাড়াইয়া দাও।"[৬৫]

৮. জাকির নায়েকের আসল ব্যাপারটা কী?

জাকির নায়েকের বিভিন্ন লেকচারে খৃষ্টানদের প্রচার এবং অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের ধর্মের প্রচরের সুযোগ খুলে দিচ্ছে যার দ্বারা বুঝা যায় সে কাদের দালালি করতে যাচ্ছে। এ রকম দালালির কিছু নমুনা এ কিতাবের সামনে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৯. ডা. জাকির নায়েক সালাফি ও মওদুদীদের বন্ধু ঃ

ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্যের দর্শনের মধ্যে রয়েছে মওদুদী মতবাদের প্রতিচ্ছবি। আপনি লক্ষ করলে দেখবেন যে, জাকির নায়েকের অধিকাংশ ভক্ত-অনুরক্ত মুওদূদীবাদী, না হলে ইসলামী জ্ঞান বহির্ভূত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান

---

৬২ . ডা.জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/১০৫পৃষ্ঠা

৬৩ . ডা.জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/১০২পৃষ্ঠা.

৬৪ . এ আহলে হাদিস পণ্ডিতের বক্তব্যটি ইউটিউবে পাবেন এ শিরোনামে Dr Zakir Naik-ke kafir bola ar akasher dike thu-thu chura ek-e by Abdur Razzk

৬৫ . এ আহলে হাদিস পণ্ডিতের বক্তব্যটি ইউটিউবে পাবেন এ শিরোনামে "ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে আল্লামা সাঈদী বলেন" সার্চ করে।

তরুণ-তরুণী। সুতরাং এ কথা খোলাসা হয়ে গেল যে, ডা. জাকির নায়েক মওদূদী ও সালাফিদের বন্ধু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। যাকে বলা যায় 'পুরান বধূর নতুন শাড়ী'। তাই তিনি ইসলামী ভাষ্যকার সেজে মওদুদী ও সালাফীদের ভাষ্যকারের কাজ করে যাচ্ছেন। তাই সত্যানুসন্ধানীদের বিষয়টা অনুধাবন করা দরকার। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ভয় করা আলেমদের বৈশিষ্ট্য। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

-"নিশ্চয় এই ইলম হচ্ছে দ্বীন। তাই তোমাদের দ্বীন কার কাছ থেকে শিখতে যাচ্ছ, তাকে আগে দেখে নাও।" (সহিহ মুসলিম, ১/১৪পৃ.)

১০. কেন জাকির নায়েকের কথা অনুসরণ করা যাবে না ঃ

ইলমী ও ইসতিম্বাতী মাসায়েল বর্ণনা এটা শুধুমাত্র মুহাক্কিক আলেমগণই করতে পারেন। আলেমগণ ব্যতীত অন্য কেউ এ কাজ করলে সমাজে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ছড়াবে। তাই ডা. জাকির নায়েক যেহেতু মুফাস্সির, মুফতি, কিংবা মুহাদ্দিস নন সেহেতু তার কথা অনুসরণ করা গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর শেষ যামানায় জাকির নায়েকের মত এমন ধরনের লোকদের আবির্ভাব হবে বলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) সতর্ক করে গেছেন। তাই নবীজি বলেছেন-

«فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»

-"যখন বিজ্ঞ আলেম থাকবে না আখিরী যামানার লোকেরা জাহেলদেরকে ধর্ম বিজ্ঞ মনে করে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট প্রশ্ন হবে, আর তারা সে বিষয়ে ইলম ছাড়াই উত্তর দিবেন। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে।"[৬৬]

১. আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, "কোন বিষয়ে উত্তর দেয়া ও মাসআলা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অপরদিকে তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।"(মুকাদ্দামাতু কিতাবিল মাজমূ, ১/৯২পৃ.)

২. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) ও আল্লামা সুহনূন (রহ.) বলেন "যার ইল্‌ম কম, (অনেকাংশে) এমন লোক নানাবিষয়ে জাওয়াব দেয়ার ক্ষেত্রে বেশী দুঃসাহস দেখায়।"(ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ১/২৮পৃ.)

৬৬. সহিহ বুখারী, ১/৩১পৃ. হাদিস নং.১০০

৩. তাবে-তাবেয়ী আল্লামা ইবনে মুনকাদার (রহ.) বলেন -"আলেম আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের মাঝে মাধ্যম হয়ে থাকে।"[৬৭] মাস'আলা বলা ও ফাতওয়া দেয়া এতো কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণেই অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কিরামও এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন এবং বিষয়টি একজন অন্যজনের কাছে সোপর্দ করতেন।

৪. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন,-"যদি ইলম মিটে যাওয়ার আশংকা না থাকতো, তাহলে আমি ফাত্ওয়া দিতাম না।"[৬৮]

৫. ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন,

قال أبو مصعب: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ: مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُوْنَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ.

-"ইমাম আবু মাছ'আব (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.) কে বলতে শুনেছি, সত্তরজন আলেম আমার ফাত্ওয়া দেয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে পরে আমি ফাতওয়া দেয়ার কাজ আরম্ভ করি।"[৬৯] পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং এ সকল উক্তি দ্বারা বুঝে আসে যে, ইলমী ও ইস্তেম্বাতী কাজ শুধু মুহাক্কিক উলামা ও ফকিহগণই করতে পারেন। অন্য কেউ নয়। আর জাকির নায়েকের তো প্রশ্নই আসে না। তবে তিনি শুধু ইসলামের সাথে বিভিন্ন ধর্মের সাথে মিলপূর্ণ বিষয় দিয়েই যদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষদেরকে আহবান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলেই চলতো। তিনি ইসলামী ফিক্হ বিষয়ে অভিজ্ঞ না হয়ে মুফতি সাজাই তার জন্য ভয়ংকর হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। **আর হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আলেম ও ফকীহ হতে হলে, সনদপ্রাপ্ত আলেম ও ফকিহ এর কাজ থেকে ইলম ও ফিক্হ শিক্ষা করার এবং তাদের সত্যায়নের মাধ্যমেই হতে হবে।** যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

৬৭. খতিবে বাগদাদী, কিতাবুল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১১৮পৃ.
৬৮. খতিবে বাগদাদী, কিতাবুল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৬৮পৃ.
৬৯. খতিবে বাগদাদী, কিতাবুল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৫৪পৃ.,যাহাবী, সিয়ারু আলামীন আন নুবালা, ৭/১৭৯পৃ. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৫৪পৃ. আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩১৬পৃ.

-"হে মানুষ সকল! গ্রহণযোগ্য ইলম সেটাই-যা নবীদের ও তাদের ওয়ারীসদের থেকে শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা হয়। আর আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকেই দ্বীনের ফকিহ বানান। আর আলেমরাই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন।"[৭০] ইবনে হাজার আসকালানী বলেন এ সনদটি 'হাসান'।[৭১] সুতরাং নির্ভরযোগ্য আলেম উস্তাদ ছাড়া নিজস্ব পড়াশুনা ও গবেষণার দ্বারা আলেম ও মুফতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবার ১২২ নং আয়াত দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

-"মু'মিনদের প্রত্যেক গোত্র থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের তাফাক্কুহ (গভীর জ্ঞান) অর্জন করে এবং ফিরে এসে স্বীয় সম্প্রদায় (মুসলমানদের) সতর্ক করে।" আমাদের জানা মতে ডা. জাকির নায়েক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় একজন ডাক্তার। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষিত আলেম নন। তিনি নিজেকে আলেম বলে দাবীও করেন না। তেমনি তার ডাক্তাররাও কেউ তাকে আলেম বলেন না। বরং ডাক্তার হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। ব্যক্তিগত পড়াশোনা ও গবেষণার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ধর্মের বই পুস্তক পড়ার কারণে তিনি একজন মুসলিম স্কলার হয়েছেন বটে, তবে এর দ্বারা আলেম হয়ে যাননি। যেমন ঘরে বসে পড়াশোনা করে কেউ ডাক্তার হতে পারেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ এক নজরে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ সমূহ

১. শিয়া সুন্নীদের পার্থক্য রাজনৈতিক বলে ভ্রান্ত মতবাদ

ভিয়াস নামের এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন শিয়া এবং সুন্নীদের মৌলিক মত বিশ্বাসের পার্থক্যটি ঠিক কোথায়? জবাবে ডা. জাকির নায়েক বলেন, -"শিয়া এবং সুন্নীদের মধ্যে যে পার্থক্য এটি কোন ধর্মীয় পার্থক্য নয়। এটা একটি রাজনৈতিক পার্থক্য।"[৭২]

---

৭০. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৯/৩৯৫পৃ. হাদিস ঃ ৯২৯, ও মুসনাদিস সামীন, ১/৪৩১পৃ. হাদিস ঃ ৭৫৮, বায়হাকী, আল-মাদখাল, ১/২৫৩, হাদিস ঃ ৩৫২, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ১/১৬১পৃ.

৭১. ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ১/১৬১পৃ.

৭২. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৪, পৃ: ৩৫৮

ইসলামী আক্বীদা ঃ ডা. জাকির নায়েকের ধর্মীয় জ্ঞান মূর্খতাই এর জন্য দায়ী। শিয়া সুন্নী পার্থক্য মূল আক্বীদাগত। শিয়াদের এমন কিছু আক্বীদা রয়েছে যা মুসলমানরা বিশ্বাস করলে ঈমান থাকবে না। তন্মমধ্যে কিছু আক্বীদা উল্লেখ করছি। ওলীকূল শিরোমণি শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

فلهم اسامى منها الشيعة والرافضة ومنهم الغالية ومنهم الطيارة و انها قيل لها الشيعة لانها تشيعت عليا رضى الله عنه وفضلوه على سائر الصحابة و قيل لها الرافضة لرفضهم اكثر الصحابة وامامة ابى بكر و عمر رضى الله تعالى عنها۔

-"শীয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন-শীয়া, রাফেজী, লাগিয়া, তৈয়্যরা ইত্যাদি। তাদেরকে এ জন্য শীয়া বলা হয়, যেহেতু তারা আলী (رضي الله عنه) অনুসারী দাবি করে এবং সমস্ত সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের মধ্যে হযরত আলী (رضي الله عنه) কে সর্বোত্তম মনে করে। আর তাদেরকে এজন্য রাফেজী বলা হয় যেহেতু তারা অধিকাংশ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহুকে এমন কী হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু মাদের খেলাফত অস্বীকার করে।"(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, ১৫৫পৃ.) গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেন-

تفضيل تفضيلهم هم عليا على جميع الصحابة وتنصيصهم على امامته بعد النبى صلى الله عليه وسلم وتبريهم من ابى بكر و عمر غيرهما من الصحابة۔ ادعاءهم ان الامة ارتدت بتركهم امامة على رضى الله عنه الا ستة نفروهم على و عمار ومقداد ابن الاسود و سلمان الفارسى ورجلان اخران......وان الله لايعلم ما يكون قبل ان الاموات يرجعون الى الدنيا قبل يوم الحساب الا الغالية منهم فانهم زعمت بان لاحساب ولاحشر ومن ذلك ان الامام يعلم كل شئ ما كان و ما يكون من امر الدنيا والدين حتى عدد الحصى وقطر الامطار وورق الاشجار وان كائمة تظهر على ايدهم المعجزات كالانبياء عليهم السلام قال الا كثرون منهم ان من حارب عليا فهو كافر بالله عز وجل۔

-"সমস্ত রাফেজীগণই হযরত আলী (رضي الله عنه) কে সমস্ত সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের উপর মর্যাদা প্রদান করে থাকে এবং রাসূলে (ﷺ)-এর পর তিনিই হলেন খলিফা যা দলিল দ্বারা প্রমাণিত দাবি করে। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহুমা সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি তারা অসন্তুষ্ট। তারা আরো দাবি করে থাকে, রাসূল (ﷺ)-এর পর হযরত আলী (رضي الله عنه) কে খলিফা হিসেবে গ্রহণ না করার কারণে ছয় ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই মুরতাদ হয়ে গেছে। আর ঐ ছয় ব্যক্তি হল, হযরত আলী, হযরত আম্মার, হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ ও হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এবং আরো দু'জন। (তারা আরো বিশ্বাস করে) কোন বস্তু বা

ঘটনা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা সে সম্পর্কে কোন কিছু জানেন না। রোজ হিসাব বা কিয়ামতের পূর্বেই মৃত ব্যক্তিগণ পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসবে। রাফেজীগণের মধ্যে গালিয়া সম্প্রদায় হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়া ও পরকালীন হিসাব কিতাব সবকিছু অস্বীকার করে। রাফেজীগণ আরো বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই ইমাম অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে চাই দুনিয়াবী বা ধর্মীয় যে কোন বিষয়ে হোক সব কিছুই জানেন। এমন কী কংক্রিট, বৃষ্টির ফোঁটা ও গাছের পাতার সংখ্যা সম্পর্কেও অবহিত। নবি আলাইহিমুস সালামদের মতো ইমামদের হাতেও মু'জেজা সংঘটিত হয়। তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিদের মত হল, যারা আলী (রাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তারা সকলেই কাফের।" (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, ১৫৬-১৫৭পৃ.)

গাউছে পাক আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) আরও বলেন-"রাফেজী সম্প্রদায়ের একটি গোত্র হল ছাবাইয়া, যা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার প্রতি সম্পর্কিত। তাদের আক্বীদা হল, হযরত আলী (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় ফিরে আসবেন। .....রাফেজীদের মধ্যে আরেক গোত্র রয়েছে যারা মেঘ দেখলে হযরত আলী (রাঃ) মেঘের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বাস করে তাঁকে সালাম প্রদান করে।.....ইহুদীরা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তারা বলে ফেরেশতাগনের মধ্যে সে আমাদের শত্রু। তদ্রুপ রাফেজীদের মধ্যে একটি গোত্র রয়েছে, যারা বলে **হযরত জিবরাঈল (আ.) ভুল করে ওহী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট পৌছিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি হযরত আলী (রাঃ) প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।**"(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, ১৫৬-১৫৭পৃ.) শীয়াদের শতশত বাতিল আক্বিদা রয়েছে আপনারা সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার সম্মানিত উস্তাদ মুফতি আলী আকবার কৃত "ইসলামী সঠিকদল ও ভ্রান্তদল সমূহের পরিচয়" এবং অধ্যক্ষ হাফেয এম, এ জলীল (রহঃ)-এর 'শীয়া পরিচিতি' পড়ুন।

২. আল্লাহকে ব্রাহ্ম, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে ডাকা যাবে বলে মন্তব্য

ইয়াহুদী-খৃষ্টান ধর্মের প্রচারণার ন্যায় ডাক্তার জাকির নায়েকের কনফারেন্সে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয়েও আপত্তিকর প্রচারণা চালানো হয়েছে। সেখানে হিন্দুধর্মের বিষয় এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, হিন্দুরা তাতে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। এমনকি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে ডা. জাকির নায়েক সাফাই গেয়েছেন এবং সেগুলো সম্পর্কে সমর্থন প্রকাশ করেছেন। স্রষ্টার পরিচয় দিতে গিয়ে ডা. জাকির নায়েক হিন্দুদের পরিভাষাকে সমর্থন করে একথা বলেছেন। আর তার এ কথা শুনে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন,-"**আমরা আমাদের হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গত ৪০ বছরে যা জানতে পারিনি, সেগুলো এখানে চার ঘন্টায় জানতে**

পারলাম।"(ডা. জাকের নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ২/২৩২পৃ.) এমনকি হিন্দুধর্মের এভাবে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ডাক্তার জাকির নায়েক হিন্দু ধর্মের সাফাই গেয়েছেন এবং সেগুলোকে সমর্থন জানিয়েছেন। ইসলামী শরিয়তের হুকুম হচ্ছে- মহান আল্লাহকে তার সত্তাগত নাম হিসেবে 'আল্লাহ' নামে ডাকতে হবে অথবা যদি তাকে গুণগত নামে ডাকা হয়, তাহলে তিনি নিজের জন্য যেসকল নাম নির্ধারণ করেছেন, তাকে সে নামেই ডাকতে হবে, যা মহান আল্লাহর ৯৯ নামরূপে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে। আর মহান আল্লাহর কোন বিশেষ গুণ নির্দেশ করতে এমন কোন শব্দে আল্লাহ তা'য়ালাকে সম্বোধন করা যাবে না-যা বিধর্মীরা তাদের দেবতাদের বুঝাতে ব্যবহার করে।[৭৩] এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে- মহান আল্লাহকে ব্রাহ্ম, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে ডাকা যাবে না। কেননা, এ নামগুলো বহুঈশ্বরবাদী হিন্দুদের দেবতাদের, যা থেকে মহান আল্লাহ অতিপবিত্র।[৭৪] তাই মহান রব তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

-"তাদেরকে বর্জন করো যারা আল্লাহর নামের ব্যাপারে সীমালংঙ্ঘন করে। অচিরেই তা যা করে চলছে তার ফল পাবে।" (সুরা আ'রাফ-১৮০) কিন্তু ডা. জাকির নায়েক বলেন-"**আল্লাহ তা'য়ালাকে ব্রাহ্ম, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে ডাকা যাবে।**"[৭৫] এমনকি তিনি বলেন-"আল্লাহ তা'য়ালাকে **যেকোনো নামে ডাকা যাবে, তবে তা সুন্দর হতে হবে।**"[৭৬] তেমনিভাবে তার বিভিন্ন লেকচারে আল্লাহ তা'য়ালাকে বুঝাতে গিয়ে বহু স্থানে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহর ৯৯ নামের মধ্যে 'ঈশ্বর' নেই। অধিকন্তু এটি বিধর্মীদের পরিভাষা। তাই এ শব্দ মুসলমানগণ ব্যবহার করতে পারেন না। উক্ত বইয়ে ঈশ্বর শব্দের ছড়াছড়ি দেখুন-"**ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস-মহান ঈশ্বর মানুষের রূপ ধারণ করেন না।**"[৭৭] অন্য স্থানে লেকচারে বলেন-"**ঈশ্বর তথা আল্লাহর** সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে কুরআন মাজীদের ১১২ নং সুরাহ ইখলাসের চারটি আয়াতের মধ্যে।"[৭৮] তিনি আরেক লেকচারে বলেন-"এ সংজ্ঞা

---

৭৩ .আল্-কুরআন, সূরাহ বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১১০/ সূরাহ ত্বহা, আয়াত : ৮/ সূরাহ আ'রাফ, আয়াত : ১৮০/ সূরাহ হাশর, আয়াত : ২৪/ সহীহুল বুখারী শরীফ, হাদিস নং- ২৭৩৬

৭৪ . আকায়িদুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা.

৭৫ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ২৬৫

৭৬ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৩৮০

৭৭ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ১২৫

৭৮ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ১৩২

দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।"[৭৯] ব্রাহ্ম, বিষ্ণু, ঈশ্বর, ভগবান এ সমস্ত নামের বিপরীত লিঙ্গ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

-"তার সুন্দরতম পাক নামসমূহ রয়েছে সে নামেই তাহাকে সম্বোধন কর এবং যারা তার নাম পরিবর্তন করে সম্বোধন করে তাহাদিগকে ত্যাগ কর।"(সুরা আ'রাফ-১৮০)

তাই ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন-

وأنه مقدس عن التغير والانتقال

-"আল্লাহ তা'য়ালা রূপান্তর ও পরিবর্তন হইতে পবিত্র।"[৮০] তাই এ নামে কখনো আল্লাহ বলে ডাকা যাবে না, বরং এ নামে যে ডাকবে সে কবিরাহ গুনাহগারের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। ইসলামী শরিয়তে তা হারাম বলে বিবেচিত হলেও ডা. জাকির নায়েকের কাছে তা আরাম। তা ছাড়া পৃথিবীর যে কোন সুন্দর নামে আল্লাহকে ডাকা যাবে না, বরং তা আল্লাহর ৯৯ নামসমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল বা তাঁর পবিত্র সত্তার মহান গুণ প্রকাশকারী হতে হবে।[৮১]

৩. চারজন মহিলা নবি এসেছিলেন বলে উক্তি

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"উপরে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে চারজন মহিলা নবি এসেছেন।.....তারা হলেন, বিবি মরিয়ম (রা.), বিবি আছিয়া (রা.), বিবি ফাতেমা (রা.), ও বিবি খাদীজা (রা.)। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।"[৮২] এটা ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত থিউরি। আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ হিকমতের জন্য পৃথিবীতে নবি হিসেবে শুধু পুরুষদেরকে মনোনীত করেছেন, কোন মহিলাকে নয়। ইসলামের আক্বীদা হচ্ছে- পৃথিবীতে মহান আল্লাহ শুধু পুরুষদের মধ্যে থেকে নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। কোন মহিলাকে নবি করে পাঠানো হয়নি। আর নবি নন-এমন কোন ওলীযে কামেল-বুযুর্গকে কোনরূপ দৃষ্টিকোণ থেকেই নবি বলা যাবে না।[৮৩] জাহেল জাকির নায়েক নবি হওয়ার কি গুণাবলী বা শর্তাবলী রয়েছে এগুলো না জেনে ভুয়া বক্তব্য পেশ করে যাকে ইচ্ছা তাকে নবি বানানোর মাধ্যম বানাচ্ছেন যে নবি

৭৯ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৪৩৯
৮০ .ইমাম গায্যালী, ইহ্ইয়াউল উলূম, ১/৯১ পৃষ্ঠা, দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন।
৮১ .ইমাম বুখারী, আস্-সহিহ, হাদিস নং.২৭৩৬, বাদায়িল আকায়েদ, ১/১৬৯পৃ.
৮২ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৫
৮৩ .সূরাহ মুমিন, আয়াত নং- ৭৮/ সূরাহ হজ্জ, আয়াত নং- ৭৫

মানে যারা পূতঃপবিত্র থাকেন তারাই। নাউযুবিল্লাহ! ইসলামী শরিয়তে কোন সময়ই নারী নবি ছিলেন না। নবি মানে তিনি উম্মতের ইমাম হওয়া অথচ রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সে জাতি কখনই সফল হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন রমণীর হাতে অর্পণ করে।"[৮৪] নবি ওই ধরনের সম্মানিত মানবকে বলা হয়, যার কাছে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ওহী পাঠিয়েছেন। (আল-আরবাঈন, ৩৩পৃ. শরহে আকাঈদ, ৯৪পৃ.) নবিগণ সবাই পুরুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন মহিলা বা জ্বীন ছিল না। (সূরা জ্বীন, শরহে আকায়েদ, ২৯পৃ.) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকায়েদের ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (রহ.) বলেন- أَنَّهُ لَيْسَ فِي النِّسَاءِ نَبِيَّةٌ -"মহিলাদের মধ্যে কেউ নবি ছিলেন না।"[৮৫] বুঝা গেল জাকির নায়েকের আক্বিদা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম বিরোধী তাতে কোন সন্দেহ নেই। অপরদিকে উক্ত কথার দ্বারা জাকির নায়েক প্রকারান্তরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মত রাসূল (সা.)-এর খতমে নবুয়াতের উপর আঘাত হেনেছেন। ভণ্ড নবি দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যেমন বিশেষ দৃষ্টিকোণে নবি তথা 'যিল্লী নবি' দাবী করেছে, তেমনি উক্ত বর্ণনায় ডা. জাকির নায়েক রাসূল (সা.)-এর নবুয়াতের পরে বিবি মা ফাতেমা (রা.) ও বিবি মা খাদিজা (রা.) কে 'বিশেষ দৃষ্টিকোণে নবি' সাব্যস্ত করেছেন। তাই জাকির নায়েকও কাফির বলে সাব্যস্ত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৪. রাম ও কৃষ্ণ নবী হতে পারেন বলে উক্তি

ইসলামের আক্বিদা হচ্ছে-পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যে সকল নবি-রাসূলের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, তাদেরকেই নবি-রাসূল বিশ্বাস করতে হবে। অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে নবি-রাসূল বলে ধারণাও করা যাবে না।[৮৬] ডা. জাকির নায়েক তার দাবির পক্ষে যে যুক্তি পেশ করেছেন কথা অনুসারে তো পৃথিবীর যে কোনো লোককে নবি বলা যাবে কেননা সে লোকও বলবে কুরআন হাদিসে তো আমি নবি না তা বলা হয়নি?

অথচ ডা. জাকির নায়েক হিন্দুদের রাম ও কৃষ্ণ সম্পর্কে নবি হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করে বলেন-"অনেক নবি ছিলেন। রাম ও কৃষ্ণের নবি হওয়ার ব্যাপারে, আমরা বলতে পারি হতে পারে।"[৮৭]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পবিত্র কুরআন ও হাদিসের কোথাও রাম ও কৃষ্ণকে নবি বলা হয়নি। যাদেরকে কুরআন ও হাদিসের কোথাও নবি বলা হয়নি, তাদের সম্পর্কে নবি

৮৪ . সহিহ বুখারী, খণ্ড, ১০, কিতাবুল ফিতান, হাদিস ঃ ৬৬১৮
৮৫ . ইবনে কাসির, তাফসিরে ইবনে কাসির, ৪/৩৬২পৃ. প্রাগুক্ত.।
৮৬ . সূরা মুমিন, আয়াত নং- ৭৮
৮৭ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ১৬২

হওয়ার বিশ্বাস বা ধারণা পোষণ করা ঈমানবিধ্বংসী কাজ। বর্তমানে কারা রাম ও কৃষ্ণের অনুসারী তা তো আপনারা জানেন। যে রাম ও কৃষ্ণের জন্মের কোন হদিস পাওয়া যায় না তারা না কি করে নবি হতে পারেন?। তা ছাড়া রাম ও কৃষ্ণের যে যৌনলীলা ঘটিত চরিত্র বর্ণনা করা হয়, তা কোন নবির চরিত্র হতে পারে না। নবিগণ সবাই ছিলেন নিষ্কলুষ মহান চরিত্রের অধিকারী।[৮৮] পাঠকবৃন্দ! জাকির নায়েকের এ উক্তি থেকে রাসূল (ﷺ)-এর একটি হাদিস মনে পড়ে গেল-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

-"যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তার অন্তর্ভুক্ত।"[৮৯] আমার মনে হয় তাই জাকির নায়েক তাদেরই অনুসারীর একজন। অথবা হিন্দু ধর্ম প্রচার করতে চাচ্ছেন।

৫. হিন্দুদের দেবতা শ্রী কৃষ্ণের নামের পূর্বে ভগবান বলা

ডা. জাকির নায়েক বহুবিবাহ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এক পর্যায়ে হিন্দুদের শ্রী কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করে বলেন-**"একইভাবে ভগবান শ্রী কৃষ্ণেরও কয়েকজন স্ত্রী ছিল।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/৭পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ আজ পর্যন্ত কোন ইমাম মনীষী মুহাদ্দিস এবং ইসলামের দাঈ শ্রী কৃষ্ণের নাম নেয়ার পূর্বে ভগবান শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে কোনো নজির নেই। নিঃসন্দেহে জাকির নায়েক যে একজন হিন্দুদের 'দালাল' তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

৬. হিন্দুদের বেদ আল্লাহর বাণী হতে পারে বলে উক্তি

ইসলামের আক্বীদা হচ্ছে-মহান আল্লাহ চারটি প্রধান আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন পবিত্র কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবূর। এ ছাড়াও বিভিন্ন নবীর প্রতি ১০০টি সহীফা অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু হিন্দুদের বেদ আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের কোথাও বলা হয়নি। তাই যাকে আল্লাহর কিতাব বলা হয়নি, তার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব হওয়ার ধারণা কখনই করা যাবে না।[৯০]

কিন্তু ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"আমাদের এ ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই যে, মূল বেদ হয়তো আল্লাহর বাণীও হতে পারে।"**[৯১] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! জাকির

৮৮ .এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানো স্বরূপ উন্মোচন" ২য় খণ্ড ও 'আকায়েদে আহলে সুন্নাহ' গ্রন্থ দুটি দেখুন আশা করি আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।
৮৯ . সুনানে আবু দাউদ, ৪/৪৪পৃ. হাদিস, ৪০৩১, আলবানী সনদটিকে হাসান, সহিহ বলেছেন।
৯০ . মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা.
৯১ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ১৬২

নায়েকের কথা মত যে কোনো গ্রন্থকেই আল্লাহর বাণী বলা যাবে; কেননা তার অনুসারীরা দাবি করবে যে আমাদের কিতাবে তো ভাল কথাই আছে কুরআনের অনেকাংশে মিল আছে এবং কুরআন হাদিসে তা আল্লাহর কিতাব নয় তা বলা নেই। তিনি তার আরেক লেকচারে বলেন-**"একইভাবে আমাকে জিজ্ঞাস করেন, বেদ, বৌদ্ধ বা পারসি ধর্মগ্রন্থগুলোকে আল্লাহর বাণী মনে করি কি না? আমি বলব, হতে পারে।"**[৯২]

তার আরেক লেকচারে বলেন-"হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল হিসেবে বিবেচনা করা হয় বেদকে।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/২৭৭পৃ.)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তিনি যে হিন্দু ধর্মের একজন অন্যতম দালাল তা এ বক্তব্যে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়।

৭. ডা. জাকির নায়েকের হিন্দু ধর্মের দালালীর নমুনা ঃ

হিন্দু স্বামী গলোকানন্দের বক্তব্যের সমর্থনে ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"অনেক ধন্যবাদ, স্বামীজী; আমি এ বিষয়ে একমত যে, হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হলো 'বেদ'। তারপর উপনিষদ এরপর পুরাণা।"**[৯৩] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যে গ্রন্থ গ্রহনযোগ্য হওয়ার বিষয়ে কোন হদিস পাওয়া যায় না ডা. সাহেব কিভাবে কাল্পনিকভাবে তাকে পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য বলতে একটুও দ্বিধাবোধ করলেন না। তিনি একটু অগ্রসর হয়ে বলেন-**"আমি পুরাণাকে মানি এবং সেগুলোকে শ্রদ্ধা করি। তবে মতের দিক থেকে এগুলোকে বেদ ও উপনিষদের অনেক পরে স্থান দেই।"**[৯৪] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বুঝা গেল জাকির নায়েক কাদের কিতাবের অনুসরণ করেন। তিনি যদি পুরাণাকেই মানেন তাহলে তিনি কেন নিজেকে মুসলিম দাবি করেন? হিন্দু দাবি করলেই তো পরেন। **আমাদের মূল বক্তব্য হলো যে, কোনো কিতাবে কিছু ভাল কথা থাকলেই তা আল্লাহর কিতাব হওয়া শর্ত নয়।** তিনি আরেক লেকচারে বলেন-**"হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র এবং বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, শ্রীমৎ ভগবদগীতা ও পুরাণ ইত্যাদি।"**[৯৫] ডা. সাহেব তার আরেক লেকচারে বলেন-**"হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল হিসেবে বিবেচনা করা হয় বেদকে।"**[৯৬]

৯২ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৪, পৃষ্ঠা নং- ১১৯
৯৩ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ১৫০
৯৪ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ১৫০
৯৫ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ২৫৭
৯৬ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ২৭৭

৮. ডা. জাকির নায়েকের বৌদ্ধ ধর্মের দালালীর নমুনা ঃ

জাকির নায়েক শুধু হিন্দু ধর্মেরই হদিসবিহীন গ্রন্থের বিষয়ে উল্টাপাল্টা বলে ক্ষান্ত হননি সে এক পর্যায়ে তার লেকচারে বলেন-"হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো, পারসি ধর্মগ্রন্থ হতে পারে এগুলো আল্লাহর বাণী।"[৯৭] অথচ কোনো ইমাম, উলামা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর বাণী হতে পারেন এ ধরনের ধারণা রাখারও হুকুম দেননি। আর এ গ্রন্থের কুরআন ও হাদিসে এ গ্রন্থের কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত বক্তব্য ইসলামের কী উপকারে আসলো?

বিভিন্ন হিন্দুধর্ম গ্রন্থকে বিশুদ্ধ, পবিত্র, নির্ভেজাল ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে ডা. জাকির নায়েক মুসলমানদের বিশ্বাসকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তাইতো উক্ত কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে হিন্দু পণ্ডিত রবি শংকর মুসলমানদের নসীহত করে বলেছেন,-"তাহলে এখন আপনারা বেদকে সবাই শ্রদ্ধা করবেন। ডা. জাকির নায়েক নিজেই বলেছেন সবারই বেদকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর কথা হলো আপনারা ভাববেন না যে, এটা কাফির-মুশরিকদের বই। প্রত্যেক মুসলমানদের এই গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর আমি ডা. জাকির নায়েককে বিশেষভাবে ধন্যবান জানাতে চাই। কারণ তিনি বেদের সত্যতাকে সবার সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন।"[৯৮] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারাই দেখুন তার এ বক্তব্যে কারা উপকৃত হচ্ছেন মুসলিম না হিন্দু?

৯. আমার বক্তব্য হলো যা.....

উপরন্তু মারাত্মক ব্যাপার হলো, ডা. জাকির নায়েক বেদকে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব হতে পারে বলেছেন এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলো, পারসি ধর্মগ্রন্থগুলো আল্লাহর বাণী হতে পারে বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ঈমানবিধ্বংসী ফিতনার সৃষ্টি করেছেন। কেননা, যে কিতাবকে আল্লাহর কালাম বলে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, তাকে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। (দেখুন-সুরা আলে-ইমরান, ৭৮, তাফসীরে ইবনে কাসির, ২/২৯পৃ. সহিহ বুখারী, হাদিস নং. ৬৪১৪) তা ছাড়া যেহেতু এটা ঈমানের বিষয়, তাই কোন কিতাবের ব্যাপারে 'এটা আল্লাহর কালাম হতে পারে' কিংবা 'আল্লাহর কালাম হলে আমাদের আপত্তি নেই' ইত্যাদি ধরনের সন্দেহমূলক কথা বলার অবকাশ নেই। তা ভ্রান্ত চিন্তাধারা।(মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ১/২৩৪পৃ.)

৯৭. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৪, পৃষ্ঠা নং- ১১৯
৯৮. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৪৭৩

১০. জাকির নায়েকের যার যে কোনো ধর্ম পালনের থিউরি ঃ

'ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা' সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক এক লেকচারে বলেন-"কুরআন আমাদেরকে যে কোন একটি ধর্ম বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে। কুরআন যে কোন একটি ধর্ম বেছে নেয়ার স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেছে- لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ -"দ্বীন সম্পর্কে কোন যবরদস্তি নেই।"[৯৯]

"দ্বীনের ব্যাপারে যবরদস্তি নেই"- এ আয়াতের শানে নুযূল অনুযায়ী বক্তব্য হলো, জিযিয়া প্রদানকারী অমুসলিম জিম্মীদের কাউকে জোর করে ইসলামে দাখিল করানো যাবে না। কিন্তু এর মানে এটা নয় যে, যে যেই ধর্ম ইচ্ছা সেই ধর্ম পালন করতে কুরআন স্বাধীনতা দিয়েছে। এটা ডাক্তার জাকির নায়েকের মনগড়া অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত মতধারা। যদি যে কোন ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হতো, তাহলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহন করলেও বেহেশত দেয়া হতো এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হতো। কিন্তু তাতো নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/৬৮৩পৃ.) বরং পবিত্র কুরআনে ইসলামকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

-"আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"(সুরা আলে-ইমরান, আয়াত, ১৯) আর অন্য ধর্ম পালনের পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

-"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করে তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"(সুরা আলে-ইমরান-৮৫)

১১. সকল ধর্মের সাদৃশ্য বিষয় পালনে ডাক্তার জাকির নায়েকের মতবাদ-

ডা. জাকির নায়েক তার এক লেকচারে বলেন-"ইসলাম ও বাইবেলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।"[১০০] জাকির নায়েক একই লেকচারে একটু সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন-"আজকের বিষয় ইসলাম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে সাদৃশ্য নয়। ইসলাম ও

৯৯. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/১৫০পৃ. এ আয়াতটি সুরা বাক্বারার ২৫৬ নং আয়াত।
১০০. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৬

খৃস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য"।[১০১] তিনি একই পৃষ্ঠায় বলেন-"যদি ভাল করে দেখেন আমি যে সাদৃশ্যের কথা বলেছিলাম বাইবেল আর কুরআনের সেগুলো খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তি"।[১০২] অন্য এক লেকচারে সে বলেন-"কোরআনের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করতে হবে। অতঃপর সে অংশটুকু মেনে চলতে মুসলিমদের কোন সমস্যা নেই।"[১০৩] তিনি তার আরেক লেকচারে বলেন-"আমাদের গবেষণা কর্ম 'ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যসমূহ'.....।"[১০৪] তিনি তার আরেক লেকচারে বলেন-"আসুন আমরা সবাই আমাদের সাদৃশ্যগুলো মেনে নেই। আমাদের মাঝে পার্থক্য না হয় কিছু থাকলো। আমি যেটা বলি, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে হতে পারে সেটা, ভগবদগীতা, হতে পারে বেদ-উপনিষদ, বাইবেল, কুরআন, আসুন সাদৃশ্যগুলো দেখি। পার্থক্য নিয়ে পরে এক সময় আলোচনা করবো, তবে যে কথাগুলো একই আসুন সেগুলো আমরা সবাই মেনে চলি।"[১০৫]

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এটা বাদশা আকবরের দ্বীনে ইলাহির মত সকল ধর্মের সমন্বয়ে ডাক্তার জাকির নায়েকের মনগড়া ধর্মমত প্রবর্তনের ভ্রান্ত চিন্তা-যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। ইসলাম কখনো সকল ধর্মাবলম্বীদের কে শুধু সাদৃশ্য বিষয় মেনে চলতে বলে না। কারণ, তা পরকালীন সাফল্য ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। বরং, পরকালীন সাফল্য ও মুক্তির পথ হলো, সকলকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও।"(সুরা বাক্বারা, ২০৮) বলতে কী, ডাক্তার জাকির নায়েকের কথিত এ দাওয়াত কবুল করে যদি হিন্দুরা বেদ ও কুরআনের সাদৃশ্য বিষয় পালন করে, তখন তারা হবে বৈদিক মুসলিম (বেদের উপর আমলককারী মুসলিম)। এমনিভাবে খৃষ্টানরা সাদৃশ্য বিষয় পালন করে হবে বাইবেলীয় মুসলিম (বাইবেলের উপর আমলকারী মুসলিম)। কিন্তু এতে তাঁরা কিছুতেই পরকালীন সাফল্য ও মুক্তির আশা করতে পারে না। কেননা, একমাত্র প্রকৃত ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হওয়া ছাড়া পরকালিন সাফল্য ও মুক্তির কোনো পথ নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

১০১ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৬
১০২ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৩৫৬
১০৩ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৩, পৃষ্ঠা নং- ২২৭
১০৪ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ২৫৭
১০৫ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ২৩৩

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

-"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে অকৃতকার্যদের অর্ন্তভুক্ত হবে।"(সুরা আলে-ইমরান, আয়াত, ৮৫) সুতরাং, ডা. জাকির নায়েকের উক্ত আহবান ইসলামের দাওয়াতের নামে ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল। কারণ, তার সে আহবানে সাড়া দিলেও কেউ পরকালীন নাজাত ও সাফল্যের অধিকারী হতে পারবেন না। তাই উক্ত জাকিরী ধর্ম মতের আলোকে শত-সহস্র বিধর্মী লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম গ্রহণকারী বলা যাবে না। অপরদিকে কোন মুসলমান যদি উক্ত জাকিরী ধর্মমত অনুযায়ী অন্য ধর্মালম্বীর সাথে সাদৃশ্য বিষয়ে এক হওয়ার জন্য অন্য বিষয়ে ছাড় দেয় তাহলে সে মুসলমানই থাকবে না। কেননা, তখন তার সকল ধর্মের সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে এক হওয়ার জন্য ইসলামের অনেক ঈমানী বিষয় ও ফরয বিধানকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। নাউযুবিল্লাহ!!

এভাবে উক্ত জাকিরী ধর্মমত মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বের করতে কত ভয়ানক সূক্ষ্মচাল হতে পারে-তা ভাবাই যায় না। তা ছাড়া ডা. জাকির নায়েকের উক্ত 'সাদৃশ্য তত্ত্বের' ছত্রছায়ায় অন্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়ার পরিবর্তে তাদের নিজেদের ধর্মের বিশ্বাসকেই শাণিত করছে। ডা. জাকির নায়েকের "ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য" ইত্যকার শিরোনামের কনফারেন্স দেখে তাদের কারো মনে প্রশ্ন জাগছে, যখন ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই ইসলাম গ্রহণ না করলেও সে ইসলামের সাদৃশ্য সঠিক পথে আছে বলতে পারে। আবার অনেক হিন্দু বলছে, **হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গত ৪০ বছরে যা জানতে পারিনি, সেগুলো এখন চার ঘন্টায় জানতে পারলাম।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং.২, পৃষ্ঠা নং. ২৩২) এটা কত বড় ভ্রষ্ট পথ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে হক ও বাতিলকে একাকার করে ফেলার বন্দোবস্ত হয়েছে। আবার বাইবেলে সাদৃশ্য প্রসঙ্গ তুলে ডা. জাকির নায়েক বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বলেন-**"আমরা মুসলমানরা খৃস্টানের চাইতেও বেশি খৃস্টান। কারণ, আমরাই বাইবেলকে বেশী মানি।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম, ২. পৃষ্ঠা নং. ৩৪৩) মুসলমানরা বাইবেল মানে-এ কথা ডা. জাকির নায়েক কী করে বললেন? অথচ আল্লাহর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইনজিলকে বিকৃত এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন করে ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা নিজেদের মতো করে বাইবেল রচনা করেছে। তাই মুসলমানগণ সেই বাইবেলকে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব বলে বিশ্বাস করতে পারে না। বরং, তারা হযরত মূসা (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ অবিকৃত 'তাওরাত এবং ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ অবিকৃত

'ইনজিল' কিতাবের উপর ঈমান রাখেন। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক সাদৃশ্যের লেবেলে ভুল মেসেজ দিয়ে বর্তমান বাইবেলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাসকে ডাইভার্ট করার অযাচিত চেষ্টা করছেন!

এতে ডা. জাকির নায়েকের উক্ত প্রয়াস ইসলামের দাওয়াতের পরিবর্তে বিধর্মের দাওয়াতের স্বরূপই পরিগ্রহ করেছে। যা কুফর ও গোমরাহীর পথকে উন্মোচিত করেছে। (সুরা বাক্বারা, আয়াত, ২০৮, সুরা আলে-ইমরান, আয়াত, নং.১৯, তাফসীরে ইবনে কাসির, ৪/৮৭পৃ.)

১২. সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে জাকির নায়েকের বিভ্রান্তি ঃ

কিন্তু ডা. জাকির নায়েক বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তিকালের পর তারা কেউ কেউ রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। দেখুন ডা. জাকির নায়কের মূল ভাষ্য-"পরবর্তীতে যখন তিনি {রাসূলুল্লাহ (ﷺ)} ইন্তিকাল করলেন আর লোকজন যখন তার কথাগুলো উদ্ধৃতি দিতে শুরু করলো এবং কেউ কেউ এমন কথাও বলতে শুরু করলো- যা নবীজী হয়তো বলেননি..... ।"[১০৬] নাউযুবিল্লাহ!!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ডা. জাকির নায়েক কতবড় জঘন্য উক্তি করেছেন লক্ষ করুন। নবীজির ওফাতের পরে পরবর্তীতে কারা জীবিত ছিলেন তা সকলেরই জানা, আর কাফেরেরা তাঁর নামে মিথ্যা বলা এটা তো স্বাভাবিক বিষয়; এখানে সে এটা আলোচনাও করেননি। মুসলমানদের আক্বীদা হচ্ছে-রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মহান সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি। তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামে মিথ্যা কথা বা মিথ্যা হাদিস প্রচার করেননি-রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় নয় এবং তার ওফাতের পরও নয়।[১০৭] তার সকলেই জানত নবীজির নূরাণী জবানের এ হাদিস যে-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

-"যে আমার নামে মিথ্যারোপ করবে যে কথা আমি বলিনি, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে স্থাপন করলো।"[১০৮] বুঝা গেল জাকির নায়েকের এটি সাহাবিদের প্রতি তার অপবাদ। তাঁরা দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মহান আল্লাহর মনোনীত জামা'আত।

১০৬ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ৭৬

১০৭ . সূরাহ বাক্বারা, আয়াত নং- ১৩৭/ সহিহ মুসলিম, সাহাবীগণের (রা.) বদনাম করা হারাম অধ্যায়

১০৮ . সহিহ বুখারী, ২/৮০পৃ. হাদিস নং ১২৯১

তাঁরা দ্বীনকে যথাযথভাবে পালন করেছেন এবং উম্মতের নিকট পৌছিয়েছেন। তাইতো মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। সাহাবীগণ (ﷺ) কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করেননি।[১০৯] ডাক্তার জাকির তাদের সম্পর্কে অবান্তর মিথ্যাচার করেছেন।

১৩. পবিত্র কুরআনে ভুল আছে বলে স্বীকার!

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব ও চিরন্তন সত্য। এতে নিঃসন্দেহ বা কোনরকম ভুল থাকার কোন অবকাশই নেই। কোনরূপ ভুলের বা সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও এতে নেই। পবিত্র কুরআনে কোনরূপ ভুল আছে বলা বা এরূপ অভিযোগ আনা বা উহা কোনভাবে মেনে নেয়ার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।[১১০]

অথচ জনৈক খৃষ্টান পন্ডিত ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর আরোপিত একটি অভিযোগের উদ্ধৃতি টেনে ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কুরআনে ভুল হয়েছে বলে এক প্রকার মেনে নিয়ে বলেন- "ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন- কুরআনে রয়েছে 'নূহ (ﷺ) এর জাতি রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।' অথচ আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে, নূহ (ﷺ) এর জাতির নিকট একজন মাত্র নবীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং এটি পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাকরণগত ভুল। কুরআনের বলা উচিত ছিল- 'নূহ (ﷺ) এর জাতির লোকেরা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।' আমি (জাকির নায়েক) আপনাদের সাথে একমত যে, এটা ভুল হতে পারে।"[১১১] আসলে খৃস্টানরা সেই আয়াতটিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে অভিযোগের উদ্ভব ঘটিয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত আয়াতটি সূরাহ শু'আরাব ১০৫ নং- আয়াত। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْسَلِينَ

-"নূহ (ﷺ) এর কওম আম্বিয়ায়ে মুরসালীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।"

তেমনিভাবে উক্ত সূরাহর যথাক্রমে ১২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে-"আদ সম্প্রদায়গণ মুরসালীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; ১৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে-"সামূদ সম্প্রদায়গণ আম্বিয়ায়ে মুরসালীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে" এবং ১৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "লূত (ﷺ) এর কওম পয়গাম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।"

১০৯ .জামি তিরমিযি, হাদিস, নং ৩৪৬১, সুনানে বায়হাকী, হাদিস নং ১৫১১

১১০ .আল্- কুরআন, সূরাহ বাক্বারা, আয়াত নং- ২

১১১ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ৫১২

এ সকল আয়াতে যে বলা হয়েছে যে, এ জাতিরা আম্বিয়ায়ে মুরসালীনকে অস্বীকার করেছে, এটা যথার্থ কথা। কেননা, তাদের নিকট প্রেরিত নবী সংশ্লিষ্ট কওমের নিকট ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। সেই ঈমানের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে যে সকল নবী রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলের প্রতি ঈমান আনা। যেমন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ঈমানের পাশাপাশি সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান রাখি এবং তাদেরকে সত্যায়ন করি। কেননা, মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল নবী-রাসূলের ওপরই ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু কুচক্রী খৃষ্টানরা এ স্পষ্ট কথাকে উল্টিয়ে আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করেছে। তারা আয়াতটির যে অনুবাদ করেছে, তা যথার্থ অনুবাদ নয়। তারা আয়াতটির যে অনুবাদ করেছে, তা যথার্থ অনুবাদ নয়। বরং পবিত্র কুরআনে সুরা আশ-শূরা এর ১০৫ নং আয়াতের মূল

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

যার অনুবাদ হচ্ছে, নূহ (আ.)-এর কওম রাসূগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।" এ অর্থে রাসূলগণকে (বহু বচনে) বলা যথার্থই যুক্তিযুক্ত। কারণ, তারা পৃথিবীতে রাসূলগণের আগমনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তেমনি ঐ সকল জাতির নিকট প্রেরিত নবী-রাসূলের পাশাপাশি পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের এবং তাদেরকে সত্যরূপে মেনে নিতে তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সকল আম্বিয়ায়ে মুরসালীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ঈমানহারা হয়ে গিয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ কথাই বিধৃত করা হয়েছে। এখানে এটা বলা হয় নি যে, তাদের প্রত্যেক জাতির নিকট অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। তাই এখানে বহুবচন-ই যথোপযুক্ত, একবচন নয়।

সুরা যে আফসোসের কথা যে, ডা. জাকির নায়েক তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে তাদের অভিযোগের প্রতি অন্যায় স্বীকৃতি দিলেন!।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কুফুরের সাথে একমত হওয়াও কুফুর। সুতরাং ডা. জাকির নায়েক কী করে কুরআনের ব্যাকরণগত ভুল নির্ণয়ে খৃস্টানদের অভিযোগের জবাবে বলেন, **"আমি একমত যে, এটা ভুল হতে পারে"** এটা চরম ধৃষ্টতা ও মারাত্মক কুফুরী কথা!

সুতরাং পবিত্র কুরআনের বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক এবং খৃষ্টানদের অভিযোগ অসার ও অবান্তর। কিন্তু তাদের অভিযোগের জবাবে "আমি একমত যে, এটা ভুল হতে পারে"

বলে ডাক্তার জাকির নায়েক চরম অন্যায় ও কুফুরী কাজ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। (কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, ১৩/১১১পৃ.)

১৪. আদম ও হাওয়া (ﷺ) থেকে মানুষের সৃষ্টি বিষয়ে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,-"এটা কুরআনের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, আমাদেরকে এক জোড়া মানব আদম ও হাওয়া (ﷺ) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আমি এ উদাহরণ দিই না এ ধারণাটি ব্যবহার করি না। কারণ, এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য নয় বা বিজ্ঞান এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।"[১১২] নাউযুবিল্লাহ!!

ডা. জাকির নায়েক কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য বলে উল্লেখ করে আবার সেই তথ্যের বিপক্ষে নিজের অবস্থান প্রকাশ করলেন! এটা তো স্পষ্ট কুফুরী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

-"হে মানুষকুল! তোমরা মুসলমানদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি (আদম আলাইহিস্ সালাম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তাঁর সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের দুজন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত পুরুষ ও নারী।" (সুরা নিসা, আয়াত, ১) কিন্তু ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কুরআনের এ স্পষ্ট বাণীকে শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকার কারণে তাচ্ছিল্য করেছেন। কুরআনের কোন তথ্যকে এভাবে তাচ্ছিল্য করা বা "প্রতিষ্ঠিত নয়" বলা স্পষ্ট কুফুরী। কেউ এমন কথা বললে তার ঈমান থাকবে না। বিজ্ঞান কী ডা. জাকির নায়েকের নিকট কুরআনের চেয়ে বড় কিছু? (নাউযুবিল্লাহ, ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ)

১৫. ডা. জাকির নায়েক টিভিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টি

দাজ্জাল সম্পর্কে হাদিস শরীফে রয়েছে- দাজ্জাল শেষ যমানায় আসবে। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য তাকে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে। তার চুল কোঁকড়া ও লালবর্ণ হবে। তার কপালে লেখা থাকবে- ك ف ر (কাফের)। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুমিনই সে লেখা পড়তে পারবে। কৃত্রিম বেহেশত ও দোযখ তার সাথে থাকবে। সে বিভিন্ন অলৌকিক কাণ্ড দেখাবে প্রভৃতি।[১১৩] কিন্তু ডা. জাকির নায়েককে এক মহিলা প্রশ্ন

---

১১২ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৫২১পৃ.

১১৩ . সহীহ বুখারী, আম্বিয়া অধ্যায়/ সহীহ মুসলিম, ফিতান অধ্যায়, দাজ্জাল পরিচ্ছেদ

করেন- টিভিকে দাজ্জাল বলা যায় কি না ? এর জবাবে ডা. জাকির নায়েক দাজ্জাল সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মনগড়া উত্তর দিয়ে বলেন- "বোন! আপনি প্রশ্ন করলেন যে, একটা সহীহ হাদিসে দাজ্জালের কথা বলা হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, আর আপনিও এ কথা বললেন যে, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, এই টেলিভিশনখানা আদ-দাজ্জাল। এক চোখের দাজ্জাল। স্ক্রীন হল এর একটা চোখ। তাই টিভি দাজ্জাল। এখন এই টিভিতে দাজ্জাল বলা যায় কি না ? আমরা আসলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, টিভিই হল দাজ্জাল। এখানে আমি কি করতে পারি।"[১১৪] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ডা. জাকির নায়েকের কাছে আমার জিজ্ঞাসা যে ইসলামের কোন বিশেষজ্ঞ টিভিকে দাজ্জাল বলেছেন? তার নাম বলুন। আমার বক্তব্য হল জাকির নায়েকের টিভিকে দাজ্জাল বলার প্রশ্নকে প্রত্যাখ্যান করে দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করাই তার কর্তব্য ছিল। তা না করে উল্টো টিভিকে দাজ্জাল বলা যায় কিনা -সে ব্যাপারে "নিশ্চিত বলতে পারি না" অথবা "আমি কী করবো" ইত্যাকার কথা বলে দাজ্জালের ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশকে প্রশ্রয় দিয়েছেন-যা দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিস সমূহের স্পষ্ট বর্ণনাকে উপেক্ষা করার শামিল। এটা ঈমানবিরোধী কাজ। যেমন পথভ্রষ্ট বায়জিদ পন্নী ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সভ্যতাকে দাজ্জাল নিরূপণ করে পরোক্ষভাবে দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে অস্বীকার করার হীন প্রয়াস চালিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ) ।

১৬.'আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ' সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের নতুন ধর্মমতের থিউরি ঃ

ডা. জাকির নায়েক বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ হতে কোনটি প্রকৃত আল্লাহর বাণী সে প্রসঙ্গে বলেন-"বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। যদি বিজ্ঞান দিয়ে সবগুলো ধর্মগ্রন্থকে যাচাই করে দেখেন তাহলে আপনি জানতে পারবেন-কোনটি আসলে ইশ্বরের বাণী।" (জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ৫, পৃষ্ঠা নং. ১৬৪, সায়েন্স আওর কুরআন, ৪৩)

শরয়ি দৃষ্টিকোণে তার এ বক্তব্যের অবস্থান ঃ

পবিত্র কুরআন বিজ্ঞানের দ্বারা যাচাইয়ের উর্ধ্বে। কারণ, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী-যা চিরসত্য ও চিরন্তন, যা কখনো ভুল হতে পারে না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তা-গবেষণার ফসল-যা ভুলও হতে পারে বা পরিবর্তনও হতে পারে। তাই বিজ্ঞানের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার বিষয় পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যাচাই করা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানের মাধ্যমে কুআনের যাচাই হতে পারে না। তা

১১৪ .ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ৪৬১

ছাড়া পবিত্র কুরআনের সত্যতা অন্যকিছুর মাধ্যমে প্রমাণের প্রয়োজনই নেই। কেননা, পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে কুরআনের মধ্যেই। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

-"যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে থাকো এ (কুরআনের) ব্যাপারে যা আমি আমার বান্দার উপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর) অবতীর্ণ করেছি, তাহলে তোমরা এর মতো একটি সুরাহ বানিয়ে নিয়ে এসো এবং এ জন্য আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীদেরকে ডাকো-যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু যদি না পারো আর তা কস্মিনকালেও পারবে না, সুতরাং তোমরা (জাহান্নামের) আগুনকে ভয় করো-যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। (সুরা বাক্বারা, আয়াত নং.২৩-২৪) এ ছাড়াও মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন মু'জিযার প্রকাশের দ্বারা তাঁর রিসালত এবং তাঁর আনীত ইসলাম ও আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনের সত্যতা পৃথিবীবাসীদের নিকট দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এর বাইরে বা বিতর্কিত কোন পন্থায় পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডা. জাকির নায়েক এ ক্ষেত্রে উল্টো পথে চলেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি পবিত্র কুরআনের তথ্যকে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার নামে বিভিন্ন আয়াতের অর্থকে উল্টিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি মহান আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন। নাউযুবিল্লাহ

উদাহারণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনের সুরা নাযিআত এর ৩০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

-"আসমান সৃষ্টির পর আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।" কিন্তু ডা. জাকির নায়েক একে বিকৃত করে এ আয়াতের অর্থ করেছেন -"আল্লাহ পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতি করে সৃষ্টি করেছেন।" (জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম, ১, পৃষ্ঠা নং.৭৭) এরপর মনগড়া তথ্য দিয়ে ডা. জাকির নায়েক বলেন-"এখানে دَحَاهَا শব্দের অর্থ উটপাখির ডিম। একটি উট পাখির ডিমের আকৃতি হচ্ছে পৃথিবীর ভূ-গোলকীয় আকৃতির ন্যায়।" (জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম, ১, পৃষ্ঠা নং.৭৭) নাউযুবিল্লাহ,

ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কুরআনের আয়াতকে কিভাবে উল্টিয়ে দিলেন! যেখানে আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীকে (বিছানার ন্যায়) বিস্তৃত বা সমতল বানানো হয়েছে, ডা. জাকির নায়েক তাকে উল্টিয়ে বলেন, "আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীকে ডিমের মত গোল বানানো হয়েছে।" এখানে ডা. জাকির নায়েক আরবি ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন যে, এ আয়াতে دَحٰهَا শব্দটি কর্ম পদের সর্বনাম যুক্ত। অতীতকালের ক্রিয়াপদ-যার অর্থ-"তিনি তাকে বিস্তৃতি করেছেন,"। সেখানে ডা. জাকির নায়েক একে বিশেষ্যপদ গণ্য করে অর্থ করেছেন 'উট পাখির ডিম'। অথচ কোনো বিধানে এ ধরনের শব্দের এ অর্থ নেই এবং আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এ শব্দের এ অর্থ কখনো হতে পারে না। তাছাড়া এর পরের তিনটি আয়াতে পৃথিবীর বিস্তৃতির স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে-যা সেখানে উট পাখির ডিম অর্থ করলে এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় না। তথাপি ডাক্তার জাকির নায়েক শুধুমাত্র কথিত বৈজ্ঞানিক থিউরির সাথে কুরআনের তথ্যকে মিলানোর নামে কুরআনের উপর এমন মারাত্মক হস্তক্ষেপ করে অর্থকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কিন্তু তা করার কারণে ডা. জাকির নায়েকের উক্ত তথ্য বিজ্ঞানের সাথে মিলার পরিবর্তে তা বিজ্ঞানের বাইরে চলে গিয়েছে। তার কারণ, বিজ্ঞান পৃথিবীকে কমলালেবুর মত গোলাকার বলেছে-যা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর দিকে কিছুটা চাপা ও মধ্যভাগ স্ফীত, তাকে উট পাখির ডিমের মতো বলেনি-যা কিছুটা লম্বাকৃতির মসৃণ গোলাকার। অপরদিকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীর গোলাকার হওয়া সাব্যস্ত হয় পৃথিবীর সামগ্রিক আকার অথবা বৃহৎ দূরত্বের বিবেচনায়। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি সীমার মধ্যকার পৃথিবী ছোট অংশ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গোলাকার নয়, বরং সমতল; বিজ্ঞান তাকে কুরআনের বর্ণনার মতই বিছানার ন্যায় সমস্তরালে বিস্তৃত বলে থাকে। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে উইকিপিডিয়া বাংলা ভার্সণের নিম্নোক্ত লিঙ্কে লগইন করুন- https//bn.wikipedia.org/wiki/সমতল-পৃথিবী)

বলা বাহুল্য, মানুষ সাধারণ চোখে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সমতলই দেখে। আর আধুনিক বিজ্ঞানও একে সমতলই বলেছে। পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে মানুষের এ দৃষ্টি সীমার পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পৃথিবীকে (বিছানার ন্যায়) বিস্তৃত করেছেন। (দেখুন : তাফসীরে ইবনে কাসির, ৮/৩১৬পৃ.) সুতরাং এ ক্ষেত্রে কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক মনগড়াভাবে কুরআনের অর্থকে পরিবর্তন করে তাকে ভুল বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ফিতনার জন্ম দিয়ে মানুষকে গোমরাহ করার ব্যবস্থা করেছেন। অধিকন্ত শিউরে উঠার মত ব্যাপার হল ডা. জাকির নায়েক উক্ত আয়াতের সেই 'উট পাখির ডিম' অর্থ গ্রহণ করেছেন মিথ্যুক ভণ্ড নবি দাবিদার রাশেদ খলীফার কাছ থেকে যিনি কুরআনের

অনেক আয়াতকে বাদ দিয়ে মনগড়া নতুন কুরআন তৈরী করেছেন এবং আল্লাহ থেকে ওহী পাওয়ার নামে বিভিন্ন আয়াতের মনগড়া অর্থ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। উল্লেখিত অর্থটিও সে ধরনেরই। (প্রমাণের জন্য রাশেদ খলিফার কুরআন সাইটের উক্ত পেজে যেতে লগইন করুন :http://submission.org.QI#79:25-46)

দুঃখজনক যে, নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সিরগণের শত শত সহিহ অনুবাদ থাকতে সেগুলো বাদ দিয়ে ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কুরআনের অর্থ করতে সেই পথভ্রষ্ট ভণ্ড নবী দাবিদার কাফির রাশেদ খলিফার দ্বারস্থ হয়েছেন। আর তার মিথ্যা অনুবাদ গ্রহণ করে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়েছেন এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছেন।

১৭. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে মিডিয়াকে জড়িয়ে ডাক্তার জাকির নায়েকের ভ্রান্ত থিউরি ঃ

ডা. জাকির নায়েক তার এক লেকচারে বলেন-"যদি আজকের দিনে নবীজি বেঁচে থাকতেন, (টিভি-সিনেমা প্রভৃতিকে) পুরোপুরি ব্যবহার করতেন।"[১১৫]

প্রথমত আমি বলবো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবের ছবির প্রদর্শনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তা ছাড়া এক্ষেত্রে পর্দা লংঘনের বিষয়ও জড়িত-যেমনটা দেখা যায় ডা. জাকির নায়েকের টিভি মিডিয়ায়। সুতরাং এমন আপত্তিকর বিষয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জড়ানো ডাক্তার জাকির নায়েকের চরম ধৃষ্টতা।

দ্বিতীয়ত আমি বলবো, ডা. জাকির নায়েকের বিশ্বাস যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে বিশ্বাস রাখা শিরক; তাহলে তিনি কিভাবে এতবড় গায়েব জানলেন বর্তমানে নবীজি বেঁচে থাকলে অনুরূপ করতেন। তাহলে তো ডা. জাকির নায়েক নিজ আক্বিদা অনুযায়ী শিরক করে মুশরিকে আযম সাব্যস্ত হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৮. সাহাবীগণের বায়াত প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

জাকির নায়েক বলেন-"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সাহাবীগণ যে বাই'আত গ্রহণ করতেন-এটা বর্তমানের ভোট বা ইলেকশন (নির্বাচিত পদ্ধতি) এর প্রাচীন রূপ। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তা'য়ালার রাসূলও ছিলেন এবং রাষ্ট্রের প্রধানও ছিলেন। তাই উক্ত বাই'আত দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো তাঁকে রাষ্টপ্রধান হিসেবে ভোট দেয়া।"[১১৬]

---

১১৫. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১, পৃষ্ঠা নং. ৪৫৬

১১৬. হবহু ইসলাম মেঁ খাওয়াতীন কে হুকূক, পৃষ্ঠা, ৫০, জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১, পৃষ্ঠা নং. ৩৫০

শরয়ি দৃষ্টিকোণে জাকির নায়েকের বক্তব্যের অবস্থান ঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সাহাবীগণের বাই'আত ছিলো দ্বীন পালনের অঙ্গীকার স্বরূপ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

-"হে গায়েবের সংবাদদাতা! যখন মু'মিনাগণ আপনার নিকট আসে এ বাই'আত (অঙ্গীকার) করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, কোন অপবাদ আরোপ করবে না যা তারা চাক্ষুষভাবে বানায় এবং ভাল কাজে আপনার নাফরমানী করবে না, তাহলে তাদের বাই'আত-অঙ্গীকার গ্রহণ করুন এবং ত'াদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও অত ন্ত দয়ালু।" (সুরা মুমতাহীনাহ, ১২) সাহাবীগণ থেকে দ্বীন পালনের উপর এ বাই'আত বা অঙ্গীকার বারবার নেয়া হয়। তা কিছুতেই গণতান্ত্রিক ভোট ছিল না। সুতরাং তাকে বর্তমান যুগের গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতির ভোট বলা মহা অন্যায়। (তাফসীরে মাযহারী, ৬/৩৭২পৃ. তাফসীরে ইবনে কাসির, ৮/৯৬পৃ.) বলা বাহুল্য, যারা গণতন্ত্রের হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তারা ভাল করেই জানেন যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক ভোট ব্যবস্থায় সকল ভোটারের এ ইখতিয়ার থাকে যে, সে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করার জন্য যাকে ইচ্ছা নিজের রায় প্রদান করবে অথবা ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকবে। অপরদিকে যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে অধিকাংশের রায় না হয়, তাহলে তিনি রাষ্ট্র প্রদান নির্বাচিত হতে পারেন না। তাহলে সেই সাহাবীগণের কী ইখতিয়ার ছিল যে, তারা রাসূল (ﷺ) কে ভোট প্রধান করা হতে বিরত থেকে রাসূল (ﷺ)-এর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়াকে মেনে নিতে অস্বীকার করবেন কিংবা রাসূল (ﷺ) কী রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটের মুখাপেক্ষী ছিলেন?

১৯. অমুসলিমদের সালাম দেয়ার ব্যাপারে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,"**সুতরাং মুসলমানদের জন্য এটা অনুমতি আছে যে, তারা অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবে।**"[১১৭] শুধু তাই নয় তিনি তার আরেক লেকচারে বলেন-"**সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষজ্ঞদের এক অংশের মতে সালাম দেয়া যাবে। অর্থাৎ আপনি অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবেন এবং**

১১৭. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৪/২১৯পৃ.

অমুসলিমদের সালামের জবাবও অনুরূপ বা তার চেয়েও সুন্দরভাবে দিতে পারবেন।"[১১৮]

এ বিষয়ে আমাদের নবি কী বলেন?

সালাম হচ্ছে মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন বিনিময়-যা মূলত সেই ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত লাভের জন্য দু'আ বিশেষ। কুরআন ও হাদিসের হুকুম মতে, কোন অমুসলিম-বিধর্মী লোক ইসলাম কবুল করার পূর্বে পর্যন্ত আল্লাহর তা'য়ালা দয়া, রহমত ও বরকত লাভের দু'আর যোগ্য বিবেচিত হয় না। বরং তারা শুধু হিদায়াতের জন্য দু'আর যোগ্য হতে পারে। তাই ইসলামে বিধর্মীদেরকে সরাসরি সালাম প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে ইচ্ছা করলে 'আস-সালামু 'আলা মানিত্তাবা'আল হুদা" (যে হিদায়াতের অনুসরণ করে, তার প্রতি সালাম) বলতে পারে। আর তারা কখনো সালাম দিলে, উত্তরে শুধু "ওয়া আলাইকুম" বলতে হবে। এ বিষয়ে একটি হাদিসে পাক রয়েছে-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ اليَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ.

-"সে আমার উম্মতভুক্ত নয়-যে অমুসলিমদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন কর না। অনন্তর ইয়াহুদীদের সালাম হল, আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা আর খৃষ্টানদের সালাম হল, হাতের তালু দিয়ে ইশারা করা।"[১১৯] এ হাদিসে মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের অভিবাদনরীতি গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমাদের সেই বিধর্মীর মতো আঙ্গুল বা হাতের তালু দিয়ে ইশারা করার পরিবর্তে মুখে সালামের পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। তেমনিভাবে অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলমানদের সালাম রীতিতে বিধর্মীদের সালাম দিতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সহিহ সনদে হযরত আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ

১১৮. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৪/২১৯পৃ.
১১৯. তিরমিযি, জামি' তিরমিযি, ৫/৫৬পৃ. হাদিস নং ২৬৯৫, আলবানী এ হাদিসটিকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।

-"তোমরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে প্রথমে (সরাসরি) সালাম প্রদান করো না।"[১২০] অপর হাদিসে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: عَلَيْكُمْ

-"তোমাদেরকে যখন ইয়াহুদী-খৃস্টানরা সালাম দেয়, তখন উত্তরে বলো- ওয়া আলাইকুম।"[১২১] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই ইয়াহুদীদের জন্য রহমতের দু'আ না করে হিদায়াতের দু'আ এ জন্য করতেন যে, বিধর্মীরা ঈমান না পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত হয় না। তাই তাদের জন্য আল্লাহর রহমতের দু'আ করা যায় না। হযরত আবু বুরদাতা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে তিনি বলেন-

كَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَكَانَ يَقُولُ: «يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»

-"ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটে এসে হাঁচি দিতো এ আশা করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে ....আল্লাহ তোমাদেরকে রহমত দান করুক) বলবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের হাঁচির উত্তরে বলতেন....(আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুক এবং তোমাদের অন্তঃকরণকে সংশোধন করে দিন।"[১২২] কিন্তু ডা. জাকির নায়েক সেই হুকুম লঙ্ঘন করে সরাসরি বিধর্মীদেরকে মুসলমানদের ন্যায় সালাম দেয়া এবং উত্তমভাবে জবাব দেয়ার নিয়ম চালু করেছেন। তা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্টতা।

২০. ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে হিন্দু বলে ঘোষণার দুঃসাহস ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"যারা ভারতে বসবাস করেন, তারা হিন্দু। এভাবে যে সকল মুসলমান ভারতে বসবাস করেন, তারা সবাই হিন্দু। আমি জাকির নায়েকও হিন্দু; হিন্দু মুসলিম।"[১২৩]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কোন মুসলমান ভারতে বসবাস করার কারণে হিন্দু হবে কেন? কেউ আমেরিকায় বসবাস করলে কি খৃষ্টান হয়ে যায়? তাই ভারতে বসবাসের কারণে

১২০ .সহিহ মুসলিম, ৪/১৭০৭পৃ. হাদিস নং ২১৬৭, তিরমিযি, জামি' তিরমিযি, হাদিস নং ২৭০১, তাহাভী, শরহে মা'নিল আছার, ৪/৩৪২পৃ. হাদিস নং ৭২৬০,
১২১ .সহিহ মুসলিম, ৪/১৭০৫পৃ. হাদিস নং ২১৬৩,
১২২ . তিরমিযি, জামি' তিরমিযি, ৪/৩৭৯পৃ. হাদিস নং২৭৩৯, আবু দাউদ, আস্-সুনান,৪/৩০৮পৃ. হাদিস নং ৫০৩৮
১২৩ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ২/৫৩৪পৃ.

কোন মুসলমানকে হিন্দু বলা পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। মুসলিম বা হিন্দু কিংবা খৃস্টান হলো ধর্মীয় পরিচয়। তাই কোন স্থানে বসবাসের কারণে সেই পরিচয়ে পরিবর্তন হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, স্থানের সম্বন্ধ যুক্ত করলে, ভারতীবাসীরা ভারতী বা ভারতীয় হবে, কিংবা হিন্দুস্থানের অধিবাসী হিসেবে হিন্দুস্তানী হবে অথবা, 'হিন্দ' কান্ট্রিতে বসবাসকারী হিসেবে হিন্দী হবে, কিন্তু হিন্দু তো হতে পারে না। আসলে ডাক্তার জাকির নায়েক হিন্দু ও হিন্দীর পার্থক্য নির্ণয়ে ভুল করে উক্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।[১২৪]

২১. 'ক্বালব' এর অর্থ প্রসঙ্গে ডাক্তার জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"ক্বালব অর্থ অন্তর বলা ভুল। বরং ক্বালব-এর অর্থ হচ্ছে মস্তিষ্ক। এ জন্য পবিত্র কুরআনের সুরা বাক্বারার ৭ আয়াত خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ এর অনুবাদে "আল্লাহ তাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন" বলা যাবে না, বরং বলতে হবে-আল্লাহ তাদের মস্তিষ্কে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন।" কেননা, আধুনিক বিজ্ঞানের মতে চিন্তার জন্য প্রধান অঙ্গ হলো মস্তিষ্ককে, অন্তর নয়। তেমনিভাবে সদর অর্থ বক্ষ বলা ঠিক না, বরং এর অর্থ কেন্দ্র বা মস্তিস্ক। তাই رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي আয়াতের অর্থ "হে প্রভু! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন" বলা যাবে না। বরং এর অর্থ করতে হবে-"হে প্রভু! আমার মস্তিস্ককে প্রশস্ত করে দিন।"(IS QURAN WORLD OF GOD প্রশ্নোত্তর পর্ব, ডাক্তার জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ২, পৃষ্ঠা নং ১৭২)

পর্যালোচনা ঃ ডাক্তার জাকির নায়েক ক্বালব (قَلْب) শব্দের অর্থ মস্তিষ্ক বর্ণনা করে কুরআন ও হাদিসের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। উপরে উল্লেখিত সুরা বাক্বারার ৭ আয়াতে তৎকালীন মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেন-"আমি তাদের ক্বালবে মহর মেরে দিয়েছি।" এখানে 'ক্বালব' দ্বারা অন্তরই উদ্দেশ্য- যা বক্ষে অবস্থিত। সকল মুফাস্সির এ আয়াতের এ অর্থই করেছেন। (তাফসিরে ইবনে কাসীর, ৫ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা) এমনকি 'ক্বলব' বক্ষে থাকে বলে স্বয়ং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

-"বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ হয় না অন্ধ হয় ক্বালব যা বক্ষের মধ্যে অবস্থিত।" (সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ৪৬) অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে সূরা হাজ্জ এর ৩২ নং আয়াতে তাক্বওয়াকে ক্বালবে অবস্থিত গুণ বলা হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমের হাদীসে

১২৪ . হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদিস নং ১৫১৮, কাওয়ায়েদুল আরাবিয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা

রাসলুল্লাহ সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার اَلتَّقْوَى هَاهُنَا -"তাকওয়া এখানে থাকে বলে বুকের দিকে ইশারা করে দেখিয়েছেন।"[১২৫] সুতরাং কুরআন ও হাদিসের বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে-ক্বালব অর্থ অন্তর-যা বক্ষে থাকে; এর অর্থ মস্তিষ্ক বা ব্রেন নয়-যা মাথায় থাকে। অতএব, ডাক্তার জাকির নায়েকের দাবী ভুল। বলা বাহুল্য, মস্তিষ্কের কাজ হলো-চিন্তা-ফিকির করা আর ক্বালব বা অন্তরের কাজ হলো- অনুধাবন, উপলব্ধি ও ই'তিকাদ করা এবং সে অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করা। তেমনিভাবে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বা অন্য নানা মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান বা বোধবিশ্বাসও ক্বালব বা অন্তরে স্থিত হয়ে থাকে। এ ভিত্তিতেই ঈমানের স্থান ক্বালব বা অন্তর বলে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১২৬] বলা বাহুল্য, কলব বা অন্তরের অকাট্য দৃঢ় বিশ্বাসই হচ্ছে ইমান। এক্ষেত্রে অনবরত কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত থাকার দরুন কাফিরদের ক্বালব কলুষতার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সে সময় তারা হিদায়াত গ্রহণের প্রকৃতিগত যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্বালবে মোহর মেরে দেন এ কথা বুঝিয়ে যে, তাদের আর হিদায়াতের পথে আসার অবস্থা নেই। এতে বুঝা যাচ্ছে-ক্বালব বলে অন্তরকেই বুঝানো হয়, মস্তিষ্ক নয়। আর ঈমান ও কুফরের স্থান যেহেতু অন্তর তাই মোহর মেরে ইমানের প্রবেশ প্রতিবন্ধকতা বুঝানো তার জন্য প্রযোজ্য হয়। ব্রেন বা মস্তিষ্কের জন্য তা প্রযোজ্য হয় না। তেমনি হিদায়াতের জন্য অন্তরের উন্মুক্ততাকে কে বক্ষের প্রশস্ততার দ্বারা তাবির করা হয়ে থাকে। এ জন্য দ্বিতীয় আয়াতে সদর অর্থ বক্ষই হবে, কেন্দ্র তথা মস্তিষ্ক হবে না। (সহিহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা, মোল্লা আলী ক্বারী, আল-মিরকাত, ৯ম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, তাফসিরে ইবনে কাসীর, ৫ম খণ্ড ৪৪০ পৃষ্ঠা) সুতরাং বুঝা গেলো-ডাক্তার জাকির নায়েকের থিউরি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কুফুরী, যা বিশ্বাস করলে কোন মানুষ ঈমানদার থাকবে না। তিনি মিথ্যা তথ্য দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন।

২২. মহিলাদের হায়েজ অবস্থায় কুরআন পড়া সম্পর্কে ডাক্তার জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ-

ডা. জাকির নায়েক বলেন,-**"কুরআন ও হাদীসে হায়েজ অবস্থায় নামাজ না পড়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোন হাদীসে নেই যে, মহিলাগণ এ সময় কুরআন পড়তে পারবে না।"**[১২৭] (তথ্য সূত্র ঃ ডাক্তার জাকির নায়েকের 'গোফগো' লাইভ প্রোগ্রাম)

১২৫. সহিহ মুসলিম, ৪/১৯৯৬পৃ. হাদিস নং ২৫৬৪

১২৬. সূরা মুজাদালা, আয়াত নং ২২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৪০৪

১২৭. তার অনুরুপ বক্তব্য আপনারা ইউটিউবে এ শিরোনামে সার্চ করে পাবেন-" **ডাঃ জাকির নায়িক বলে 'ওযু ছাড়া পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা ও পড়া যাবে' _low "**

পর্যালোচনা ঃ এটা ডাক্তার জাকির নায়েকের দ্বীনি জ্ঞানের দৈন্যই প্রমাণ করে যে, স্পষ্ট হাদিস থাকা সত্ত্বেও তিনি বলে দিলেন, কোন হাদিসে নেই। সে তো জাহিল এজন্যই এ কথা বলার সাহসিকতা দেখাতে পেরেছে। এ হাদিসটি মশহুর পর্যায়ে একটি হাদিস। যা অস্বীকার করে জাকির নায়েক পথভ্রষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, হাদিসে এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন-

لاَ تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلاَ الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ.

-"হায়েজগ্রস্ত মহিলা ও গোসল ফরজ হওয়া (জুনুবি) ব্যক্তি কুরআনের কোন কিছুই পড়বে না।"[১২৮] আলবানী হাদিসটির ভুয়া তাহকীককরে সনদটিকে মুনকার বলে সুনানে ইবনে মাযাহ ও তিরমিযির তাহকীকে উল্লেখ করেছেন।[১২৯] তার এ খণ্ডন জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ২য় খণ্ড দেখুন। তাই সে অবস্থায় যেহেতু তারা অপবিত্র; অথচ কুরআন ও সহিহ হাদিস থেকে জানতে পাই পবিত্রতা ছাড়া করআনই স্পর্শ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে সাহাবী ইবনে উমর (রা.) ও অসংখ্য সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১৩০] হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিসটি এ রাবী থেকে আরেকটি শক্তিশালী সনদ সম্পর্কে ইমাম হাইছামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

-"ইমাম তাবরানী হাদিসটি তার মুজামুল কাবীর ও মুজামুস সগীর গ্রন্থে সংকলন করেছেন; আর সনদের সকল রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৩১] ইমাম তিরমিযি (রহ.) প্রথম হাদিস বর্ণনা করে এর উপর আমল করা প্রসঙ্গে বলেন-

১২৮. জামি তিরমিযি, ১/১৯৪পৃ. হাদিস নং ১৩১, সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/১৯৬পৃ. হাদিস নং ৫৯৬, মুসনাদে বায্যার, ১২/২১৯পৃ. হাদিস নং ৫৯২৫

১২৯. আলবানী, দ্বঈফু জামিউত-তিরমিযি, হাদিস নং ১৩১, ও দ্বঈফু সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৫৯৬

১৩০. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ১/২৭৬পৃ. হাদিস নং ১৫১২, মাকতুবাতুল কুদসী, কায়রু, মিশর।

১৩১. ইমাম হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ১/২৭৬পৃ. হাদিস নং ১৫১২, মাকতুবাতুল কুদসী, কায়রু, মিশর।

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لاَ تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلاَ الجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا

-"আহলে ইলম (ইলমে হাদিস ও ফিকহের অধিকারী বিশিষ্ট) রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবিদের, তাবেয়ীদের এবং তাবে-তাবেয়ীগণ যেমন-ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, শাফেয়ী, আহমদ এবং ইমাম ইসহাক (রাহিমাহুমুল্লাহ)-এর বক্তব্য। তার সকলেই বলেছেন "হায়েজগ্রস্ত মহিলা ও গোসল ফরজ হওয়া (জুনুবি) ব্যক্তি কুরআনের কোন কিছুই পড়বে না।"[১৩২] এ হাদিসে একজন রাবী **"ইসমাঈল বিন আইয়্যাস'** {ওফাত. ১৮১হি.) এর কারণে আহলে হাদিস আলবানী এ সনদটিকে মুনকার বলে অভিহিত করেছেন।[১৩৩] অথচ তাদের দলের আরেকজন আহলে হাদিস আলেম মোবারকপুরী তার সম্পর্কে বলেন- صَدُوقٌ -"তিনি সত্যবাদী ছিলেন।"[১৩৪] তিনি তার পরে আরও বলেন-

وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ عَالِمُ الشَّامِ وَأَحَدُ مَشَايِخِ الإِسلام وثقة أحمد وبن معين ودحيم والبخاري وبن عَدِيٍّ

-"ইমাম খাযরাজী (রহ.) তার জীবনীতে লিখেন তিনি শাম দেশীয় একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং সেখানকার মাশায়েকেরামের তিনি একজন অন্যতম। ইমাম আহমদ, ইবনে মুঈন, দুহাইম, বুখারী এবং ইমাম ইবনে আদি তাকে সিকাহ বলেছেন।[১৩৫] ইমাম যাহাবী (রহ.)ও তার কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[১৩৬] আহলে হাদিস মোবারকপুরী বলেন-

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَلَا لِلْحَائِضِ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ

-"এ হাদিস এ বিষয়ের দলিল যে,"হায়েজগ্রস্ত মহিলা ও গোসল ফরজ হওয়া (জুনুবি) ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশই পড়তে পারবে না।"[১৩৭]

১৩২. জামি তিরমিযি, ১/১৯৪পৃ. হাদিস নং ১৩১
১৩৩. আলবানী, দ্বঈফু জামি তিরমিযি, ১/১৯৪পৃ. হাদিস নং ১৩১
১৩৪. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে জামি তিরমিযি, ১/৩৪৬পৃ. হাদিস নং ১৩১
১৩৫. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে জামি তিরমিযি, ১/৩৪৬পৃ. হাদিস নং ১৩১
১৩৬. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ১/২৪১পৃ. ক্রমিক. নং ৯২৩, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৩৭. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে জামি তিরমিযি, ১/৩৪৬পৃ. হাদিস নং ১৩১

অপরদিকে ইমাম তিরমিযি এ হাদিস বর্ণনা করে বলেন এ বিষয়ে অনুরূপ হযরত আলী (রা.) হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে।[১৩৮]

২৩. নামায আদায়ের গ্রহণযোগ্য পোশাক নিয়ে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক নামায আদায়ের পোশাক সম্পর্কে এক পর্যায়ে বলেন-"নামায আদায়ের জন্য সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য পোশাক কোনটি এ সম্পর্কে কথা হলো, কোর্তা-পায়জামা বা প্যান্ট, শার্ট, টাই যেটাকে আরাম বোধ করবেন, সেটা পরবেন।"[১৩৯]

পর্যালোচনা ঃ মুসলমানদের স্বকীয় পোশাকের মধ্যে তাক্বওয়া ও পরহেজগারীর পোষাকই হচ্ছে নামাযের সর্বোত্তম পোশাক। মুসলমানদের সেই কালচারাল পোশাক বাদ দিয়ে বিধর্মীদের পোশাক নামাযের সর্বোত্তম পোশাক হওয়া তো দূরের কথা, তা মুসলমানদের জন্য পরাই বাঞ্ছনীয় নয়। (প্রমাণ ঃ সুরা আ'রাফ, আয়াত, ২৬, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং. ৫৩৭৩, সুনানে আবু দাউদ, ২/৫৫৯পৃ.) অথচ আশ্চর্যের কথা, ডাক্তার জাকির নায়েক ইসলামী পোশাক-খৃষ্টানদের পোশাকের সাথে গুলিয়ে নামাযের সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য পোশাক নির্ধারণ করেছেন। এটা মুসলমানদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচারকে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের সাথে একাকার করে ফেলার ষড়যন্ত্র বৈকি!

২৪. খৃষ্টানদের 'টাই' সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-'টাই' পরা মুসলমানদের জন্য বৈধ। তা খৃষ্টানদের ক্রুশের প্রতীক নয়। বাইবেলের কোথাও বলা নেই যে, টাই ক্রুসের প্রতীক। তিনি তারপর আরও অগ্রসর হয়ে সর্বশেষ বলেন-"সুতরাং টাই পরার অনুমতি আছে। কারণ এটা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক নয়।"[১৪০]

পর্যালোচনা ঃ ডাক্তার জাকির নায়েক অসার যুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টানদের কালচার ঢুকিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। বাইবেলে না থাকলে কী খৃষ্টানদের কালচার হতে পারে না? তা ছাড়া তার তো অজানা থাকার কথা নয় যে, ক্রুসের স্মারক চিহ্নরূপে গলায় টাই ঝুলানোর কথা বাইবেলে থাকবে কী করে, কেননা না বাইবেলের বর্ণনা তো যিশুর জীবনকালের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর ক্রুশের ব্যাপারটিকে খৃষ্টানরা তার দুনিয়াবী জীবনের পরিসমাপ্তির স্মারক হিসেবে নির্বাচন করেছে। টাই বা নেকটাই যে খৃষ্টান বা ক্রুস প্রতীকের স্তাবক-চিহ্ন ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় কালচার তা

১৩৮. জামি তিরমিযি, ১/১৯৪পৃ. হাদিস নং ১৩১
১৩৯. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ২/৫৪পৃ.
১৪০. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ১/৬২৫পৃ.

অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয়। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক বহু দলিল প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে তার কিছু দলিল পেশ করা হলো-

প্রখ্যাত মুসলিম লেখক কুরাইশী সাবেরী ক্রুশ প্রতিক ঐতিহাসিক ডুকুমেন্ট প্রকাশ করে বলেন,-"উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপীয়রা তাদের ডিকশনারী ও এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে প্রাথমিক যে সকল বিষয় (খৃষ্টীয় জাতি সত্তার পরিচয় বহন করে এমন) বাদ দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'টাই ক্রুসের প্রতীক'-এর দলীল। ১৮৯৮ সালের পূর্বে প্রিন্টকৃত এনসাইক্লোপিডিয়ার একটি পৃষ্ঠায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়। উক্ত পৃষ্ঠার আলোকচিত্র দেখতে আপনারা নিম্নের ওয়েব সাইটটি দেখুন। টাই এর ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়-ক্রুশের চিহ্নরূপে টাই ধর্মীয় পরিচয় হিসেবে খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলন লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ষোড়শ শতাব্দীর কিছু আগে ক্রুশের চিহ্ন টাইকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিয়ে চীন ও রোমান সেনাদের সামরিক ইউনিফর্মে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। তেমনিভাবে ১৬১৮ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্য বিজয়ের পর ক্রোয়েশিয়ান সামরিক ফ্রন্টিয়ার প্যারিস পরিদর্শনের রাজা লুই চতুর্দশের সামনে ক্রুসের স্মারক-চিহ্ন টাই পড়ে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেন। ইতিহাসের এ পরম্পরায় ১৭৯০ সালে পোপের পক্ষ থেকে সকল খৃষ্টানদের ক্রুসের প্রতীক রূপে টাই পরিধান করার জন্য বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়। অতঃপর ১৮৫০ সালের মধ্যে সকল খৃষ্টান জাতি বিষয়টি গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে পোপের আদেশ জারি করে দেয়।" (দেখুন:http://www.shobujbanglablog.net/32261.html/http://www.taajushshariah.com/Fatawa/tie.html)

উল্লেখিত বর্ণনার দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যাচ্ছে-খৃষ্টানদের ধর্মীয় চিহ্নরূপেই তাদের মধ্যে টাইয়ের প্রচলন হয়েছে। টাই পরা আবহমান কাল ধরে চলে আসা ধর্মীয় ঐতিহ্য। অথচ ডাক্তার জাকির নায়েক এমন প্রামাণ্য বিষয়তথ্যকে অস্বীকার করে টাই-এর পক্ষে সাফাই গাইলেন। এভাবে তিনি এ খৃষ্টানী কালচার নিপুণভাবে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতী করলেন!

ডা. জাকির নায়েকের মুখে টাই পড়ার ইতিহাস ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,-**"বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশের লোকেরা টাই পরে তাদের পোশাক আটকে রাখত এবং সেখান থেকেই টাইয়ের উদ্ভব হয়।"**(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৬২৫পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে জাকির নায়েকের কী ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশের লোকদের মত পোশাক আটকে রাখার অসুবিধায় ভোগার কারণে টাই পড়ছেন। নিশ্চয়ই না, তা কখনই হতে পারে না। কারণ, ডা. জাকির নায়েক নিজেও

সেটা স্বীকার করেন না। তাহলে তিনি কার অনুসরণে টাই পড়েন? বাংলাদেশের জাকির নায়েকের আরেক অনুসারী আহলে হাদিস রাজ্জাক বিন ইউসুফও টাইকে নিষিদ্ধ বা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।[১৪১] অপরদিকে তার আরেক অনুসারী ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরও অধিকাংশ আলেম টাইকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন বলে তা অকপটে স্বীকার করেছেন এবং একজন দাঈ হিসেবে ডা. জাকির নায়েকের টাই পড়া তার উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন।[১৪২] জাকির নায়েকের আরেক ভক্ত পাকিস্তানের বর্তমানের সমকালিন আহলে হাদিস আলেম শায়খ তাওসীফুর রহমানও টাই ও প্যান্টকে হারাম বলে ঘোষনা করেছেন।[১৪৩] তাই যারা হারাম কাজ করেন তারা শরিয়তের দৃষ্টিতে ফাসিক; আর ফাসিকের কোন ফাতওয়া শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

২৫. কুরআন শরীফ স্পর্শ করার ক্ষেত্রে পবিত্রতার বিষয়ে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পবিত্র হওয়া বা ওজু করা লাগবে না। বিনা ওজুতে বা নাপাক অবস্থায় কুরআন শরিফ স্পর্শ করা যাবে। পবিত্র কুরআনে যে পবিত্র ব্যতীত কেউ কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না বলা হয়েছে-এটা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সেটাকে ফেরেশতা ব্যতীত কেউ সেটা স্পর্শ করতে পারবে না। দুনিয়ার কুরআন শরীফের জন্য তা বলা হয়নি। কেননা, যদি তা দুনিয়ার কুরআন শরীফের ব্যাপারে বলা হয়, তাহলে যে কোন বিধর্মী অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করে বলবে, কুরআন মিথ্যা। কারণ, কুরআনে বলা হয়েছে, অপবিত্র অবস্থায় কেউ একে স্পর্শ করতে পারবে না, অথচ আমি অপবিত্র অবস্থায় একে স্পর্শ করতে পারলাম! (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৬২৬পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এটা সম্পূর্ণ কুরআন হাদিসের বিরোধী কথা! পবিত্র কুরআন ও হাদিসের দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করার ব্যাপারে পবিত্র হওয়া শর্ত বা ওয়াজিব বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। তাই বিনা ওজুতে বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

---

১৪১. এ আহলে হাদিস পণ্ডিতের বক্তব্যটি ইউটিউবে সার্চ করে পাবেন এ শিরোনামে- Dr Zakir Naik-ke Kafir bola ar akasher dike thu-thu chura ek-e by Abdur Razzak B_low

১৪২. এ বিষয়ে ইউটিউবে এ শিরোনামে সার্চ করুন "জাকির নায়েক সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর"।

১৪৩. এ বিষয়ে ইউটিউবে এ শিরোনামে সার্চ করুন **"ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে যা বললেন আহলে হাদীস আলেম তাওসীফুর রহমান"**।

-"পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করবে না।"(সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত, ৭৯) উক্ত আয়াতে দুনিয়ার কুরআন শরীফের ব্যাপারেই পবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার প্রমাণ হলো, এরপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাকে- تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ -"এটা (বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ) বলে উল্লেখ করেছেন। অবতীর্ণ কুরআন তো দুনিয়ার কুরআনই। (দেখুন-নাসবুর রায়্যাহ, ১/১৯৬পৃ.) তেমনি বহু হাদিসে স্পষ্টভাবে পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে হযরত আমর ইবনে হাযম (ﷺ) এর প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়ে সহিহ ও নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) আমর ইবনে হাযমের পত্রে ইয়ামানবাসীদের প্রতি এ ফরমান লিখে পাঠান-

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

-"পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না।"[১৪৪]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস রয়েছে-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ-

-"পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না।"[১৪৫] কিন্তু ডা. জাকির নায়েক কুরআন ও হাদিসের এ সকল বর্ণনাকে উপেক্ষা করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন। যা এক মারাত্মক ফিতনা রূপ পরিগ্রহ করেছে। তদুপরি ডা. জাকির নায়েক এখানে হাস্যকর বিষয়ের অবতারণা করেছেন যে, যদি পবিত্রতার কথা দুনিয়ার কুরআন শরীফের ব্যাপারে বলা হয় তাহলে কোন বিধর্মী লোক অপবিত্র অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করে বলবে, কুরআন মিথ্যা। কারণ, কুরআন বলেছে, অপবিত্র অবস্থায় একে স্পর্শ করতে পারবে না, অথচ আমি অপবিত্র অবস্থায় একে স্পর্শ করতে পারলাম! আরে এখানে তো বলা হয়নি যে, অপবিত্র অবস্থায় একে কেউ স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। বরং নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় একে স্পর্শ না করে। ডা. জাকির নায়েকের এ কেমন বোকামীপনা যে, এমন সহজ কথাটাও বুঝতে ভুল করলেন! (প্রমাণ ঃ সুরা ওয়াকেয়া, আয়াত, ৭৯, সুরা আবাসা,

১৪৪ .সুনানে দারেকুতনী, ১/১৪৫৫পৃ. হাদিস নং.২৩১২, আবু দাউদ, মারাসীল, ১/১২১পৃ. হাদিস ঃ ৯২, সহিহ ইবনে খুযাইমা, ৬৫৫৯, হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ১/৫৫২পৃ. হাদিস নং. ১৪৪৭, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৪৬পৃ. হাদিস নং. ১৯৩৫

১৪৫ .তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/৩১৩পৃ. হাদিস ঃ ১৩২১৭, তাবরানী, মু'জামুস সগীর, ২/২৭৭পৃ. হাদিস নং. ১১৬২

১৩-১৪, ইমাম মালেক, মুয়াত্তায়ে মালেক, ১/৪৬৮পৃ. হাবিবুর রহমান আজমী সম্পাদিত)

২৬. সুবহে সাদিক হলেও সাহরী খাওয়ার বিষয়ে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,-"ফজরে আযান হলেও সাহরী খাওয়া যাবে। তেমনি কেউ ভুল করে সুবহে সাদিক হয়নি মনে করে সাহরী খেলে, তখন সুবহে সাদিক হলেও তার রোযা হবে।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৩/৩২৩-৩২৪পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ ডা. জাকির নায়েকের এ কথা কুরআন হাদিসের সরাসরি বিরোধী। কুরআন হাদিসের বর্ণনানুযায়ী ফজরের আযানের সময় কিছু খেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। (দেখুন- সুরা বাক্বারা, ১৮৭) কারণ, ফজরের আযান দেয়া হয় সুবহে সাদিক হওয়ার পর। অথচ সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে রোযা শুরু হয়ে যায়। তাই সুবহে সাদিকের পরে কিছু খেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি ভুল করে সুবহে সাদিক হয়নি মনে করে সুবহে সাদিক হওয়ার পর কিছু খেলেও তার সেই রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে।

সাহরীর শেষ সময়সীমা সম্পর্কে সহিহ হাদিস শরীফের স্পষ্ট বর্ণনা ঃ

হযরত বিলাল (ﷺ) সুবহে কাযিব বা আল-খাইতুল আসওয়াদ-এর সময় আযান দিতেন, আর সময়টি তখনও রাত, তাই তার আযান শুনেও পানাহারের অনুমতি ছিল। কিন্তু, হযরত ইবনে মাকতুম (ﷺ) আল-খাইতুল আবয়াজ-এর উদয় হলে, আযান দিতেন যা ছিল সুবহে সাদিকের সময়। তাই তখন আর পানাহরের অনুমতি ছিল না। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি-

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

-"নিশ্চিতভাবেই বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। সুতরাং (তার আযান শুনলেও) তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়।"[১৪৬] তেমনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

১৪৬ . সহিহ বুখারী, ১/১২৭পৃ. হাদিস নং. ৬২২, সহিহ মুসলিম, ২/৭৬৮পৃ. হাদিস নং. ১০৯২, সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং. ২০৩

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال – أو قال نداء بلال – من سحوره، فإنه يؤذن – أو قال ينادي – بليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم

-"বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে তার সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা, সে রাত থেকে আযান দেয়, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা নামাযরত তারা ফিরে যায় এবং ঘুমন্ত তারা সজাগ হয়।...."(সহিহ বুখারী, ১/১২৭পৃ. হাদিস নং. ৬২১, সহিহ মুসলিম, ২/৭৬৮পৃ. হাদিস নং. ১০৯৩, সুনানে আবু দাউদ, ২/৩০৩পৃ. হাদিস নং. ২৩৪৭) এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিসে পাক রয়েছে বিস্তারিত জানতে আপনারা আমার লিখিত **"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"** দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক ভুল মাস'আলা দিয়ে মানুষের রোযা নষ্ট করছেন। তিনি মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করছেন।

২৭. তারাবিহ নামায সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,"তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায। তা ৮ রাক'আত পড়া যাবে।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/২৪৮পৃ.) যদি তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায হত, তাহলে রামাদ্বান ছাড়া অন্যমাসেও তারাবীহ পড়া হত। কারণ, তাহাজ্জুদ সারা বছরই পড়া হয়। কিন্তু তা হয় না। তা ছাড়া তাহাজ্জুদ নামায সাধারণত শেষরাতে পড়া হয়। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায হলে, তারাবীহও শেষ রাতে পড়া হতো। অথচ তারাবীহ প্রথম রাতে ইশার পর পর পড়া হয়। অপরদিকে তাহাজ্জুদ নামায ৮ রাক'আত বা ১২ রাক'আত পড়া হলেও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যমানা থেকেই জামা'আতের সাথে ২০ রাক'আত তারাবীহ নামায আদায়ের নিয়ম চলে আসছে। সুতরাং ডা. জাকির নায়েকের কথা ঠিক নয়। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায নয়, বরং ভিন্ন নামায। আর তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত হলেও তারাবীহ ৮ রাক'আত নয়, বরং তা ২০ রাক'আত। কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে তা ২০ রাক'আত বলেই প্রমাণিত হয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি এখন আপনাদের সামনে একটি সহিহ হাদিস পেশ করবো যেখানে নবিজী তারাবীহ নামাযের পরে তাহাজ্জুদের নামায বা ভিন্ন নামায তাঁর হুজরা শরীফে আদায় করেছেন। যেমন-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ، فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا-

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) রমযানে নামায পড়তেছিলেন। আমি তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আরেকজন সাহাবী এসে দাঁড়ালেন। এভাবে আমাদের ছোট একটি জামাত হয়ে গেল। যখন রাসূল (ﷺ) অনুভব করলেন যে, আমরা তার পিছনে আছি তখন তিনি নামায শেষ করে নিজ কামরায় চলে গেলেন। তারপর সেখানে এমন কিছু নামায পড়েছেন যা আমাদের এখানে পড়েননি।"[১৪৭]

এ হাদিসে লক্ষণীয় একটি বিষয় ঃ এ হাদিসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে-

ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ، فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا

-"রাসূল (ﷺ) মসজিদে তারাবীহ আদায় কারার পর নিজ গৃহে প্রবেশ করে এমন নামায আদায় করেছেন যা আমাদের এখানে আদায় করেননি।" এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাহাজ্জুদ ও তারাবীর পৃথক পৃথক নামায এবং রমযানের একই রাতে রাসূল (ﷺ) একাধিক তথা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন।

২৮. ঈদের নামায পড়লে জুমু'আর নামায পড়া লাগবে না বলে ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক এ সম্পর্কে বলেন-"জুম'আর দিনে আগে ঈদের নামায আদায় করলে পরে জুমার নামায আদায় করা আর না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪৭৬পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ জুমু'আর নামায জুম'আর দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অন্তর্ভুক্ত-যা পড়া বাধ্যতামূলক ফরজ। তাই অন্য কোন ইবাদাতের দ্বারা তার স্থান পূরণ হতে পারে না। সুতরাং ঈদের নামায পড়ার দ্বারা জুমু'আর নামায মাফ হবে না-এটাই স্পষ্ট। একই দিন জুমু'আ ও ঈদ হলে উভয়টি আদায় করা শরীয়তের নির্দেশ। মহান রব তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

---

১৪৭. সহিহ মুসলিম, ২/৭৭৫পৃ. হাদিস নং.১১০৪, ইবনে হুমায়দ, আল-মুন্তাখাব মিন আব্দুল বিন হুমাইদ, ১/৩৭৭পৃ. হাদিস নং. ১২৬৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

-"হে মু'মিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে নামাযের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বর্জন করো। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।" (সুরা জুমু'আ, আয়াত নং. ৯) উপরোল্লিখিত আয়াতে বেচাকেনা ছেড়ে জুমু'আর নামাযের প্রত্যেক জুমু'আর দিনেই উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঈদের দিনকে বাদ দেয়া হয়নি। হযরত হাফসা (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

-"জুমু'আর নামাযে গমন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের ওপর ফরজ।" (সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং. ১৩৫৪) উক্ত হাদিস শরিফে প্রত্যেক বালেগ মুসলমানের উপর জুমু'আর নামায প্রতি জুমু'আর দিন ফরয বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঈদের দিনকে আলাদা করা হয়নি। অন্য দিকে ইছতিসনা (পৃথক) করা ছাড়া যেকোনো শুক্রবার জুমু'আর নামায তরকের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে হাদিস শরীফে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

-"লোকেরা জুমু'আ তরক করা হতে বিরত থাকুন। অন্যথায় আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তরে মহর মেরে দিবেন। এরপর তারা গাফিলীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"[১৪৮]

জুমু'আ ও ঈদ একই দিন হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম কী করতেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) জুমু'আর দিন ঈদ হলে সর্বদা ঈদের নামায ও জুমু'আর নামায উভয়টিই আদায় করেছেন। কখনো ঈদের নামায পড়ে জুমু'আর নামায ছেড়ে দেননি। এ সম্পর্কে হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

১৪৮ . মুসলিম শরিফ, ২/৫৯১পৃ. হাদিস নং. ১৪৩২, সুনানে দারেমী, ২/৯৭৯পৃ. হাদিস নং. ১৬১১, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/২৬০পৃ. হাদিস নং. ৭৯৪, নাসায়ী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/২৫৯পৃ. হাদিস নং ১৬৭০, ও ২/২৬০হাদিস নং. ১৬৭১

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين

-"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুই ঈদে ও জুমু'আয় সুরা আ'লা এবং সুরা গাশিয়াহ পড়তেন। আর যখন ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে হত, তখনও তিনি ঈদ ও জুমু'আ উভয়ই নামাযে উক্ত সুরা দুটি পড়তেন।"[১৪৯] এ হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা গেল, জুমু'আর দিন ঈদ হলে রাসূল (ﷺ) ঈদ ও জুমু'আ উভয় নামাযই আদায় করতেন। রাসূল (ﷺ) ঈদের নামায পড়ার পর জুমু'আর নামায ছেড়ে দিয়েছেন, এমন কথা কোনো হাদিসে উল্লেখ নেই। অতএব জুমু'আ দিন ঈদ হলে উভয় জুমু'আর নামায আদায় করতে হবে। জুমু'আর নামায ঐচ্ছিক হয়ে যাবে না।

২৯. তিন তালাকের হুকুম প্রসঙ্গে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক তালাকের বিষয়ে প্রশ্ন আসলে তিনি তার জবাবে বলেন-"তিন তালাকের জন্য এতগুলো শর্ত রয়েছে যে সেগুলো পূরণ হওয়া অসম্ভব। তাই তাতে তালাক একটি হবে।"[১৫০]

পর্যালোচনা ঃ

কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দেয় তাহলে কয় তালাক হবে, এ ব্যাপারে তিনটি মাযহাব প্রসিদ্ধ আছে।

১. শিয়াদের শাখা জা'ফরীদের মাযহাব হলো, এর দ্বারা কোনো তালাক হবে না। যেহেতু সালাফে সালেহীনের কারো থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত হয়নি, তাই এই মাযহাব বাতিল। এ নিয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। (তাকমিলাহ ১/১১১পৃ., ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ ১৭/৯পৃ.)

২. কোনো কোনো আহলে জাহের এবং আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়িম-এর মাযহাব হলো, এর দ্বারা এক তালাক হবে, যদিও তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে। (তাকমিলাহ ১/১১৫)

১৪৯ . মুসলিম শরিফ, হাদিস নং. ১৪৫২, তিরমিযি, আস্-সুনান, ২/৪১৩পৃ. হাদিস নং. ৫৩৩, আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৭/৩১৯পৃ. হাদিস নং. ৩৬৪৭৩

১৫০ .জাকির নায়েকের এ বক্তব্যটি আপনার ইউটিউবে এ শিরোনামে সার্চ করলে পাবেন আর তা হলো "Dr. Zakir Naik - **নিয়ম মাফিক তিন তালাক দেওয়ার পরও**"

৩. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত উমর, আলী, উসমান, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আমর, উবাদাহ বিন সামিত, আবূ হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আসেম বিন উমর ও হযরত আয়েশা (রা.) সহ আরো অনেক সাহাবী এবং ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী (রহ.) সহ অধিকাংশ তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের মাযহাব হলো, এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হয়ে যাবে এবং অন্যত্র বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে মেলামেশা না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী হালাল হবে না।

তৃতীয় মাযহাবের দলিল :

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! বলে দিন যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করো, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিও...যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেবেন ' (সূরা তালাক ১-২)

এই আয়াতে তালাকের শরয়ী পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, এমনভাবে তালাক দেওয়া, যার পরে ইদ্দত আসে এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে। এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ না রেখে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে। কেননা যদি না হয়, তাহলে সে নিজের ওপর জুলুমকারীও হবে না এবং স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার পথও বন্ধ হবে না। যেদিকে এই আয়াত ইশারা করছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেবেন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে পথ বের করার অর্থ হলো, ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকা, যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একশত তালাক দিলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের নাফরমানী করেছো, তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বায়েনা হয়ে গেছে। তুমি তো আল্লাহকে ভয় করোনি যে আল্লাহ তোমার জন্য কোনো পথ বের করে দেবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেন।" (জাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস্ সুনান ৭/৭০৮পৃ.)

৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। ওই মহিলা অন্যজনকে বিবাহ করলে সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, 'না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী প্রথম জনের মত ওই মহিলার মধু আস্বাদন না করবে।' অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয়

স্বামী তার সাথে সহবাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (সহীহ বুখারী, ৫২৬১) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এটা রিফা'আ বিন ওয়াহাবের ঘটনা, যে তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়েছিল, এটাই স্পষ্ট। রিফা'আ আল কুরাযীর ঘটনা নয়, যে তার স্ত্রীকে সর্বশেষ তালাক দিয়েছিল। যে ব্যক্তি উক্ত দুজনকে এক মনে করেছে সে ভুল করেছে, ভুলের উৎস হলো তালাকপ্রাপ্তা দুই মহিলাকে আব্দুর রহমান বিন জাবীর (রা.) বিবাহ করেছিলেন। (ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৯/৫৮১)

৪. হযরত উয়াইমির (রা.) লি'আনের পর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আমার স্ত্রীকে রাখি, তাহলে তার ওপর মিথ্যারোপ করেছি। এ কথা বলে তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিলেন। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং, ৫২৫৯)

আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) বলেন, কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্ল াহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখান থেকে উম্মত এটাই বুঝেছে যে, একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়, যদি উম্মতের এই বুঝ সহীহ না হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই বলে দিতেন। (তাকমিলাহ ১/১১২, জাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান ৭/৭০৬পৃ.)

৫. হযরত হাসান বিন আলী (রা.) তার স্ত্রী আয়েশা বিনতে ফযলকে একসাথে তিন তালাক দিলেন। অতঃপর তার স্ত্রীর কথা শুনে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, যদি আমি নানাকে (অন্য বর্ণনায় তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন) এ কথা বলতে না শুনতাম যে, "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ না বসা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না।" তাহলে অবশ্যই তাকে ফেরত নিতাম। (সুনানে বায়হাকী, হা. নং ১৪৯৭১)

৬. মাহমূদ বিন লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে রাসূল (সা.) রাগান্বিত হয়ে যান। (নাসাঈ শরীফ, হা. নং ৩৪৩১) এখানে রাসূল (সা.)-এর রাগান্বিত হওয়াই তিন তালাক হয়ে যাওয়ার প্রমাণ। কেননা একসাথে তিন তালাক দেওয়া গুনাহের কাজ, এ গুনাহের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারাজ হয়ে ছিলেন।

৭. হযরত ইবনে উমর (রা.) তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। এ হাদীসের শেষে আছে যে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিতাম তাহলে কি তাকে ফেরত নিতে পারতাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তখন তো সে তোমার থেকে বায়েন (সম্পূর্ণ পৃথক) হয়ে যেত এবং তোমার গুনাহ হতো। (নুরুদ্দীন হাইসামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা. ৭৭৬৭)

৮. ওয়াকে' বিন সাহবান (রা.) বলেন যে ইমরান বিন হুসাইন (রা.)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছে, ইমরান (রা.) উত্তর দিলেন, সে তার প্রতিপালকের নাফরমানি করেছে এবং তার জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ হাদিস নং. ১৮০৮৮)

৯. হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে তার স্ত্রীকে এক হাজার বার তালাক দিয়েছে আর সে বলছে এর দ্বারা আমি খেল-তামাশা করেছি, হযরত উমর (রা.) তাকে বেত্রাঘাত করে বললেন, এক হাজার থেকে তোমার জন্য তিনটিই যথেষ্ট হয়ে গেছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক হাদিস.১১৩৪০, সুনানে বাইহাকী হা. ১৪৯৫৭)

১০. মুহাম্মদ বিন ইয়াছ (রহ.) ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরাইরা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, গ্রামের এক লোক তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার আগেই তিন তালাক দিয়েছে। এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী? ইবনে আব্বাস (রা.) আবূ হুরাইরা (রা.)-কে বললেন, আপনার কাছে একটি জটিল মাসআলা এসেছে, আপনি এর সমাধান দিন। আবূ হুরাইরা (রা.) বললেন, এক তালাক তাকে বায়েন করে দিয়েছে আর তিন তালাক তাকে হারাম করে দিয়েছে। যতক্ষণ না সে অন্যজনকে বিবাহ করে। ইবনে আব্বাস (রা.)ও অনুরূপ উত্তর দেন। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক হাদিস নং. ৬৫৯) এখানে মাত্র কয়েকটি হাদীস পেশ করা হলো, এ ছাড়া সাহাবা, তাবেঈ ও তাবেতাবেঈ থেকে আরো অনেক হাদীস ও ফাতাওয়া আছে, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ইজমায়ে উম্মত :

১. হাফেজ ইবনে রজব (রহ.) বলেন, জেনে রেখো, কোনো সাহাবা কোনো তাবেঈ ও সালফে সালেহীনদের মধ্যে যাদের কথা হালাল-হারাম ও ফাতাওয়ার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হয়, তাদের কারো থেকে এ ধরনের সুস্পষ্ট কথা বর্ণিত হয়নি যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর এক শব্দে তিন তালাক দিলে এক তালাক ধরা হবে। (জাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান ৭/৭১০পৃ.)

২. ইবনে তাইমিয়াহ (যিনি এক তালাক হওয়ার প্রবক্তা) বলেন, এক শব্দে তিন তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদের শেষ উক্তি এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত। (ইবনে তাইমিয়া, ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ ১৭/৮পৃ.)

৩. ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, (তিনিও এক তালাকের প্রবক্তা) এক শব্দে তিন তালাক দিয়ে দিলে তালাক হওয়ার ব্যাপারে লোকদের চারটি মাযহাব আছে। প্রথমটি হলো,

তিন তালাকই হয়ে যাবে, এটা চার ইমাম, অধিকাংশ তাবেঈ ও সাহাবাদের মাযহাব। (লাজনাতুত দায়িমাহ-এর উদ্ধৃতিতে আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৩৬৬পৃ.)

৪. চার ইমামের মাযহাবের বিপরীত যা আছে, তা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। যদিও তাতে অন্যদের দ্বিমত থাকে। (ইবনে নুযাইম মিশরী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ১৬৯) উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, এক মজলিসে বা এক শব্দে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হবে।

দ্বিতীয় মাযহাবের দলিল ও এর জবাব :

১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রুকানা (রা.) তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিলেন এবং পরে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছো? তিনি বললেন, আমি তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন এক মজলিসে দিয়েছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন, এটা এক তালাক, যদি চাও তাহলে তাকে ফিরিয়ে নাও। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং. ২৩৯১)

জবাব :

এই ঘটনার বর্ণনায় ভিন্নতা পাওয়া যায়, এখানে আছে যে তিনি তাকে তিন তালাক দিয়েছেন। আর আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় আছে যে 'বাত্তাহ' শব্দ দ্বারা তালাক দিয়েছেন। এই দুই ধরনের বর্ণনার কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীসকে 'মা'লূল' বলেছেন। ইবনে আব্দুল বার এই হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন। (ইবনে হাজার আসকালানী, তালখীসুল হাবীর, ১৬০৩) ইমাম জাসসাস ও ইবনে হুমাম (রহ.) মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাকে 'মুনকার' বলেছেন। (তাকমিলাহ ১/১১৫)

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম আবূ দাউদ 'বাত্তাহ' শব্দ দ্বারা তালাক দেওয়াকে রাজেহ বলেছেন। কোনো বর্ণনাকারী এটাকেই তিন তালাক বুঝে সেভাবে বর্ণনা করেছেন। এই কারণে ইবনে আব্বাসের পরবর্তী হাদীস দ্বারাও দলিল দেওয়া যাবে না। (ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৯/৪৫৪, তাকমিলাহ ১/১১৫)

২. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে, আবূ বকরের যুগে ও খিলাফাতে উমরের প্রথম দুই বছর (কোনো বর্ণনায় তিন বছর) তিন তালাক এক তালাক ছিল। অতঃপর, হযরত উমর (রা.) বলেন, লোকেরা এমন বিষয়ে তাড়াহুড়ো করছে যে বিষয়ে তাদের অবকাশ ছিল। হায়! যদি আমি তাদের উপর তা কার্যকর করতাম। অতঃপর তিনি তা কার্যকর করলেন। (মুসলিম, আস্-সহিহ, হাদিস নং. ৩৬৫৪)

জবাব :

ক. হাফেজ আবূ যুরআহ (রহ.) বলেন, এই হাদীসের অর্থ হলো, বর্তমানে লোকদের একসাথে তিন তালাক দেওয়ার যে প্রচলন দেখা যাচ্ছে, তা রাসূলের যুগে, আবূ বকরের যুগে ও খিলাফতে উমরের দুই বছরে ছিল না। তখন লোকেরা সুন্নাত তরীকায় তিন তুহুরে তিন তালাক দিতেন। (বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, হাদিস নং. ১৪৯৮৪)

খ. আর যদি হাদীসের অর্থ এই হয় যে, এক শব্দে তিন তালাক দিলে বর্তমানে তিন ধরা হয়, অথচ রাসূলের যুগে, আবু বকরের যুগে ও খিলাফতে উমরের প্রথম দুই বছর তা এক তালাক ধরা হতো। তাহলে এর উত্তর হলো :

এ মাযহাবের দুটি হাদীস, উভয়টি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। অথচ তার ফাতওয়া হলো, এক শব্দে বা এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যায়, যা দলিল নং ২ ও ১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে। আর ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইহইয়া বিন সাঈদ আল কত্তান, আহমাদ বিন হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদিনীর মতো বড় বড় মুহাদ্দিসীনের মাযহাব হলো, যখন কোনো রাবী তার হাদীসের বিপরীত আমল করে বা ফাতওয়া দেন, তখন তার বর্ণিত হাদীসটি আমলযোগ্য থাকে না। সুতরাং ইবনে আব্বাসের এই হাদীসদ্বয়ও আমলের যোগ্য নয়; বিভিন্ন আপত্তির কারণে তা অগ্রহণযোগ্য। (জাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান ৭/৭১৬পৃ.)

গ. এই হাদীস একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, তা হলো যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলত, তুমি তালাক, তুমি তালাক, তুমি তালাক এবং বিচারকের সামনে দাবি করত যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বলে প্রথমটির তাকিদ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল; ভিন্ন তালাক উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে কাযী তার দাবি কবুল করতেন এবং তার কথাকে বিশ্বাস করে এক তালাকের ফাতওয়া দিতেন। কিন্তু হযরত উমরের যুগে লোকজন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের দ্বীনদারী কমতে থাকে, তখন হযরত উমর (রা.) বিচার ব্যবস্থায় এ ধরনের দাবি কবুল না করার আইন কার্যকর করেন এবং ওই শব্দ দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেন, তথা তিন তালাক হওয়ার ফাতওয়া কার্যকর করেন। (তাকমিলাহ ১/১১৪পৃ. , ফাতহুল বারী ৯/৪৫৬পৃ.)

যদি তা-ই নাহতো এবং উমর (রা.)-এর এ সিদ্ধান্ত শরীয়তে মুহাম্মদীর বিপরীত হতো, তাহলে ইবনে আব্বাসসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম কখনোই তা মেনে নিতেন না। যেমন উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা, এক দিনারকে দুই দিনারের মাধ্যমে বিক্রি করা এবং হজ্বে তামাত্তু-এর মাসআলায় হযরত ইবনে আব্বাস স্পষ্ট ভাষায় হযরত উমরের বিরোধিতা করেন। (ইউসুফ লুধিয়ানী, আহসানুল ফাতাওয়া, ৫/৩৬৯পৃ.)

যদি কেউ বলে যে, হযরত উমরের ভয়ে সাহাবারা তার প্রতিবাদ করেনি (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন ধারণা পুরো দ্বীনকে ভিত্তিহীন করে দেবে, যা কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে তাইমিয়াহ বলেন যে, কারো জন্য এই ধারণা করা জায়িয নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের শরীয়ত পরিপন্থী কোনো বিষয়ের ওপর একমত হয়েছেন। (ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতাওয়া ১৭/২২পৃ.)

সর্বশেষ কথা : আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুদেরকে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা মদীনার আমল দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন, অথচ সৌদি সরকার কর্তৃক মক্কা-মদীনাসহ দেশের বড় উলামাদের নিয়ে গঠিত কমিটিকে সৌদি সরকার যখন এ মাসআলার তাহকীক পেশ করার নির্দেশ দেয়, তখন তারা দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এক শব্দে বা এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পতিত হবে। (এ ঘটনা আহসানুল ফাতওয়ার পঞ্চম খণ্ডের ২২৫-৩৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।) সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম ডা. জাকির নায়েক একে এক তালাক গন্য করে ভ্রান্ত পথ রচনা করেছেন। এভাবে তিনি তাদের আজীবন হারাম ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পথ করে দিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ!!

৩০. দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে পানাহারের ব্যাপারে এবং হাদিস অর্থ বিকৃতি করে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,"দাঁড়িয়ে পান করা হলো মাকরূহ-সুন্নাত।....প্রয়োজনে মুহাম্মদ (দ.) মাঝে মাঝে মাকরূহ করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন যে, তিনি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথে ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) অনেক সময় হাঁটতে হাঁটতে খেতেন এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করতেন। (তিরমিযি, হাদিস নং. ১৮৮১)"[১৫১]

পর্যালোচনা ঃ মাকরূহ কখনো সুন্নাত হতে পারে না। কারণ, মাকরূহ অর্থ অপছন্দনীয়। কোন অপছন্দনীয় কাজ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নত হয় কী করে? এটা ডা. জাকির নায়েকের মনগড়া থিউরী। (দেখুন : ক্বাওয়াইদুল আহকাম, ১ম খণ্ড, ১১৩পৃ.) অপরদিকে "রাসূল (ﷺ) মাঝে মাঝে মাকরূহ করেছেন" বলা ডাক্তার জাকির নায়েকের মিথ্যা অপবাদ। মহানবি (ﷺ) মহান আল্লাহর পছন্দনীয় বা নির্দেশিত কাজই করেছেন বা বলেছেন-যার নির্দেশনা তখন তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ

১৫১. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র ভলিয়ম নং ৫/৩০৩পৃ.

থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই তা মাকরূহ হতে পারে না। (প্রমাণ : সুরা নাজম, আয়াত নং, ৩-৫) এ ক্ষেত্রে হতবাক হতে হয় ডা. জাকির নায়েকের হাদিস বিকৃতিকরনের জালিয়াতী দেখেন! তিনি মিথ্যা তথ্য দিয়ে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর অপবাদ লাগিয়েছেন! তিনি তিরমিযি শরীফের ১৮৮১ নং হাদিসের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে," হযরত ইবনে ওমর (ﷺ) বলেন যে, তিনি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাথে ছিলেন এবং মুহাম্মদ (ﷺ) অনেক সময় হাঁটতে হাঁটতে খেতেন এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করতেন।" অথচ উক্ত হাদিসে এ কথা নেই। বরং উক্ত মূল হাদিসের ভাষ্য হলো-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

-" (মূল অর্থ) হযরত ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যামানায় এমতাবস্থায় খেতাম যে, আমরা চলছি এবং আমরা পান করতাম এমতাবস্থায় আমরা দাঁড়ানো।" (জামে তিরমিযি, হাদিস নং.১৮৮০) দেখুন ডা. জাকির নায়েক হাদিসকে কিভাবে বিকৃত করেছেন। হাদিসের বিবরণে যেখানে ইবনে উমর (ﷺ) বলেন যে, আমরা তা করতাম, ডা. জাকির নায়েক তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর প্রয়োগ করে বলে দিলেন যে, ইবনে উমর (ﷺ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা করতেন। ডা. জাকির নায়েকের এটা কত বড় ধৃষ্টতা! (নাউযুবিল্লাহ)। উপরন্তু দাঁড়িয়ে খাওয়া বা পান করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ম)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার হাদিস রয়েছে। যেমন হাদিসে রয়েছে হযরত জারদ ইবনে মুয়াল্লা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

-"নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।"(জামে তিরমিযি, হাদিস নং.১৮৮১) খাদেমুর রাসূল (ﷺ) হযরত আনাস বিন মালেক (ﷺ) বর্ণনা করেন-

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

-"রাসূল (ﷺ) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।" (সুনানে দারেমী, ২/১৩৫১পৃ. হাদিস নং ২১৭৩) অন্য সাহাবী এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।"(সহিহ মুসলিম, ৩/১৬০১পৃ. হাদিস নং.২০২৫) যেমন সাহাবীদের আমল দেখুন-

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الشُّرْبِ، قَائِمًا فَكَرِهَهُ،

-"হযরত কাতাদা (ﷺ) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (ﷺ) কে দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এটি মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।" (মা'মার বিন রাশেদ, জামেউ মা'মার বিন রাশেদ, ১০/৪২৭পৃ. হাদিস নং.১৯৫৯০) সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটি বিষয় সবাই লক্ষ রাখতে হবে যে আদেশ নিষেধ কোনো মাস'আলা যদি দ্বন্দ্ব হয় তখন নিষেধটিই প্রধান্য পাবে। তাই উল্লেখিত ধরনের বর্ণনা উজর বা কোনো কারণে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এ জন্য সাধারণভাবে বসে খাওয়া বা পান করাই সুন্নাত আমল। তবে কোনো বিশেষ উজর বশতঃ দাঁড়িয়ে খাওয়া বা পান করা যায়। কিন্তু তা সুন্নাত নয়, বরং তা পারত পক্ষে তা না করা বাঞ্ছনীয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং. ২০২৪, ও ২০২৬/ ইবনুল কাইয়্যম, যাদুল মা'আদ ৪র্থ খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)

৩১. ইসলামী নারী ও পুরুষের সাক্ষ্যের ব্যবধানের ব্যাপারে ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"লেনদেন ও হত্যা মামলা ছাড়া কোন ক্ষেত্রে "দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান।"-এ কথা বলা যায় না। কুরআনের ন্যূনতম ৫টি আয়াতে নারী-পুরুষ কারো উল্লেখ ব্যতীত সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। তাই এসব ক্ষেত্রে সাক্ষী হওয়ার জন্য নারী ও পুরুষ সমান। সুতরাং পুরুষের মতো শুধু চারজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারাও হদ্দে যিনা ছাবিত হবে, শুধু দু'জন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা হদ্দে ক্বাজাফ, হদ্দে সারাক্বাহ, হদ্দে শারাব প্রভৃতি হুদুদ-দণ্ড সাব্যস্ত হবে।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/৪৪পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সুযোগ্য উস্তাযের মাধ্যম বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদরাসায় পড়া ছাড়া নিজে নিজে কুরআন হাদিস বুঝা সম্ভব হয় না। যদ্দরুণ পদে পদে পদস্খলনের শিকার হতে হয়। ডা. জাকির নায়েকের অবস্থা তদ্রুপ হয়েছে। যদ্দরুণ তিনি নিজেও গোমরাহ হয়েছেন এবং মানুষকেও গোমরাহ করছেন। বস্তুত শরীয়তের উসূল হলো- সাধারণ ব্যাপারে কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন হয়। আর যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া যায় তখন একজন পুরুষ ও তার সাথে দুইজন নারীর সাক্ষ্য লাগবে। সুতরাং বুঝা গেলো নারীদের সাক্ষ্য দ্বারা দাবি প্রমাণিত হবে না-যদিও দুইজন পুরুষের পরিবর্তে বহু সংখ্যক নারী সাক্ষ্য প্রদান করে। (তবে শুধু নারীত্বের কোন গোপন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপর হলে ভিন্ন

কথা।) তাহলে এ ক্ষেত্রে পাইকারীভাবে "দুইজন নারী একজন পুরুষের সমান"-এ কথা বলা খাটে না।

অপরদিকে ইসলামী শরিয়তে হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যই হয় না। তাই সেখানে দু'জন কেন, শত-সহস্র নারীর সাক্ষ্যও একজন পুরুষের সমান হতে পারবে না।যেমন, হদ্দে যিনা ছাবিত হওয়ার জন্য চারজন আকেল-বালেগ-সজ্ঞান আদেল মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে সাক্ষী চারজন পুরুষ না হয়ে যদি চারজন নারী হয়, তাতে হদ্দে যিনা ছাবেত হবে না। এমনকি সাক্ষী চারজন পুরুষ না হেয় যদি তিনজন পুরুষ সাক্ষী হয় এবং একজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন বা তার বেশী নারী সাক্ষ্য প্রদান করে, তথাপি হদ্দে যিনা ছাবিত হবে না। একই হুকুম অন্যান্য হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে। অথচ ডা. জাকির নায়েক কেমন অবলীলায় বলে দিলেন যে, এ হদ্দে যিনা ছাবিত হওয়ার জন্য কোন পুরুষেরই প্রয়োজন হয় না। বরং চারজন পুরুষের পরিবর্তে চারজন নারী সাক্ষ্য দিলেও হদ্দে যিনা ছাবিত হবে। এটা ডা. জাকির নায়েকের সম্পূর্ণ মনগড়া কথা।

ডা. জাকির নায়েক মূলত এ সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অথচ ইসলাম জঞ্জালপূর্ণ সাক্ষ্যে নারীদেরকে যথাসম্ভব ঝামেলা থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করেছে এবং পুরুষদেরকে সেই ঝামেলার দায়িত্ব দিয়ে নারীদেরকে সুবিধা প্রদান করেছে। এভাবে ইসলামে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের পরিবর্তে নারীর জন্য বেশী অধিকার ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অধিকারকে সমান করার প্রয়াস তাদেরকে তাদের ন্যায্যভাবে প্রাপ্য বেশী অধিকার থেকে বঞ্চিত করার শামিল। ডা. জাকির নায়েক তার দাবীর সপক্ষে যে আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেই আয়াতগুলো যদি নিজে নিজে বুঝার চেষ্টা না করে যোগ্য উস্তাদের মাধ্যমে হাদিস ও তাফসীরের আলোকে বুঝতে সচেষ্ট হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি এ ব্যাপারে প্রকৃত বিধান অবগত হতে পারতেন। কিন্তু গাইড লাইন না থাকায় ইল্‌মের দৌড়ে তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছেন। তবে ভয়ানক ব্যাপার হলো যে, তিনি নিজেই শুধু পথচ্যুত হননি, অন্যদেরকেও লেকচারের মাধ্যমে তার ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করে পথচ্যুত করার বন্দোবস্ত করছেন (নাউযুবিল্লাহ)। (প্রমাণ স্বরূপ দেখুন-সুরা বাক্বারা, আয়াত নং. ২৮২, সুরা নিসা আয়াত নং. ১৫, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৫/২৬৬পৃ. বাগভী, তাফসীরে মা'লিমুত তানযিল, ১/৩৫০পৃ.)

৩২. ডা. জাকির নায়েক নামাযকে ব্যায়াম বলার ধৃষ্টতা ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"**নামায একটি ইসলামী ব্যায়াম।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/৫৭৮)

পর্যালোচনা ঃ ডাক্তার জাকির নায়েক এভাবে নামাযের বিভিন্ন কর্মকে বিভিন্ন ব্যায়ামের সাথে তুলনা দিয়ে নামযকে ইসলামী শরিয়তে ব্যায়াম বলে প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়েছেন; যা সম্পূর্ণ কুফুরী। তিনি বলতে পারতেন যে নামায পড়লে বিভিন্ন ব্যায়ামের মাধ্যমে অনেক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। তার এ কথা মত তো যে কেউ নামায পড়ে এসে বলবে আমরা ইসলামী ব্যায়াম করে আসলাম (নাউযুবিল্লাহ)।

৩৩. আযানকে মুসলমানদের জন্য জাতীয় সঙ্গীত বলে ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,"**আযান মুসলমানদের জন্য জাতীয় সঙ্গীত।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম, ২/৩১পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সাধারণ যে কোন মুসলিম যদি সঙ্গীতের সংজ্ঞা জানেন তা হলেই অনুধাবণ করতে পারবেন যে আযানকে সঙ্গীত বলা যায় কী না। আযান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা প্রাপ্ত কালাম; আর তাঁর কালামকে পৃথিবীর মানুষের বানানো সঙ্গীতের সাথে তুলনা দেয়া কুফুরী। হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

عن عمرو بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نزل ادم بالهند واستوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين قال ادم من محمد قال اخر ولدك من الأنبياء

-"হযরত আদম (ﷺ) যখন হিন্দুস্থানে অবতরণ করলেন তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (ﷺ) অবরণ করলেন এরপর আযান দিলেন আল্লাহু আকবার দুইবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ দুইবার এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দুইবার। আযানের বাক্য শুনে হযরত আদম (আ.) বললেন যে, মুহাম্মদ কে? জিবরাঈল (ﷺ) বলেন সে তোমার আওলাদের একজন নবি।"[১৫২] বুঝা গেল আযানের বাক্য স্বয়ং মহান আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে আসা কালাম। তাকে পৃথিবীর মানুষের বানানো সঙ্গীতের সাথে তুলনা দেয়া ইসলামকে অবমাননার শামিল।

৩৪. আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"আল্লাহ অতিপ্রাকৃত নন। আল্লাহ প্রাকৃতিক। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ২/১৭৪পৃ.)

---

১৫২. ইবনে আসাকীর, (ওফাত.৫৭১হি.), তারীখে দামেস্ক, ৭/৪৩৭পৃ.

পর্যালোচনা ঃ আল্লাহ প্রাকৃতিক হওয়া থেকে মুক্ত। আকায়েদ বিদগণের মতে আল্লাহ তা'য়ালাকে প্রাকৃতিক বলা কুফুরী। (শরহে আকায়েদ, নিবরাস) ডা. সাহেব তো কখনো আকায়েদের কিতাব পড়েননি তাই আবোল তাবোল বকেন।

৩৫. আল্লাহ মানুষ হতে পারেন ধারণা রাখার বিষয়ে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"আল্লাহ মানুষ হতে পারেন। কিন্তু হবেন না।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ৫/১৭২পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পৃথিবীতে আল্লাহর কোন দৃষ্টান্ত বা উপমা নেই। তিনি মানুষ হতে পারেন বলে ধারণা রাখলে তো উপমা হয়ে যাবে যা সম্পূর্ণ কুফুরী হবে। এটি ইহুদিদেরে ও হিন্দুদের বিশ্বাস। মানুষ হলে উপমা হয়ে দাঁড়ায় লোকটি কেমন বা তার গুণাবলী এরূপ এরূপ ইত্যাদি। আর আল্লাহ মানুষের রূপে হতে পারেন তো দূরের কথা আল্লাহ আকার আকৃতি থেকেই মুক্ত। ইমাম বায়হাক্বী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন-

فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْلَمَهُ: أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ، فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ،

-"নিশ্চয় আমাদের ও সকল মুসলমানের জানা অত্যাবশ্যক যে, আমাদের প্রভু আকৃতি ও অবয়ব বিশিষ্ট নহেন। কেননা, আকৃতি (الْكَيْفِيَّةَ) তথা 'কেমন' এর চাহিদা রাখে। অথচ কেমন প্রশ্নটি আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।"[১৫৩] তিনি আরও বলেন-

أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ بِمَعْنَى الصِّفَةِ-"কোনো ক্ষেত্রে যদি আকৃতি প্রকাশের কথা আসে তা হবে তাঁর সিফাত বা গুণাবলী।"[১৫৪] ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরও বলেন-

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِي تَعَالَى مُصَوَّرًا وَلَا أَنْ يَكُونَ لَهُ صُورَةٌ، لِأَنَّ الصُّورَةَ مُخْتَلِفَةٌ،

-**"আল্লাহ তা'য়ালার জন্য আকৃতি আছে ধারণা করা বৈধ নয়,** কেননা তার কোন আকৃতি নেই। আর তাঁর আকৃতি হলো স্বতন্ত্র।"[১৫৫]

১৫৩. ইমাম বায়হাকী, কিতাবুল আসমা ওয়াল সিফাত, ২/৬৬পৃ. হাদিস ঃ ৬৪১, মাকতুবাতুল সৌদিয়া, জেদ্দা, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৩হি.

১৫৪. ইমাম বায়হাকী, কিতাবুল আসমা ওয়াল সিফাত, ২/৬৬পৃ. হাদিস ঃ ৬৪১, মাকতুবাতুল সৌদিয়া, জেদ্দা, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৩হি.

১৫৫. ইমাম বায়হাকী, কিতাবুল আসমা ওয়াল সিফাত, ২/৬০পৃ. মাকতুবাতুল সৌদিয়া, জেদ্দা, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৩হি.

৩৬. যে কোন বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে আলেম বলে ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"আলেম অর্থ জ্ঞানী। যার জ্ঞান আছে, তিনি আলেম।** আলেম অর্থ এটা নয় যে, কোন বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থায় ১২-১৪ বছর পড়াশোনা করেছে। কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত বুঝতে বিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে। কারণ, তিনি বিজ্ঞানের আলেম। কুরআনের চিকিৎসাবিষয়ক আয়াত বুঝতে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। কারণ, তিনি চিকিৎসার আলেম। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং.২/৬২৮পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ ইসলামী শরিয়তে আলেম বলা হবে যে শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করবে। আর এ ছাড়া অন্য যে কোনো বিদ্যা জ্ঞান তা ঠিক; কিন্তু কুরআন হাদিসে এ জ্ঞান অন্বেষণের কথা বলেনি। বরং ইলমে দ্বীন ছাড়া অন্য ইলম অন্বেষণের বিষয়ে নবিজীর এক হাদিসে হুঁশিয়ারী করা হয়েছে; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

-"যে ব্যক্তি **আল্লাহর ইলম ছাড়া** অন্য কোন ইলম অন্বেষণ করবে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে খুঁজে নেয়।"[১৫৬] ইমাম তিরমিযি তার সুনানে এবং মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মদ শাকের এ হাদিসটি 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫৭]

৩৭. জাকির নায়েকের প্রত্যেক ব্যক্তির ফাতওয়া দেয়ার অধিকার দেখিয়ে বিভ্রান্তি

ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"প্রত্যেক ব্যক্তির ফাতওয়া দেয়া বৈধ। কারণ, ফাতওয়ার অর্থ হলো মত পেশ করা।"** (ডা. জাকির নায়েক, সায়েন্স আওর কুরআন, ৪৩পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ ইসলামী শরিয়তে ফাতওয়া দিতে হলে ৮টি গুণবলী থাকতে হবে। ইলমী ও ইসতিম্বাতী মাসায়েল বর্ণনা এটা শুধুমাত্র মুহাক্কিক আলেমগণই করতে পারেন। আলেমগণ ব্যতীত অন্য কেউ এ কাজ করলে সমাজে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ছড়াবে। তাই ডা. জাকির নায়েক যেহেতু মুফাস্সির, মুফতি, কিংবা মুহাদ্দিস নন সেহেতু তার কথা অনুসরণ করা গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর শেষ যামানায় জাকির নায়েকের মত এমন ধরনের লোকদের আবির্ভাব হবে বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সতর্ক

১৫৬. তিরমিযি, আস্-সুনান, ৪/৩৩০পৃ. হাদিস ঃ ২৬৫৫, সুয়ূতী, জামেউস সগীর, হাদিস, ১২৩০৮

১৫৭. শাকের, মুসনাদে আহমদ (তাহক্বীক হাশীয়াতে), ৮/৩১৯পৃ. হাদিস নং. ৮৪৩৮, দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর, তিরমিযি, আস্-সুনান, হাদিস ঃ ২৬৫৫।

করে গেছেন। তাই নবীজি বলেছেন-"আখিরী যামানার লোকেরা জাহেলদেরকে ধর্ম বিজ্ঞ মনে করবে। অতঃপর তাদের নিকট প্রশ্ন হবে, আর তারা সে বিষয়ে ইলম ছাড়াই উত্তর দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে।"[১৫৮]

১. আল্লামা নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "কোন বিষয়ে উত্তর দেয়া ও মাসআলা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অপরদিকে তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।"(মুকাদ্দামাতু কিতাবিল মাজমূ, ১/৯২পৃ.)

২. ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহিমাহুল্লাহ) ও আল্লামা সুহনূন (রহিমাহুল্লাহ)বলেন-"যার ইল্‌ম কম, (অনেকাংশে) এমন লোক নানা বিষয়ে জাওয়াব দেয়ার ক্ষেত্রে বেশী দুঃসাহস দেখায়।"(ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীন, ১/২৮পৃ.)

৩. তাবে-তাবেয়ী আল্লামা ইবনে মুনকাদার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন -"আলেম আল্লাহ ও তাঁর মাখলুকের মাঝে মাধ্যম হয়ে থাকে।"[১৫৯] মাসআলা বলা ও ফাতওয়া দেয়া এতো কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণেই অনেক বড় বড় সাহাবায়ে কিরামও এর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন এবং বিষয়টি একজন অন্যজনের কাছে সোপর্দ করতেন।

৪. ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন-"যদি ইলম মিটে যাওয়ার আশংকা না থাকতো, তাহলে আমি ফাত্ওয়া দিতাম না।"(খতিবে বাগদাদী, কিতাবুল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৬৮পৃ.)

৫. ইমাম আবু মুছ'আব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন আমি ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলতে শুনেছি,

سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبٍ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ: مَا أَفْتَيْتُ حَتَّى شَهِدَ لِي سَبْعُوْنَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ.

"সত্তরজন আলেম আমার ফাত্ওয়া দেয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে পরে আমি ফাতওয়া দেয়ার কাজ আরম্ভ করি।"[১৬০] পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং এ সকল উক্তি দ্বারা বুঝে আসে যে, ইলমী ও ইস্তম্বাতী কাজ শুধু মুহাক্কিক উলামা ও ফকিহগণই করতে পারেন। অন্য কেউ নয়। আর জাকির নায়েকের তো প্রশ্নেই আসে না। তবে তিনি শুধু ইসলামের সাথে বিভিন্ন ধর্মের সাথে মিলপূর্ণ বিষয় দিয়েই যদি বিভিন্ন ধর্মের

১৫৮. সহিহ বুখারী, হাদিস নং.১০০
১৫৯. খতিবে বাগদাদী, কিতাবুল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১১৮পৃ.
১৬০. খতিবে বাগদাদী, কিতাবুল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১৫৪পৃ. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৭/১৭৯পৃ. ও তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১/৫৪পৃ.

মানুষদেরকে আহবান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলেই চলতো। তিনি ইসলামী ফিক্‌হ বিষয়ে অভিজ্ঞ না হয়ে মুফতি সাজাই তার জন্য ভয়ংকর হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আলেম, ও ফকীহ হতে হলে, সনদ প্রাপ্ত আলেম ও ফকিহ এর কাজ থেকে ইলম ও ফিক্‌হ শিক্ষা করার এবং তাদের সত্যায়নের মাধ্যমেই হতে হবে। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ-

-"হে মানুষ সকল! গ্রহণযোগ্য ইলম সেটাই-যা নবীদের ও তাদের ওয়ারীসদের থেকে শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা হয়। আর আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকেই দ্বীনের ফকিহ বানান। আর আলেমরাই আল্লাহ কে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন।"[১৬১]

৩৮. নারী-পুরুষ সবার মসজিদে ই'তিকাফ বৈধ বলে ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"নারীদের ঘরে ই'তিকাফ করার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪০৩পৃ.)

তিনি আরেক স্থানে বলেন-**"মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে এবং এই নিয়ম নারী-পুরুষ সকলের জন্যে সমান।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪০২পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ আমি একাধিকবার আলোচনা করেছি যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিতনা ফাসাদের আশঙ্কা ছিল কম। তাই নবিজীর স্ত্রী আমাদের মা জননীগণ মসজিদে ই'তিকাফ করতেন বলে কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়; তাও অস্পষ্ট। কেননা আমাদের মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা রয়েছে যে নবিজীর বিবিগণ তাদের হুজরা শরীফে অবস্থান করতেন।

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

-"হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফ অবস্থায় থাকলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতেন না।"[১৬২] বুঝা গেল নবিজীর বিবিগণ তাদের

১৬১. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৯/৩৯৫পৃ. হাদিস ঃ ৯২৯, ও মুসনাদিস সামীন, ১/৪৩১পৃ. হাদিস ঃ ৭৫৮, বায়হাকী, আল-মাদখাল, ১/২৫৩, হাদিস ঃ ৩৫২, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ১/১৬১পৃ.
১৬২. সহিহ বুখারী, ৩/৪৮পৃ. হাদিস নং ২০২৯, সহিহ মুসলিম, ১/২৪৪পৃ. হাদিস নং ২৯৭, নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/৩৯০পৃ. হাদিস নং ৩৩৬১

খাস কামরাই ই'তিকাফ করতেন। হাদিসে রয়েছে নবিজীর বিবিগণ তাদের হুজরা শরীফে প্রবেশ করলেই তারা দেখতে পেতেন। অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে যে মা আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন-

إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ

-"রাসূল (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ই'তিকাফের সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন সালাতুল ফাজর আদায় করতেন তারপর তাঁর ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন।"[১৬৩] বুঝা গেল নবিজী তাঁর বিবিদেরকে হুজরা শরীফে রেখেই ই'তিকাফে আসতেন। সকলেরই জানা উচিত যে মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা ই'তিকাফের একটি অন্যতম শর্ত। যেমন মা হযরত আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا

-"ই'তিকাফকারী সে কোন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাবে না, কোন জানাযায় উপস্থিত হবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, স্ত্রী সঙ্গম বা সহবাস করবে না।"[১৬৪] তাই ই'তিকাফের অন্যতম একটি শর্তই হল নারীদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকতে হবে। যদিও নারীরা পর্দা করে মসজিদে ই'তিকাফ করলো তারপরও পুরুষদের মনে ওয়াসওয়াসা আসতে পারে। আর তাতে বরং ফিতনা ফ্যাসাদ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আরও বেশী।

৩৯. রোযার কাফফারা নিয়ে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"**রোযার কাফফারা হচ্ছে-দুই হাতের তালু একত্র করে প্রসারিত যতটুকু গম ধরবে।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/২৩৫পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! অথচ রাসূল (ﷺ) এর হাদিসের দিকে লক্ষ করুন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

১৬৩ .হুমায়দী, আল-মুসনাদ, ১/২৫৪পৃ. হাদিস নং ১৯৬, সহিহ মুসলিম, ২/৪৩১পৃ. হাদিস নং ১১৭২, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৫৬৩পৃ. হাদিস নং ১৭৭১, সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং ২৪৬৪, সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ৭৯১, সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ৭০৯

১৬৪ . আবু দাউদ, আস্-সুনান, ২/৩৩৩পৃ. হাদিস, ২৪৭৩, আলবানী বলেন সনদটি হাসান, সহিহ।

-"হযরত আবূ হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রামাদ্বান মাসে সিয়াম ভঙ্গ করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে নির্দেশ দেন যে, সে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করবে অথবা দুই মাস সিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ জন দরিদ্রকে খাওয়াবে।"[১৬৫] অথচ ডা. জাকির নায়েক রোজার কাফ্ফার মনগড়া মতবাদ প্রচার করে মুসলিম উম্মাহকে পথভ্রষ্ট করছে। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিসে পাক রয়েছে বিস্তারিত জানতে আপনার মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) এর 'ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার' ১ম খণ্ডের ৪৬৪পৃ.-৪৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন।

৪০. ফিতরা নিয়ে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"**ফিতরা সকল মুসলিমের উপর ফরজ।**"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪৬২পৃ.) শুধু তাই নয়, তিনি বুখারীর হাদিসের অপব্যাখ্যা করে লিখেন-"**প্রত্যেক মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর হিসেবে এক 'শাআ' খেজুর অথবা বার্লি দেওয়া বাধ্যতামূলক।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪৬২পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! সকলের উপর যদি ফিতরা ফরজ হয় তাহলে গ্রহণ করবে কে? এবার আমরা হাদিসে পাকে লক্ষ করবো সেখানে কী সকলের উপর ফিতরা আবশ্যক করেছেন কি না। যেমন একটি হাদিসে পাক লক্ষ করুন-

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ-

-"তাবেয়ী ইকরামা সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) ফরজ (নির্ধারণ) করেছেন, (উদ্দেশ্য হচ্ছে) যেন সিয়াম পালনকারী নিরর্থক ও অশ্লীল কথা (ইত্যাদি ছোটখাট অপরাধ) থেকে পবিত্রতা লাভ করে এবং **দরিদ্র মানুষ যেন খাদ্য লাভ করে।**"[১৬৬] ডা. জাকির নায়েকের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী স্বয়ং এ হাদিসটিকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬৭] কিন্তু হাদিসটি সহিহ। কেননা, ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহ.) এ সনদটিকে সহিহ বলে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আর ইমাম যাহাবী (রহ.)

১৬৫ . মুসলিম, আস্-সহিহ, কিতাবুস সিয়াম, ২/২৮২পৃ. হাদিস নং ১১১১, আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৩/১২৫পৃ. হাদিস নং ৭৬৯২, আবু দাউদ, আস্-সুনান, ২/৩১৩পৃ. হাদিস নং২৩৯২

১৬৬ . ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ১/৫৮৫পৃ. সাদকাতুল ফিতর, হাদিস নং১৮২৭, আবু দাউদ, আস্-সুনান, ২/১১১পৃ. হাদিস নং ১৬০৯, হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৬৮পৃ. হাদিস নং ১৪৮৮

১৬৭ . আলবানী, সহিহুল সুনানুল ইবনে মাযাহ, হাদিস নং১৮২৭, আলবানী, সহিহুল সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং ১৬০৯

বলেন এ সনদটি সহিহ বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে সহিহ।[১৬৮] এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে পাক দেখুন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

-"হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ধানাঢ্যতা বা সচ্ছলতার উপরে ছাড়া সাদকা (ফিতরা) নেই।"[১৬৯] তাই বুঝা গেল জাকির নায়েকের এ কথা নবি বিরোধী; আর কোন প্রকৃত ঈমানদার তার এ কথা কখনই মানতে পারে না।

৪১. সবার ঈদের নামায পড়া নিয়ে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"ঈদের নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে বাধ্যতামূলক, এমনকি শিশু ও নারীদের জন্যেও, যদিও হোক সে ঋতুবতী।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪৭৬পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ ঈদের নামায মহিলা, শিশুদের উপর বাধ্যতামূলক নয়। জুমু'আ যাদের উপর অত্যাবশ্যক তাদের উপর ঈদের নামাযও বাধ্যতামূলক। ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার কিতাবে উল্লেখ করেন-

ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ جُمُعَةٌ-

-"আলে রাসূল (ﷺ) ইমাম ইবনে কাসেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মহিলা, গোলাম এবং মুসাফিরদের উপর জুমু'আর নামায নেই।"[১৭০] যেহেতু জুমু'আর নামাযই তাদের জন্য নেই সেহেতু ঈদের নামাযেও জায়েয নেই। ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) {ওফাত. ৫৮৭হি.) বলেন-

فَكُلُّ مَا هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَجَوَازِهَا فَهُوَ شَرْطُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ....وَكَذَا الذُّكُورَةُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ، وَالْإِقَامَةُ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِهَا كَمَا هِيَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ-

১৬৮. হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৬৮পৃ. হাদিস নং ১৪৮৮
১৬৯. ইমাম বুখারী, আস্-সহিহ, ৪/৫পৃ. তিনি তালিক সূত্রে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১২/৬৯পৃ. হাদিস নং ৭১৫৫, রিসালা, প্রকাশ. ১৪২১ হি. তিনি সনদসহ।
১৭০. ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি.

-"জুমু'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে, উক্ত শর্তাবলি ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্যও প্রযোজ্য। আর তা হলো, পুরুষ হওয়া, বোধশক্তি থাকা, বালেগ হওয়া, আযাদ হওয়া, সুস্থ থাকা, মুকীম হওয়া।"[১৭১]

প্রাথমিক যুগে নবিজি ঈদের নামাযে মহিলাদের আসতে নিষেধ করেননি; কিন্তু তবে ঘরেই তাদের জন্য উত্তম বলেছেন যার আলোচনা আমি মহিলাদের জামাতে শরীক হওয়ার আলোচনা করেছি। পরবর্তী যুগে ফিতনা ফ্যাসাদের কারণে মহিলাদেরকে ঈদের নামাযে এবং জুম'আর নামাযে মসজিদে আসতে বারণ করা হয়। যেমন, ইমাম আবি শায়বাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদিস সংকলন করেন এভাবে যে-

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ-

-"তাবেয়ী না'ফে (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন যে, সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) তার স্ত্রীগণকে ঈদগাহে বের হতে দিতেন না।"[১৭২] এ সনদটি সহিহ। **আহলে হাদিসদের মত জামাতের সাওয়াবের তাহলে কী ইবনে উমর (رضي الله عنه) বুঝেননি?** এ বিষয়ে আরেকটি আহলে বায়াতে রাসূলের আমলের দিকে লক্ষ করুন যেমন ইমাম আবি শায়বাহ সংকলন করেছেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ، أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَى الْعَوَاتِقِ، لَا يَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى-

-"হযরত আব্দুর রাহমান বিন কাসেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি বলেন তাঁর পিতা হযরত কাসেম (رضي الله عنه) সম্পর্কে বলেন যে তিনি মহিলাদের ঈদুল ফিতর ও আযহায় বের হতে দিতেন না।"[১৭৩] এ বিষয়ে তাবেয়ীদের যুগের অবস্থান লক্ষ করুন-

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُكْرَهُ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ-

-"বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইবরাহিম নাখঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া মাকরুহ।"[১৭৪] সনদটি সহিহ। আরেকটি বর্ণনা দেখুন-

১৭১. ইমাম কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে, ১/২৭৫পৃ. নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে ওয়াজিবের শর্তাবলী পরিচ্ছেদ।
১৭২. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৩পৃ. হাদিস নং ৫৭৯৫, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।
১৭৩. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪পৃ. হাদিস নং ৫৭৯৭, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُرِهَ لِلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ-

-"বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যুবতীরা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া আমি মাকরুহ বা অপছন্দ মনে করি।"[১৭৫]

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ تَخْرُجُ إِلَى فِطْرٍ، وَلَا إِلَى أَضْحَى-

-"বিখ্যাত তাবেয়ী হিশাম ইবনে উরওয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি তার পিতার কর্ম সম্পর্কে বলেন, তিনি তার পরিবারের কোন মহিলাকে ঈদুল ফিতর ও আযহায় যেতে দিতেন না।"[১৭৬] অসংখ্য সাহাবী জীবিতাবস্থায় যে তাবেয়ীরা ফাতওয়া দিতে তার ব্যক্তিগতভাবে নিজের পরিবারের বিষয়ে আমল দেখুন-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ «كَانَا يُخْرِجَانِ نِسَاءَهُمَا فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَمْنَعَانِهِنَّ مِنَ الْجُمُعَةِ-

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, নিশ্চয়ই তাবেয়ী হযরত আলকামা ও আসওয়াদ (রাহিমাহুমাল্লাহ) যখন মহিলারা ঈদের নামাযের জন্য বের হতে দেখতেন.... ।"[১৭৭] এ সনদটি সহিহ। হানাফী মাযহাবের চূড়ান্ত ফাতওয়ার হলো-

(وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ) وَلَوْ لِجُمُعَةٍ وَعِيدٍ .. (عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ،

-"মহিলাগণ জামাতে উপস্থিত হওয়া মাকরুহে তাহরীমী। যদিও সেটা জুমু'আর, ঈদের নামায হোক না কেন। এটিই গ্রহণযোগ্য মতামত। যামানার ফাসাদের কারণে।"[১৭৮] ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী হানাফী (ওফাত. ৫৮৭হি.) বলেন-

১৭৪. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৩পৃ. হাদিস নং ৫৭৯৪, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।
১৭৫. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪পৃ. হাদিস নং ৫৭৯৮, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।
১৭৬. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪পৃ. হাদিস নং ৫৭৯৬, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।
১৭৭. ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৩পৃ. হাদিস নং ৫৭৯০, নামায অধ্যায়, ঈদের নামাযে মহিলাদের যাওয়া অপছন্দনীয় পরিচ্ছেদ।
১৭৮. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রুদ্দুল মুখতার, ১/৫৬৬পৃ. নামায অধ্যায়, ইমামতি পরিচ্ছেদ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ১৪১২হি.।

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ،

-"সকলেই এ বিষয় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যুবতী মহিলাগণ জুমু'আ, ঈদ ও অন্যান্য নামাযের জন্য বের হতে পারবে না।"[১৭৯]

৪২. ঈদের নামাযের তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়তে হবে-প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর।"(ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৪৭৫-৪৭৬পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ ঈদের নামাযের সহিহ হাদিস মোতাবেক পদ্ধতি হলো ছয় তাকবীরে আদায় করা। জাকির নায়েকের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীই স্বয়ং বলেছেন যে, ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়তে হবে এ বিষয়ে যত মারফূ হাদিস রয়েছে তা একটিও সহিহ নয়।[১৮০] ছয় তাকবীরে ঈদের নামায আদায় করা প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদিসে পাক উল্লেখ করছি-

عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا ــ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ــ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ-

-"তাবেয়ী হযরত আলকামা (রাহিমাহুল্লাহ) ও হযরত আল-আসওয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা বসে ছিলেন, সে সময় তার কাছে ছিলেন হযরত হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। (কুফার প্রশাসক) হযরত সাঈদ ইবনুল আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে সালাতুল ঈদের তাকবীরের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। তখন হযরত হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আবু মূসা আল-আশ'আরীকে জিজ্ঞেস করুন। আশ'আরী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করুন, কারণ তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ এবং সবচেয়ে জ্ঞানী। তখন ইবনে মাসউদ

১৭৯. ইমাম কাসানী, বাদায়েউস সানায়ে, ১/২৭৫পৃ. নামায অধ্যায়, ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী পরিচ্ছেদ, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ১৪১২হি.।
১৮০. আলবানী, ইরওয়াউল গালীলের সূত্রে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, আস্-সুন্নাহ পাবলিকেন্স, ঝিনাইদাহ, বাংলাদেশ।

(ﷺ) বলেন, চারটি তাকবীর (তাহরীমাসহ) বলবে, এরপর কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন পাঠ শেষে তাকবীর বলে রুকু করবে। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে (যথারীতি) কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন পাঠের পর (রুকুর পূর্বে এর তাকবীরসহ) চারবার তাকবীর বলবে।"[১৮১] এ সনদটি খুবই সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে পাক রয়েছে-

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, দুই ঈদের তাকবীর চারটি (তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বিতীয় রাক'আতের রুকুর তাকবীরসহ) "ঠিক মৃতের জন্য আদায়কৃত (জানাযার) সালাতের ন্যায় হবে।"[১৮২] এ হাদিসের সনদ সম্পর্কে ইমাম নুরুদ্দীন হাইসামী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

-"এ হাদিসটি ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন; আর তার সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।"[১৮৩] ইমাম আবু দাউদ (রহ.) হাদিস সংকলন করেন এভাবে যে-

سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ»، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ،

-"হযরত সাঈদ ইবনে আস (ﷺ) হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (ﷺ) এবং হযরত হুযায়ফা (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন যে নবিজির দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি কিরূপ ছিল? অতঃপর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (ﷺ) বললেন, দুই রাকআতেই জানাযার ন্যায় চারটি অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে হত (এ হাদিসে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ হিসাব করা হয়েছে)। এ কথা শুনে হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (ﷺ) বলেন, আবু মূসা (ﷺ) সত্য

১৮১ .ইমাম আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/২৯৩পৃ. হাদিস নং. হাদিস নং.৫৬৮৭, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৩ হি.
১৮২ .ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/৩০৫পৃ. হাদিস নং. ৯৫২২, হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/২০৫পৃ. হাদিস, ৩২৫১, মাকতুবাতুল কুদসী, কায়রু, মিশর।
১৮৩ .হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ২/২০৫পৃ. হাদিস, ৩২৫১, মাকতুবাতুল কুদসী, কায়রু, মিশর।

বলেছেন।"[১৮৪] আহলে হাদিস ও জাকির নায়েকের মাযহাবের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃ.১৯৯৯খৃ.) এ হাদিসটির সনদে বলেন এ হাদিসটি হাসান, সহিহ।"[১৮৫] ইমাম তাহাবী (৩২১হি.) হাদিস সংকলন করেছেন এভাবে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، «أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْعِيدِ , فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , ثُمَّ قَرَأَ , ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ , ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ , ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ

-"তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস (রহ.) তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) এর পিছনে ঈদের নামায আদায় করেছি। অতঃপর তিনি প্রথমে চার তাকবীর (তাহরীমাসহ) দিলেন তারপর কিরাত পড়লেন, তারপর তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলেন। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাত পড়লেন তারপর তিনটি তাকবীর দিলেন, তারপর রুকুর তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলেন।"[১৮৬]

৪৩. জুমু'আর খুতবাহ যে কোন ভাষায় দেয়া যাবে বলে নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক জুমার খুতবাহ সম্পর্কে বাইয়ার নামক এক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বলেন-"তাহলে খুৎবা যেকোনো ভাষায় দেয়া যাবে।"[১৮৭] তারপর তিনি তার বক্তব্যে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলেন-"তাহলে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই।"[১৮৮] সমগ্র ভারতে আরবীতে খুতবাহ হয় বলে জাকির নায়েক বলেন-"আমি ভারতের জন্যে দুআ করবো আল্লাহ যাতে আমাদের হেদায়াত করেন।"[১৮৯]

১৮৪ .ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/২৯৯পৃ. হাদিস নং. ১১৫৩, মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, সিদান, লেবানন, খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৪৫৩পৃ. হাদিস নং.১৪৪৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৯৮৫খৃ. ।
১৮৫ .আলবানী, সহিহুল আস্-সুনান, হাদিস নং. ১১৫৩, তিনি বলেন সনদটি হাসান, সহিহ, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, ।
১৮৬ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, ৪/৩৪৭পৃ. হাদিস নং. ৭২৭৯, আলেমুল কিতাব, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৪ হি. ।
১৮৭ . ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৩পৃ. তার এ ভিডিও বক্তব্যটি পেতে ইউটিউব এর এ শিরোনামে সার্চ করুন "**তুমার খুৎবা কোন ভাষায় হওয়ার উচিৎ**")
১৮৮ . ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৩পৃ. তার এ ভিডিও বক্তব্যটি পেতে ইউটিউব এর এ শিরোনামে সার্চ করুন "**তুমার খুৎবা কোন ভাষায় হওয়ার উচিৎ**")
১৮৯ . ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৩পৃ. তার এ ভিডিও বক্তব্যটি পেতে ইউটিউব এর এ শিরোনামে সার্চ করুন "**তুমার খুৎবা কোন ভাষায় হওয়ার উচিৎ**")

পর্যালোচনা ঃ সর্বজন স্বীকৃত মত এবং এটি সকলের নিকট সুপ্রসিদ্ধ কথা যে, জুমু'আ খুতবাহ এটি কোনো ওয়াজ নসিহত নয়; বরং এটি একটি ইবাদাত, জোহর এর নামায চার রাক'আত; কিন্তু একই সময়ে জুমু'আর দিন সেই নামায দুই রাক'আত কারণ খুতবাহ যেহেতু রয়েছে। কেননা, খুতবাহ হচ্ছে জোহরের সে দুই রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত। তাই নামায যেহেতু আরাবী ছাড়া হয় না তেমনিভাবে খুতবাহও আরবী ছাড়া হবে না। যেমন একটি হাদিসে পাকের দিকে লক্ষ করুন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ

-"হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (ﷺ) বলেন, খুতবাহ অন্যান্য দিনের দুই রাক'আত নামাযের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।"[১৯০] এ রকম আরেকটি হাদিসে পাক দেখুন ইমাম মালেক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন-

وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَحُطَّتْ رَكْعَتَانِ لِلْخُطْبَةِ.

-"অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামদের শিষ্য হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (ﷺ) বর্ণনা করেন যে, জু'মাআর নামায চার রাক'আত ফরজ হত কিন্তু খোত্ববাকে দুই রাক'আতের স্থালাভিষিক্ত করা হইয়াছে।"[১৯১] এ রকম আরেকজন তাবেয়ীর হাদিস রয়েছে দেখুন-

عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا

-"বিখ্যাত তাবেয়ী শিহাব জুহুরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমাদের কাছে এ হাদিস পৌছেছে যে, খুতবাহ ছাড়া জুমু'আ নেই, যদি খুতবাহ না হয় তাহলে জোহরের চার রাক'আত পড়তে হবে।"[১৯২] আরেকজন তাবেয়ীর বক্তব্য রয়েছে-

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ: أَنَّ إِمَامًا صَلَّى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَخْطُبْ فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى أَرْبَعًا.

-"তাবেয়ী জুবাইর ইবনে আদি (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই একজন ইমাম খুতবাহ ছাড়া জুমু'আর দুই রাক'আত আদায় করলেন; **অতঃপর তাবেয়ী ইমাম যাহ্হাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) চার রাক'আত (জোহর) পড়লেন।**"[১৯৩] বুঝতে পারলাম যে জুমু'আর

১৯০ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ১/৪৬০পৃ. হাদিস নং ৫৩২৪
১৯১ .ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি.
১৯২ .ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি.
১৯৩ .ইমাম মালেক, আল-মুদুনাত, ১/২৩৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ, ১৪১৫হি.

নামাযের খুতবাহ জোহরের দুই রাক'আতের স্থালাভিষিক্ত। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে পাক দেখুন যা ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتِ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ

-"হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (ﷺ) বলেন, জু'মাআর নামায চার রাক'আত ছিল। খুতবাকে দুই রাক'আতের স্থালাভিষিক্ত করা হয়েছে।"[১৯৪] তাই খুতবাহ কে হেয় করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সেজন্য বিখ্যাত তাবেয়ী যাহ্হাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) খুতবা দেই নি বলে জোহর পড়েছেন। ইমাম বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا-

-"ইমাম আবি মা'শার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, ইমাম যদি জুমা'আর খুতবাহ না দেয় (খুতবাহ ছাড়া নামায পড়ায়) তাহলে চার রাক'আত (আখিরী জোহর) পড়তে হবে।"[১৯৫]

জুমু'আর খুতবাহ এটি নসিহত নয়; বরং এটি আল্লাহর জিকির। যেমন আল্লাহর নবির একটি হাদিসের প্রতি একটু লক্ষ করুন হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

-"ইমাম যখন খুতবাহ দানের জন্য বাহির হন বা দাঁড়ান তখন ফিরেশতা আগে পরে আগমনকারীদের ফিরিস্তি তৈরী মুলতবী রেখে জিকির তথা খুতবাহ শুনার কাজে মনোনিবেশ করেন।"[১৯৬] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন যে, রাসূল (ﷺ) এখানে খুতবাহকে জিকির হিসেবে উল্লেখ করেছেন; ওয়াজ বা নসিহত হিসেবে উল্লেখ করেন নি। ইমাম নববী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন- ويشترط كونها بالعربية. -"জুমু'আর খুতবাহ আরবীতে

১৯৪ .ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/২৭৮পৃ. হাদিস নং ৫৭০৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৯৫ .ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/২৭৮পৃ. হাদিস নং ৫৭০৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
১৯৬ .ইমাম বুখারী, আস্-সহিহ, ২/৩পৃ. হাদিস নং ৮৮১, ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ, ১/৬২পৃ. আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৬/২০পৃ. হাদিস নং ৯৯২৬, সহিহ মুসলিম, ২/৫৮২পৃ. হাদিস নং.৮৫০, সুনানে আবু দাউদ, ১/৯৬পৃ. হাদিস নং ৩৫১, সুনানে তিরমিযি, ১/৬২৯পৃ. হাদিস নং.৪৯৯, নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/২৭৩পৃ. হাদিস নং ১৭০৮, ও ১০/৪১৯পৃ. হাদিস নং ১১৯০৮, নাসাঈ, আস্-সুনান, ৩/৯৯পৃ. হাদিস নং ১৩৮৮

হওয়া শর্ত।"[১৯৭] উপমহাদেশের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) তার রচিত মুয়াত্তায়ে মালেকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মুসাফফায় উল্লেখ করেন-

لما لاحظنا خطبة النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاء رضى الله عنهم وسلم جرا نجد فيها وجد اشياء منها الحمد والشهادتانوالصلاة على النبى عليه السلام والامر بالتقوى وتلاوة اية والدعاء للمسلمين والمسلمات وكون الخطبة عربية.

-"রাসূল (ﷺ), খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং পরবর্তী যুগের ফুকাহায়েকেরাম ও ওলামায়ে দ্বীনের খুতবাহ সূমহ লক্ষ করলে করলে দেখা যায় যে, তাঁদের খুতবায় নিম্নের বিষয়গুলো ছিল। যথা.'আল্লাহর তা'য়ালার হামদ, শাহাদাতাইন (অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ প্রদান করা) রাসূল (ﷺ) এর প্রতি দুরুদ, তাকওয়ার আদেশ, পবিত্র কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত, মুসলমানদের জন্য দোয়া। তাঁরা সকলেই আরবী ভাষায় খুতবাহ দিতেন। গোটা মুসলিম বিশ্বের বহু অঞ্চলের ভাষা আরবী নয়, তবও সর্বত্র আরবী ভাষায়ই খুতবা দেওয়া হতো।" দেহলভী, মুসাফফা, ১/১৫৪পৃ.)

আরবী ছাড়াও আরো অনেক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এমন অনেক সাহাবি আরবের বাহিরে মুসলিম এলাকায় অথবা ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন কিন্তু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তারা আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবাহ দিতেন। যা আজ পর্যন্ত কোনো আহলে হাদিস প্রমাণ দিতে পারবেন না।

৪৪. সফরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তিন ওয়াক্ত পড়া নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"**সফরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তিন ওয়াক্ত হিসেবে জোহর ও আসর একত্রে এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া যাবে**।"[১৯৮]

পর্যালোচনা ঃ ডা. জাকির নায়েক কুরআন ও সহিহ হাদিসের অনুসারী হওয়ার দাবি করেন অথচ এ মাস'আলাটি তিনি কিভাবে জাহেলের মত কুরআন ও সহিহ হাদিস বিরোধী ফাতওয়া দিতে পারলেন!

হানাফি মাযহাব মোতাবেক সফরকালে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করতে হলে, উভয়ই নামাযই যেন স্বীয় ওয়াক্তের মধ্যে আদায় হয় সে দিকে লক্ষ করতে হয়। যেমন মাগরীব ও ইশা এ দুই নামায একত্রে আদায় করতে হলে, মাগরীব তার শেষ ওয়াক্তে আদায় করে তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অর্থাৎ অপক্ষো এ কারণেই

১৯৭ .ইমাম নববী, আল-আযকার, ১/১১২পৃ.
১৯৮ . ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৩পৃ.

করতে হবে যেন ইশার ওয়াক্ত প্রবেশ করে, ফলে একটু অপেক্ষা করেই ইশার নামায আদায় করতে হয়। এতে মাগরীব তার শেষ ওয়াক্তে আর ইশা তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় হবে অর্থাৎ উভয় নামাযই ওয়াক্ত মতই আদায় হবে। কেননা, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

-"ওয়াক্ত মত নামায আদায় করা প্রত্যেক মু'মিনদের উপর ফরজ।" (সুরা নিসা, আয়াত, ১০৩) অন্যত্র মহান রব তা'য়ালা বলেন-

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى

-"তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও, আর যত্নবান হও মধ্যবর্তী নামাযের প্রতিও।" (সুরা বাক্বারা, আয়াত, নং. ২৩৮) ডা. জাকির নায়েক, সালাফি, আহলে হাদিস, লা-মাযহাবিদের খণ্ডনে আপনাদের সামনে একটি হাদিসে পাক উল্লেখ করছি-

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء» قال سالم: «وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب، فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم،

-"হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবি করীম (ﷺ) কে দেখেছি যখন সফর তাকে দ্রুত অতিক্রম করতে হত, তখন মাগরীবের নামায এত বিলম্ব করতেন যে, মাগরীব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (রা.) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) দ্রুত সফরকালে এরূপ করতেন। তখন ইকামতের পর মাগরীব তিন রাক'আত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। **তারপর অল্প সময় অপেক্ষা করে ইশার** ইকামত দিয়ে তা দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন।"[১৯৯]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ হাদিসটি ভাল করে লক্ষ করুন, মাগরীবের নামায শেষ ওয়াক্তে আদায় করে একটু সময় অপেক্ষা করতেন ও তারপরে ইশার নামায আদায় করতেন। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর হাবিব (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম উভয়ই নামাযই নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করতেন। দুই নামায এক ওয়াক্তে নয়। যদি দুই নামায এক ওয়াক্তে আদায় করতেন মাঝখানে বিলম্ব করার প্রয়োজন ছিল

১৯৯ . সহিহ বুখারী, ২/৪৬পৃ. হাদিস নং. ১১০৯

না। এ বিষয়ে তার আমলের আরেকটি হাদিসে পাক রয়েছে যেটি তার গোলাম তাবেয়ী না'ফে (রহ.) বর্ণনা করেছেন। যেমন-

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَقُلْنَا لَهُ: الصَّلَاةَ فَسَكَتَ «وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ». ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ–

-"হযরত না'ফে (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত ইবনে উমর (রা.) এর সাথে মক্কা হতে আসছিলাম, যখন ঐ রাত হল (তার স্ত্রী মুমূর্ষের সংবাদ পাওয়ার রাত) আমাদের নিয়ে দ্রুত চললেন। যখন সন্ধ্যা হল, আমরা ধারণা করলাম, তিনি নামাযের কথা ভুলে গেছেন, এ জন্য আমরা তাকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি চুপ রইলেন এবং আরও অগ্রসর হইলেন। তারপর সফক্ব অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলে তিনি অবতরণ করলেন ও মাগরীবের নামায আদায় করলেন। আবার সফক্ব অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি তখন ইশার নামায আদায় করলেন। তারপর আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন-রাসূল (ﷺ) এর সঙ্গে যখন কোন ত্বরা থাকতো তখন আমরা এরূপ করতাম।"[২০০] এই দুটি হাদিস একত্রে করে অনুধাবন করুন, আল্লাহর নবি (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম দুই নামায একত্রিত করেছেন বটে, কিন্তু উভয় নামায এক ওয়াক্তে আদায় করতেন না, বরং সফক্ব অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে মাগরীব এবং সফক্ব অদৃশ্য হওয়ার পরে ইশার নামায আদায় করতেন। সুতরাং দুই নামায একত্রিত করলেও নিজ নিজ ওয়াক্তেই ইহা আদায় করতেন। আর হানাফিরা এরূপই বলে থাকেন।

৪৫. কুরআনের দিকে পিঠ করে বসা নিয়ে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"কুরআনের দিকে পিঠ করে বসতে অসুবিধা নেই।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৬৩২পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ কোনো কারণ বা উজর ব্যতীত এরূপ করা নিঃসন্দেহে বেয়াদবির একটি লক্ষণ। সবকিছুর আদব থাকে; তেমনিভাবে কুরআন শরিফ রাখার ও তেলাওয়াতের আদবও রয়েছে। কুরআন আল্লাহ পাকের নিদর্শন আর জাকির নায়েক নিদর্শন কে সম্মান করা থেকে মানুষকে অবহেলিত করছেন এবং মানুষকে বেয়াদবি

২০০. সুনানে নাসাঈ, ১/২৮৮পৃ. হাদিস নং. ৫৯৬, এ হাদিসটিকে জাকির নায়েকের ইমাম আলবানীও নাসাঈর তাহক্বীকে সহিহ বলে মেনে নিয়েছেন।

শিখাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ তাঁর নিদর্শনকে সম্মান করার জন্য মানুষ নির্দেশ দিয়েছেন। (সুরা হাজ্ব)

৪৬. কুরআন খতম নিয়ে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"কুরআন খতম পড়ার কোন নিয়ম নেই।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ২/৬৫০পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এ বক্তব্যে জাকির নায়েক যে সম্পূর্ণ জাহেল বা মূর্খ তা প্রমাণিত হয়েছে। কুরআন খতম করে সকলে মিলে দোয়া করলে সে মুনাজাতে আল্লাহর রহমতের ফিরেশতারা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেন। ইমাম সাঈদ বিন মানসুর (রহ.) {ওফাত.২২৭হি.) হাদিস বর্ণনা করেন-

عن انس انه كان اذا ختم القران جمع اهله فدعا-

-"তাবেয়ী সাবেত বেনানী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস বিন মালেক (য) যখন কুরআন খতম দিতেন তার পরিবার বর্গকে নিয়ে তিনি একসাথে দোয়া করতেন।"[২০১] অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম দারেমী (রহ.) ও ইমাম তাবরানী (রহ.) যেমন-

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ:كَانَ أَنَسٌ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ، جَمَعَ وَلَدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُمْ–

-"হযরত সাবেত বেনানী (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) যখন কুরআন খতম করতেন তখন তিনি তার সন্তান ও পরিবারবর্গকে নিয়ে তিনি একসাথে দোয়া করতেন।"[২০২]

বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) তার তাফসীরে উল্লেখ করেন-

وعن حميد بن الأعرج قال من قرأ القرآن وختمه ثم دعا أمن على دعائه اربعة آلاف ملك ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه الى المساء او الى الصباح

-"হযরত আরাজ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কুরআন খতম করেন, তাঁর মুনাজাতে চার হাজার ফিরেশতা আমীন বলেন এবং সন্ধ্যা বা সকাল পর্যন্ত তার জন্য দু'আ ও মাগফিরাত কামনা করতে থাকেন।"[২০৩] ইমাম নববী (রহ.) তার 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম সমরকন্দী (রহ.) {ওফাত. ৩৭৩ হিজরী} আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন-

২০১. সাঈদ বিন মানসুর, ফাযায়েলুল কুরআন, ১/১৪০পৃ. হাদিস নং. ২৭, দারুল উছাইমী, রিয়াদ, সৌদি

২০২. দারেমী, আস্-সুনান, ৪/২১৮০পৃ. হাদিস নং.৩৫১৭, সনদটি সহিহ, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১/২৪২পৃ. হাদিস নং. ৬৭৪, যওজী, সিফাতুস সাফা, ১/৭১৩পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন।

২০৩. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসিরে রুহুল বায়ান, ৩/৬৬পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

وَعَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ نَهَارًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ خَتَمَهُ لَيْلًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْتِمُوا نَهَارًا

-"হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিনে কুরআন খতম দেয় ফেরেশতাগণ সারা দিন তার জন্য দোয়া ইস্তিগফার করতে থাকেন সন্ধা পর্যন্ত আর রাত্রে যদি কুরআন তেলাওয়াত করে সকাল পর্যন্ত তার জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করতে থাকেন। ইমাম সমরকন্দী বলেন আমারা দিনের বেলায় কুরআন খতমকে মুস্তাহাব হিসেবে জানি।"[২০৪] ইমাম যওজী (রহ.) তার التبصرة গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় (যা দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুতের লেবানন হতে প্রকাশিত) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সম্পর্কে উল্লেখ করেন-

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَخْتِمُ فِي رَمَضَانَ سِتِّينَ خَتْمَةً.

-"ইমাম শাফেয়ী রমযানে ৬০টি খতম দিতেন।" ইমাম যওজী (রহ.) তাঁর উক্ত কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৭ পৃষ্ঠায় দুটি বর্ণনা করেন এভাবে-

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ: مُسْتَجَابَةٌ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ نَهَارًا غُفِرَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ خَتَمَهُ لَيْلًا غُفِرَ لَهُ تلك الليلة.

-"হযরত ইবনে মাসউদ (ﷺ) বলেন, কোন ব্যক্তি কুরআন খতম করে দোয়া করলে তা কবুলযোগ্য। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি <u>দিনে কুরআন খতম দিল</u> আল্লাহ তার সে দিনের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন, আর রাত্রে যদি কুরআন খতম করে তাহলে রাত্রের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।"

৪৭. দু'আর পর মুখে হস্তদ্বয় বুলানো বিদ'আত বলে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"<u>দু'আর পর মুখে হস্তদ্বয় বুলানো বিদ'আত</u>।"[২০৫]

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! অথচ অসংখ্য হাদিসে পাকে এ আমল প্রমাণিত আছে। তার মধ্য হতে কতিপয় হাদিসে পাক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

عن عبد الله بن عباسَ ..... فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ-

২০৪ . সমরুকন্দী, তাম্বিহুল গাফিলীন, ১/৪২৩পৃ. দারু ইবনে কাসির, বয়রুত, লেবানন।
২০৫. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং ৫/৫৩২পৃ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- অতঃপর যখন দোয়া শেষ হবে, হাত দুইখানা চেহারায় বুলিয়ে নেবে।"[২০৬]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ-

-"হযরত ওমর বিন খাত্তাব (ﷺ) থেকে বর্ণিত- আঁকা (ﷺ) সব সময় যখন দোয়াতে হাত উঠাতেন, তা নিজের চেহারা মোবারকে বুলিয়ে নেয়ার পূর্বে হাত নামিয়ে নিতেন না।"[২০৭] ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহ.) বলেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। ইমাম নববী বলেন হাদিসটি হাসান বা গ্রহণযোগ্য। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) উক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করেছেন। ইবনে হাযার আসকালানী হাদিসটির সনদ সুন্দর বলে গ্রহণ করেছেন।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ-

-"হযরত সায়িব বিন ইয়াযীদ (ﷺ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন- যখনই নবি করিম (ﷺ) দোয়া করতেন, তখনই (দোয়ার উদ্দেশ্যে) আপন দুই মোবারক হাত উত্তোলন করতেন এবং (দোয়া শেষে) হাত দুইখানি তার নূরানী চেহারা মোবারকে বুলাতেন।[২০৮] উক্ত হাদিসকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন, হাদিসটি "হাসান"। আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দীস ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদের সনদকে

২০৬. ক. ইমাম আবু দাউদ : কিতাবুস-সালাত : ২/৭৮ পৃ. হাদিস : ১৪৮৫, ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ১/৭১৯ পৃ. হাদিস : ১৯৬৮
২০৭ .ক. ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুদ-দাওয়াত : ৫/৪৬৩ পৃ. হাদিস নং- ৩৩৮৬, ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ২/২৪৭ পৃ. হাদিস : ৩২৩৪, ইমাম হাকেম : আল-মুস্তাদরাক : ১/৭১৯ পৃ. হাদিস : ১৯৬৭, ইমাম বায্যার : আল-মুসনাদ : ১/২৪৩ পৃ. হাদিস : ১২৯, ইমাম তাবরানী : আল মু'জামুল আওসাত : ৭/১২৪ পৃ. হাদিস : ৭০৫৩, ইমাম ইবনে হুমাইদ : আল-মুসনাদ : ১/৪৪ পৃ. হাদিস : ৩৯, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস-সগীর : ১/৪৯৬ পৃ. হাদিস : ৬৭০৫, ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৫/১৩৮ পৃ. হাদিস : ৬৭০৫, ইমাম নববী : কিতাবুল আযকার : পৃ. ৫৬৯, ইবনে হাজার আসকালানী : বুলূগুল মারাম : পৃ. ২৮৪, খতিব তিবরিযী : মেশকাত : কিতাবুদ দাওয়াত : হাদিস : ২২৪৫, আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/১৮৫পৃ. হাদিস : ২২৯৫
২০৮ .ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান : কিতাবুস সালাত : ২/৭৯ পৃ. হাদিস : ১৪৯২, ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ : ২/২২১ পৃ., ইমাম তাবরানী : আল মু'জামুল কাবীর : ২২/২৪১ পৃ. হাদিস : ৬৩১, ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ২/৪৫ পৃ., ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : আল-জামেউস-সগীর : ২/৪৯৭ পৃ. হাদিস নং : ৬৬৮৫, ইমাম মুকরিযী : মুখতার কিতাবুল বিতর : ১/১৫২ পৃ., আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : যঈফু জামে : হাদিস নং : ৪৪০৬

দুর্বল বলেন নি আহলে হাদিস আলবানী ব্যতীত। এছাড়া আরও হাদিস বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) দোয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন-

ثم إذا رد يديه فليفرغ ذلك الخير إلى وجهه-

-"অতঃপর যখন সে নিজের হাত নামিয়ে ফেলবার ইচ্ছা করবে, তখন এই মঙ্গলময়তা তার হাত চেহারায় বুলিয়ে দিবে।"[২০৯] উক্ত হাদিসটিকে ইমাম ইবনে হিব্বান সহিহ বলেছেন। ইমাম ক্বাদাঈ (রহ.) সহিহ সনদে, ইমাম মুনযিরী (রহ.) ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.)'র সহিহ সূত্রে সংকলন করেছেন এবং আল্লামা আযলূনী গ্রহণযোগ্য সনদ বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে উক্ত হাদিসটির অপর আরেকটি সূত্র রয়েছে তাহা হলো হযরত সালমান ফারসী (ﷺ) হতে আর তা সংকলন করেছেন।[২১০] এছাড়া আরও অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহুরী (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে মুরসাল রূপে হাদিস বর্ণনা করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ-

-"তাবেয়ী ইমাম যুহুরী (রহ.) বলেন- রাসূল (ﷺ) সবসময় দোয়ার সময় আপন উভয় হাত মোবারক পবিত্র বক্ষ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। দোয়া শেষে হাত দুইখানা নিজের নূরানী চেহারায় বুলিয়ে নিতেন।[২১১] উক্ত হাদিসের সনদটি মুরসাল সংক্ষিপ্ত সনদে খুবই শক্তিশালী। আল্লাহর কাছে এই সমস্ত জালেমদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানাই। উক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন।[২১২]

---

২০৯. ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ৩/১০৬ পৃ. হাদিস : ৮৭৬, ইমাম আবু ইয়ালা : আল-মুসনাদ : ৩/৩৯১ পৃ. হাদিস : ১৮৬৭, ইমাম মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ২/৮৭ পৃ. হাদিস : ৩২৬৬, ইমাম তাবরানী : মুজামুল কাবীর : ১২/৪২৩ পৃ.হাদিস : ১৩৫৫৭, ইমাম দায়লামী : আল ফিরদাউস : ১/২২১ পৃ. হাদিস : ৮৪৭, ইমাম ইবনে রাসাদ : আল জামে : ১০/৪৪৩ পৃ., ইমাম কাযাঈ : মুসনাদুস শিহাব : ২/৩১৫ পৃ. হাদিস : ১১১১, ইমাম মুনযির : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৩১৫ পৃ. হাদিস : ২৫২৭, ইমাম হায়সামী : মাযমাউদ-যাওয়াইদ : ১০/১৬৯ পৃ., ইমাম আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৭১ পৃ. হাদিস : ২২৯৫

২১০. ক. ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : ৬/৪৭৮ পৃ. হাদিস নং : ২৫১১, মুত্তাকী হিন্দী : কানযুল উম্মাল : ২/৮৮ পৃ. হাদিস : ৩২৬৮

২১১ .ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল-মুসান্নাফ : ২/২৪৭ পৃ. হাদিস : ৩২৩৪, হাদিসটির সনদ সহিহ।

২১২ .আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" এর ১ম খণ্ডের ৫৫৭-৫৬১ পৃষ্ঠা দেখুন।

৪৮. ডা. জাকির নায়েকের জিকির করা নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহু আল্লাহু জিকির করা এবং জামা'আতবদ্ধ জিকির করা বিদ'আত।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ৫/৫৩২পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ জামাতবদ্ধভাবে জিকির করা তো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছেই বরং এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্যও রয়েছে। বিখ্যাত ফকিহ ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) তার বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ করেন-

وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَوِيِّ عَنْ الْإِمَامِ الشَّعْرَانِيِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا

-"হামাভী (রহ.) তার হাশীয়ায় ইমাম শা'রানী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন জামাতবদ্ধভাবে মসজিদে অথবা অন্য কোথাও জিকির করা মুস্তাহাব।"[২১৩] বুঝা গেল জাকির নায়েক সমস্ত উলামায়ে কেরামের রায়কে উপেক্ষা করে মনগড়া উক্তি করেছেন। উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যকে অস্বীকার করা কুফুরীর শামিল। মুসলিম শরীফে باب الذكر بعد الصلاة শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে-

أن ابن عباس أخبره: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم-

-"ফরয সমূহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর উচ্চস্বরে যিক্‌র করা হুযুর (ﷺ)-এর যুগে প্রচলিত ছিল।"[২১৪]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ হাদিস শরীফ থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নবিজীর যুগেই জামাতবদ্ধভাবে রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সাহাবীরা উচ্চস্বরে জিকির করতেন। এটা কী তাহলে বিদআত? মূর্খ পণ্ডিত জাকির নায়েক ও তার অনুসারীদের কাছে আমার প্রশ্ন যে আপনারা কী বিদ'আতের সংজ্ঞাও জানেন না?

৪৯. মায়ের গর্ভে কী আছে তা সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ

কুরআনের সুরা লোকমান এর ৩৪ নং আয়াত وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ আয়াতের ব্যাখ্যায় মায়ের গর্ভে ছেলে নাকি মেয়ে আছে তার ইলম আল্লাহর কাছে বলা ভুল।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/২২৯পৃ.) শুধু তাই নয় তিনি

---

২১৩ . ইবনে আবেদীন শামী,-ফাতওয়ায়ে শামী, ১/৬৬০পৃ., দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২১৪ .মুসলিম, আস্-সহিহ, ১/৪১০পৃ. হাদিস নং.৫৮৩

আরও বলেন-**"অনেক তাফসীরকারকদের ভুল হয়েছে।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/২২৯পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ অনেক তাফসিরকারক বলেছেন যে এ আয়াতে রেহেমে বা মায়ের গর্ভের সন্তান নেককার না বদকার হবেন সত্তাগতভাবে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাবেয়ী ইমামুত তাফসীর হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন-

فَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى

-"আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না-গর্ভাশয়ে কী আছে; তা ছেলে না মেয়ে অথবা ফর্সা না কালো! (তাফসীরে ইবনে কাসির, ৬/৩১৮পৃ.) ইমাম যওজী (রহ.) {ওফাত. ৫৯৭হি.} এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

وَيَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحَامِ لا يعلم ... أبيض أو أسود

-"মায়ের গর্ভে বাচ্চা সুন্দর না কালো সেটি আল্লাহ ব্যতীত কেউ জা ন না।"[২১৫]

তবে এ জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নবিরা মু'জিযা রূপে এবং ওলীরা কারামাত দ্বারা জানতে পারে। ওলী আল্লাহরা নবিজীর মাধ্যমে জানতে পারে। ইমাম কুরতুবীর বক্তব্যটি হলো-

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: مَنِ ادَّعَى عِلْمَ شَيْءٍ مِنْهَا غَيْرَ مُسْتَنِدٍ إِلَيْهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – كَانَ كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ.

-"ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, সে মিথ্যুক বলে বিবেচিত যে বলবে হুযুর (ﷺ) কোন মাধ্যম ছাড়া পঞ্চ বিষয়ের ব্যাপারে জানেন।"[২১৬]

৫০. মুরতাদের বিষয়ে শাস্তির ব্যাপারে ডাকাতি ও সন্ত্রাসের শাস্তির আয়াত প্রসঙ্গ ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েকের কাছে মুরতাদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি চোরের আয়াত এর বিষয়ের বিধান বলে চালিয়ে দেন। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ৩/৭৬-৭৭পৃ.) এটি তার মনগড়া ব্যাখ্যা। তারপর ডা. জাকির নায়েক নিজেই বিশ্ব বিখ্যাত মুরতাদ তাসলিমা নাসরিন সম্পর্কে বলেন-"আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি তাসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে কী করবো, তাহলে আমি বলবো- **যেহেতু কুরআন আমাকে সুযোগ দিয়েছে তাই তাকে আমি এ ধরনের পাবলিক ডিবেটের জন্য আমন্ত্রণ জানাবো।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং.

২১৫. ইমাম যওজী, যাদুল মাইসীর, ৩/৪৩৬পৃ.
২১৬. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ১/৬৬পৃ. হাদিস ঃ ৩ দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২২হি.

৩/৭৭পৃ.) অথচ সহিহ অগনিত হাদিসে মুরতাদদের বিষয়ে বলা হয়েছে যারা দ্বীন পরিবর্তন করে তাদেরকে হত্যা করা। (সহিহ মুসলিম)

৫১. কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অপব্যাখ্যা ঃ

ডা. জাকির নায়েক কুরআনের অনেক ইহুদিদের মত অনেক আয়াতকে বিজ্ঞানের সাথে মিলানোর অপচেষ্টা করেছেন। তিনি সুরা ফোরকানের ৫৯ নং আয়াত وَمَا بَيْنَهُمَا এর অপব্যাখ্যা করে প্লাজমার প্রমাণে ব্যস্ত হয়েছেন। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/৮১-৮২পৃ.) তিনি সূর্য ও চাঁদের আলোর বৈজ্ঞানিক থিউরির ব্যাপারে বিভিন্ন আয়াতের অপব্যাখ্যা করেন। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/৭৮পৃ.) তাছাড়া আরো অনেক আয়াত ও হাদিসের মনগড়া অপব্যাখ্যা করেছেন ডা. জাকির নায়েক। যা কুরআন ও হাদিসের বর্ণনাকে বিকৃত করার শামিল।

৫১. সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করা প্রসঙ্গে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,-"সারা পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ উদযাপনের ব্যবস্থা করা উচিত। ঈদের নামায ১২ তাকবীরে পড়তে হবে-প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর।" (খুতবাতে জাকির নায়েক, ৪/৩৩৫পৃ./ www.youtube.com/watch?v=Tp-cFOQX9Os#at=57) অনুরূপ আপনারা তার আরেকটি লেকচারেও পাবেন। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৪৭২পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ ঈদের নামাযের তাকবীর বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি; তাই দ্বিতীয়বার করে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। প্রত্যেক দেশের অধিবাসী তার নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখতে হবে। আর এটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের আমল। এ ব্যাপারে আরেকটি সহিহ্ হাদিস উল্লেখ করছি যেহেতু ডা. জাকির নায়েক সহিহ হাদিসের দোহাই দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছেন। যেমন-

عن كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ: رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

-"হজরত কুরাইব (রহ.) হতে বর্ণিত যে, উম্মে ফজল (রা.) তাঁকে শাম দেশে মুয়াবিয়া (রা.) এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইব (রহ.) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌছে উম্

ফজলের কাজ সমাধান করলাম। সিরিয়া থাকতে থাকতেই রমদ্বানের চাঁদ দেখা গেল। জুময়ার রাতে আমরা চাঁদ দেখলাম। এরপর রমদ্বানের শেষে আমি মদিনায় ফিরলাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ আমাকে জিজ্ঞাসা করার পর চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, জুমআর রাতে। তিনি বললেন, তুমি নিজে জুমআর রাতে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি দেখেছি ও লোকেরা দেখেছে এবং তাঁরা রোজা রেখেছে হজরত মুয়াবিয়া ﵁ রোজা রেখেছেন। ইবনে আব্বাস ﵄ বললেন, কিন্তু আমরা মদিনায় চাঁদ দেখেছি শনিবার রাতে। কাজেই আমরা পুনরায় চাঁদ দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করব নতুবা ত্রিশ দিন পূর্ণ করব। আমি বললাম, আপনি কি মুয়াবিয়া ﵁ এর চাঁদ দেখা ও রোজা রাখাকে যথেষ্ট বিবেচনা করেন না? তিনি বললেন, না। **আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এরূপই আদেশ দিয়েছেন।**"[২১৭] ইহা মারফূ-সহিহ্ হাদিস। কিছু গণ্ড মূর্খ বলে বেড়ায় এই হাদিসটি মারফু নয়। দুনিয়ার সকল ফোকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ইহা মারফু হাদিস। কারণ উছুলে হাদিসের আইন মোতাবেক কোন সাহাবীর জবানে, هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এরূপ উক্তি থাকলে হাদিস মারফু বলে সাব্যস্ত হয়। এ হাদিসে পাকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী প্রমাণসহ সিরিয়ার এক দিন আগে চাঁদ দেখা গেলেও বিখ্যাত মুজতাহিদ ফকীহ সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (﵁) আমলে নেননি; তিনি তার কারণ বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (ﷺ) তাকে এরূপ করতে আদেশ করেননি।

যেমন ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি ﵀ ও আল্লামা ইমাম নববী ﵀বলেন:

قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، أَوْ نُهِينَا عَنْ كَذَا، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا،.. كُلُّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ.

২১৭ .সহিহ মুসলিম শরিফ, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃ: হাদিস নং ১০৮৭; সুনানে তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ১৪৮ পৃ:; সুনানে নাসাঈ, ১ম জি: ২৩০ পৃ:; আবু দাউদ, আস-সুনান ১ম জি: ৩১৯ পৃ: হাদিস নং ২৩৩২; দারেকুতনী, আস্-সুনান, ৩য় খন্ড, ১২৭ পৃ: হাদিস নং ২২১১; সহিহ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ১৯১৬; সুনানে কুবরা লিল বায়হাক্বী, ৪র্থ খন্ড, ৬৩০ পৃ: হাদিস নং ৮২০৫; সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ, ২য় খন্ড, ৬৮ পৃ: হাদিস নং ২৪৩২; ইমাম ত্বাহাবী, শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ৪৮০; ফাতহুল বারী শরহে বুখারী ৪র্থ খন্ড, ১৫৩ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৭৮৯; কুরতুবী, তাফছিরে কুরতবী শরীফ, ২য় জি: ২৬৩ পৃ:; আহাদিছে ইসমাইল ইবনে জাফর, হাদিস নং ৩১৯; ইবনে আছির, জামেউল উছুল, হাদিস নং ৪৩৮৯; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ২৯০২; নাইলুল আওতার, ৪র্থ জি: ৫৫৯ পৃ:)। **সকল ইমামের মতে ইহা সহিহ্ হাদিস।**

-"সাহাবীর বাণী এরূপ হলে, আমাদেরকে এরূপ আদেশ দেওয়া হয়েছে, অথবা আমাদেরকে এরূপ নিষেধ করা হয়েছে অথবা এরূপ সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত,.. প্রত্যেকটি রেওয়াতই 'মারফূ-ছহীহ্' হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। যেমনটি অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম বলেছেন।"[২১৮]

ইমাম কুরতুবী ﵀ (ওফাত ৬৭১ হিজরী) তিনি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন:

فَإِنْ قَرُبَ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، وَإِنْ بَعُدَ فَلِأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ حَيْثُ بَوَّبَ:" لِأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ.

-"যদি নিকটবর্তী অঞ্চল হয় তাহলে চাঁদ দেখার হুকুম এক, কিন্তু যদি দূরবর্তী অঞ্চল হয় তাহলে প্রত্যেক দেশে চাঁদ দেখা শর্ত রয়েছে, আর ইহা বর্ণনা করেছেন তাবেয়ী হযরত ইকরামা ﵁, তাবেয়ী হযরত কাসিম ﵁ ও তাবেয়ী হযরত সালিম ﵁ আরো বর্ণনা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ হতে, এরই সাথে ইমাম ইসহাক্ব ﵀ বলেন : এদিকে ইশারা করেই ইমাম বুখারী ﵀ বলেছেন :'প্রত্যেক দেশের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখবে'।"[২১৯] এ সম্পর্কে তথাকথিত আহলে হাদিসদের ইমাম কাজী শাওকানী (ওফাত.১২৫০ হিজরী) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِأَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ رُؤْيَةُ غَيْرِهِمْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَإِسْحَاقَ، وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَحْكِ سِوَاهُ،

-"নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য হল, প্রত্যেক শহরবাসী তাদের নতুন চাঁদ দেখার উপর আমল করবেন এবং অন্যের দেখার উপর আমল করা আবশ্যক নয়। ইবনে মুনযিরী ﵀ এরূপ বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত ইকরামা ﵀, হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ﵁, হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ﵁ ও ইসহাক ﵀ থেকে। যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযি ﵀ আহ্লে ইলিম এর বিষয়ে।"[২২০] এ বিষয়ে আল্লামা ইমাম বগভী ﵀ {ওফাত : ৪৫০ হিজরী} ও আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী বর্ণনা করেন:

فذهب كثير منهم إلى أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وإليه ذهب من التابعين، القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعكرمة، وبه قال إسحاق بن راهويه، واحتجوا بما روي عن كريب

২১৮ . ইমাম সুয়ূতী, তাদরিবুর রাবী, ১৫১ পৃ:; তাকরীব ওয়া তাইছির, ১ম খন্ড, ৩৩ পৃ:
২১৯ . ইমাম কুরতুবী, তাফছিরে কুরতুবী, ২য় জি: ২৬৩ পৃ:
২২০ . শাওকানী, নায়লুল আওতার, ৪/৫৫৯ পৃ.

-"অধিকাংশ ফকিহ্‌গণ ইহা গ্রহণ করেছেন যে, নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখতে হবে। এই মত গ্রহণ করেছেন তাবেঈ রাহিমাহুমুল্লাহগণ। যেমন তাবেয়ী হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ), তাবেয়ী হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাহিমাহুল্লাহ), হজরত ইকরামা (রাহিমাহুল্লাহ)। ইমাম ইসহাক্ব ইবনে রাহবিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁরা মুসলিম শরিফের হযরত কুরাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত রেওয়াতের উপর নির্ভর করেছেন।"[২২১]

ইমাম বাগভী (রাহিমাহুল্লাহ) ৪০০ হিজরীর দিকে অর্থাৎ, প্রায় ১ হাজার বছর পূর্বে এই ফতোয়া দিয়েছেন। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলেন 'রঈসুল মুফাস্‌সিরীন' ও প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর সম্মানিত আপন চাচাতো ভাই। হযরত কাশেম (রাহিমাহুল্লাহ) হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাতী। হযরত সালিম (রাহিমাহুল্লাহ) হলেন হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নাতি এবং ইকরামা (রাহিমাহুল্লাহ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর গোলাম ছিলেন। প্রত্যেক দেশে চাঁদ দেখে রোযা ঈদ পালন করতে হবে এ বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। হিজরী অষ্টম শতাব্দির মুজাদ্দিদ, আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম হাফিজ ইবনে আব্দুল বার্ আন্দালুসী (রাহিমাহুল্লাহ) ওফাত ৪৬৩ হিজরী ও আল্লামা ইবনে রুশদ (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন,

وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَةُ فِيمَا بَعُدَ مِنَ الْبِلَادِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدُلُسِ

-"এই ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, অবশ্যই দূরবর্তী কোনো দেশের জন্যে চাঁদ দেখার রায় গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমনঃ খোরাসান ও ইন্দালিস।"[২২২]

এ ব্যাপারে আল্লামা ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেন :

حكى ابو عمر الْإِجْمَاعَ وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى الرُّؤْيَةُ فِيمَا بَعُدَ مِنَ الْبِلَادِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدُلُسِ

-"হাফিজ আবু আমর (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন : এই ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে যে, অবশ্যই দূরবর্তী দুটি দেশের জন্য চাঁদ দেখার রায় গ্রহণযোগ্য হবে না যেমন খোরাসান ও আন্দালিস, প্রত্যেক দেশের জন্য চাঁদ দেখা জরুরী।"[২২৩] খোরাসানের

২২১ . বগভী, শরহ্ সুন্নাহ, ৪র্থ খন্ড, ১৪৫ পৃ: হাদিস ঃ ১৭২৪; মা'আরিফুস সুনান, ৫ম খন্ড, ৩৫১ পৃ:

২২২ . ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৩ পৃ:; মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত শরহে মেসকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪২৫ পৃ: ১৯৮৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; খলিল আহমদ সাহারানপুরী, বজলুল মাজহুদ ফি হল্লে আবী দাউদ, ১১তম জি: ৭৫ পৃ:; আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী, মাআরিফুস সুনান শরহে তিরমিজি, ৫ম খন্ড, ৩৪০ পৃ:; কাজী শাওকানী, নাইলুল আওতার, ৪র্থ জি; ২৩১ পৃ:; আজিমাবাদী, আওনুল মা'বুদ ওয়া হাশিয়াতু ইবনে কাইয়ূম, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২৬ পৃ:

২২৩ . ইমাম কুরতুবী, তাফছিরে কুরতবী শরীফ, ২য় জি: ২৬৪ পৃ:; মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৩০৭; জখিরাতুল উকাবী, ২০/২৮২পৃ.

চাঁদ দেখা ইন্দালিসের জন্যে প্রযোজ্য নয়, আর ইহার উপর উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং ইজমা শরীয়তের অকাট্য দলিল যা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। সুতরাং দূরবর্তী দেশে চাঁদ দেখা বাংলাদেশের জন্যে প্রযোজ্য হবে না। এ বিষয়ে মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদীর সংকলনে এবং আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত **"চাঁদের মাসয়ালার সমাধান"** বইটি দেখুন।

৫২. রাসূল (ﷺ) কি নিরক্ষর বা মূর্খ ছিলেন?

ডা. জাকির নায়েক তার এক লেকচারে বলেন-"**নবী করীম (ﷺ) নিরক্ষর ছিলেন এবং লেখা-পড়া জানতেন না। এ জন্য প্রত্যেকবার অহী নাযিলের পর সাহাবীদের সামনে তা পড়তেন যাতে তারা তা লিখে নিতে পারেন।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/২০১পৃ.) তিনি আরও একাধিক লেকচারের আরেক স্থানেও অনুরূপ বলেছেন। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/২১৬ ও ২১৭পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন- وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا -"আমি পৃথিবীতে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"[২২৪] যিনি নিজেই কিছু জানেন না তাহলে তিনি কিভাবে শিক্ষক হবেন? বুঝা গেল যে, তিনি পৃথিবীতে কারও কাছ থেকে শিখতে আসেননি বরং তিনি পৃথিবীবাসীকে শিখাতে এসেছেন। রাসূল (ﷺ) এর ইলম সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যেমন-

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: قَرَأْتُ إِحْدَى وَسَبْعِينَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّنْيَا إِلَى انْقِضَائِهَا مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ بَيْنِ رِمَالِ جَمِيعِ الدُّنْيَا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلًا، وَأَفْضَلُهُمْ رَأْيًا. -

-"হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আমি (আসমানী) ৭১ টি কিতাব পাঠ করেছি। সবগুলোতেই পাঠ করেছি আর বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সকল মানুষকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দান

২২৪ .খতিব তিবরিযী ঃ মিশকাতুল মাসাবিহ ঃ কিতাবুল ইলম ঃ ১/৮৫পৃ. হাদিস ঃ ২৫৭, দারেমী, আস্-সুনান, ১/৩৬৫পৃ. হাদিস, ৩৬১, সুয়ূতী, জামেউস, সগীর, হাদিস ঃ ৪২৪২, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক, আয্-যহুদ, ১/৪৮৮পৃ. হাদিস ঃ ১৩৮৮, আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ৪/১১পৃ. হাদিস ঃ ২৩৬৫, ইবনে ওয়াহ্হাব, আল-মুসনাদ, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ, ১/৬৭পৃ. হাদিস ঃ ১১, ইবনে মাজাহ, আস্-সুনান, ১/৮৩পৃ. হাদিস, ২২৯,হারিস, আল-মুসনাদ, ১/১৮৫পৃ. হাদিস, ৪০, বায্যার, ৬/৪২৮পৃ. হাদিস, ২৪৫৮, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/৫১পৃ. হাদিস, ১২৫, ও ১৪/৯৪পৃ. হাদিস, ১৪৭০৯, বায়হাকী, আল-মাদখাল, ১/৩০৬পৃ. হাদিস, ৪৬২, বাগাভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২৭৫পৃ. হাদিস, ১২৮,

করেছেন তা রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর জ্ঞানবুদ্ধির তুলনায় এমন, যেমন বিশ্বের সমস্ত বালুকণা হল **রাসূল (ﷺ) এর ইলম আর বালুকণা সমূহের মধ্যে একটি বালুকণা হল সবার ইলম**। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (ﷺ) সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও সর্বাধিক বিচার-বিবেচনাশীল।"[২২৫] উক্ত তাবেয়ী রাসূল (ﷺ) এর ইলমের কিছুটা মত প্রকাশ করেছেন মাত্র। কারণ রাসূল (ﷺ) এর ইলমের পরিমাপ করার ক্ষমতা এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। রাসূল (ﷺ) লিখতে জানতেন; কিন্তু লিখতেন না, অন্যকে জ্ঞাত করতেন যার আলোচনা সামনে আসছে। আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (ﷺ) কে কুরআন নিজে শিক্ষা দিয়েছেন। মিশকাতুল মাসাবীহ শরীফে বাবুল ওফাতুন্নাবী (ﷺ) অধ্যায়ে বুখারী, মুসলিম শরীফের বরাতে অনেক দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ আছে এভাবে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ . فَقَالَ عُمَرُ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَمِنْهُم يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالاخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُومُوا عَنِّي . قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ: فَكَانَ ابنُ عباسٍ يَقُول: إن الرزيئة كل الرزيئة مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَاب--

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর পাক (ﷺ) এর ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় তার গৃহে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) ও ছিলেন। এক সময় হুযুর (ﷺ) বললেন, **আস আমি তোমাদের জন্য একটি স্মরণ লিপিকা লিখে দিয়ে যাই**। যেন তোমরা এর পর কখনও পথভ্রষ্ট না হও। তখন হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, হুযুরে পাক (ﷺ) এর প্রবল রোগযন্ত্রণায় তাকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। আর তোমাদের নিকট কুরআনে পাক রয়েছে, সুতরাং আল্লাহর কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। ব্যাপারটি গৃহে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করল এবং তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, কাগজ কলম আন

২২৫ .ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/১১৯ পৃ: হাদিস ঃ ৩১৪, ইমাম আবু নুয়াঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৪/২৬ পৃ., আল্লামা ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্ক, ৩/২৪২ পৃ

যেন হুযুর পাক (ﷺ) তোমাদের জন্য কিছু লিখে যান। আবার কেউ কেউ সে কথা বললেন, যা হযরত ওমর (رضي الله عنه) বলেছিলেন---------- ।"[২২৬]

দেখুন উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো রাসূল (ﷺ) লিখতে জানতেন, এই জন্যই রাসূল (ﷺ) বললেন যে, তোমরা খাতা কলম নিয়ে আস আমি তোমাদের লিখে দিয়ে যাই। আর এটা বুখারী মুসলিম শরীফের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসে রাসূল (ﷺ) এ কথা বলেন নাই যে, তোমরা লিখ আমি বলি বরং রাসূল (ﷺ) বলেছেন তোমরা কাগজ কলম নিয়ে আস আমি লিখে দিয়ে যাই। এখন উক্ত সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসকে উপেক্ষা করে যারা মনগড়া কথা বলবে নিঃসন্দেহে তারা কি পথভ্রষ্ট নয়? বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (رحمه الله) তাফসীরে রুহুল বায়ানে সূরা আনকাবুতের ৪৮ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন-

كان عليه السلام يعلم الخطوط ويخبر عنها

-"হুযুর (ﷺ) লিখতে জানতেন এবং সে বিষয়ে অপরকেও জ্ঞাত করতেন।"[২২৭]

৫৩. হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের এর ঘটনার সাথে পবিত্র কুরআনের তুলনা ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন,-"শ্রীকৃষ্ণ যেটি করেছেন, তিনি অর্জুনকে বলেছেন যদি সত্যের জন্য আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, তবে তুমি যুদ্ধ কর এবং **পবিত্র কোরআনেও একথা এসেছে**।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৪০০পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কোনো মুসলিমের কী এটা বলতে পারেন। তার উচিত ছিল কোরআনের সাথে তাদের কথার মিল পাওয়া যায়; কিন্তু জাহিলের মত কিভাবে "কোরআনেও একথা এসেছে" এ কথার দুঃসাহস দেখালেন।

৫৪. মহিলাদের মুখ খোলার বিষয়ে ভুয়া ফাতওয়া ঃ

ডা. জাকির নায়েক "ইসলামে নারীর অধিকার" শীর্ষক লেকচারের প্রশ্নোত্তর পর্বে 'ভিমলা দালাল' নামক এক মহিলার প্রশ্নের উত্তরে নারীদের পর্দা প্রসঙ্গে বলেন- "মহিলাদের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি ছাড়া সমগ্র শরীরে ঢেকে রাখতে হবে।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৩৬৬পৃ.) ডা. জাকির নায়েক 'Why The West is Coming Back To Islam?' শীর্ষক লেকচারে ডা. জাকির নায়েক

২২৬. ক. ইমাম বুখারী : আস্ সহীহ : ৮/১৩পৃ. হাদিস ঃ ৪৪৩২, ইমাম মুসলিম : আস সহিহ : ৩/১২৫৭পৃ. হাদিস ঃ ১৬৩৭, ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৪/৪০৪পৃ. হাদিস ঃ ৫৯৬৬, আহমদ, আল-মুসনাদ, ১/১২২পৃ. হাদিস নং.
২২৭. ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৬/৪৮০ পৃ.

নারীদের পর্দা সম্পর্কে বলেন-"**মেয়েদের জন্য মুখ আর হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকতে হবে।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/২৯৮পৃ.) অধিকন্তু ডাক্তার জাকির নায়েক "ইসলাম কি মানবতার সমাধান?" বিষয়ক লেকচারে নারীদের হাত ও মুখ খোলার ব্যাপারটিকে জোরালো করে বলেন-"**মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরো শরীর ঢাকতে হবে। যে অংশ অনাবৃত থাকবে, সে অংশ হচ্ছে হচ্ছে মুখ ও হাত।**"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৩/১৩২পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এখানে ডা. সাহেব "যে অংশ অনাবৃত থাকবে" কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যেন চেহারা ও হাত খোলা রাখাটাই নারীর কর্তব্য। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ তার দ্বীনী মুরব্বী নাসিরুদ্দীন আলবানীও এমন কথা বরতে পারেননি। আলবানী নারীর চেহারা ও হাত খোলা রাখার বৈধতার কথা বলেও পরিশেষে নারীদের জন্য মুখ ও হাত ঢেকে রাখা সুন্নাত এবং নারীদের জন্য উম্মুল মু'মিনীন ও সাহাবীয়াগণের অনুসারে তা পালন করা উচিত বলে উল্লেখ করেছেন। (আলবানী, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, ২৩১পৃ.) আহলে হাদিসদের আরেক ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন-"সঠিকতর সিদ্ধান্ত এই যে, নারীদের জন্য পরপুরুষদের সামনে দুই হাত পা ও মুখমণ্ডল খোলা রাখার অবকাশ নেই।" (ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া, ২২/১১৪পৃ.) তেমনিভাবে আহলে হাদিসদের আরেক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন-"নারীরা নামায আদায়ের সময় দুই হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রাখতে পারে, কিন্তু এভাবে বাজারে ও লোকের সমাগমস্থলে যাওয়ার অবকাশ নেই।" (ইবনে কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, ২/৪৭পৃ.) হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মতকে সতর্ক করে ইরশাদ করেন,

فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه

-"চোখের যিনা হলো দৃষ্টিপাত করা। আর যবানের যিনা হলো কথা বলা। অন্তরে খারাপ কাজের আকাঙ্ক্ষা বা কামনা করে (যিনা করে)। আর গুপ্তাঙ্গ তার সত্যায়িত করে বা তা থেকে বিরত থাকে।"[২২৮] এ হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে গুপ্তাঙ্গের যিনার ন্যায় বেগানা নারীকে দেখা, তার সাথে কথা বলা বা তাকে নিয়ে চিন্তা করা ইত্যাদি দ্বারা সেই অঙ্গের যিনার গোনাহ হবে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হয় চোখে। তাই এ সব অঙ্গের হেফাজতের সাথে চোখকে নিম্নগামী করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। হাঠাৎ দৃষ্টি পড়লে করণীয় কী-এ সম্পর্কে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

২২৮ . সহিহ বুখারী, ৮/৫৪পৃ. হাদিস নং. ৬২৪৩, সুনানে আবু দাউদ, ২/২৪৬পৃ. হাদিস নং. ২১৫২

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ-

-"আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে হঠাৎ দৃষ্টির ব্যাপরে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বলেন-তোমার দৃষ্টিকে ফিরেয়ে নাও।"[২২৯] এ হাদিসটিকে স্বয়ং জাকির নায়েকের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীও আবু দাউদের তাহকীকে সনদ 'সহিহ' বলে মেনে নিয়েছেন। তেমনি হযরত ইবনে বুরায়দা (ﷺ) স্বীয় পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) আলী (ﷺ) কে বলেন-

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

-"হে আলী ! অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিকে যেন ইচ্ছাকৃত দৃষ্টি অনুসরণ না করে। কেননা, তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি (যা অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ হয়ে গেছে) ক্ষমার্হ, কিন্তু বিধেয় নয় তোমার জন্য পরবর্তী দৃষ্টি।"[২৩০] এ হাদিসটিকে স্বয়ং জাকির নায়েকের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানীও আবু দাউদের তাহকীকে সনদ 'হাসান' বলে মেনে নিয়েছেন।

বস্তুত ডা. জাকির নায়েক এ ক্ষেত্রে সজ্ঞানে উলামায়ে উম্মতের খিলাফ ভ্রান্ত মত অবলম্বন করেছেন। যা তিনি স্বীকার করেছেন "বিষয় ভিত্তিক আলোচনা" নামক লেকচারে। সেখানে তিনি মেয়েদের হাত ও মুখ খোলা রাখার কথা উল্লেখ করে বলেন-"এ ব্যাপারে কিন্তু আলেমগণ দ্বিমতও পোষণ করেন।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৩১১পৃ.) ডা. জাকির নায়েক বেগানা পুরুষদের সামনে নারীদের চেহারা ডাকতে হবে না বলে শুধু মৌখিকভাবে ক্ষান্ত থাকেন নি, বরং তিনি কার্যত ভাবেও তার সেমিনারে নারীদের মুখ খোলা অবস্থায় শত শত বেগানা পুরুষদের সামনে আসার ব্যবস্থা করেছেন। যা শরিয়তের হুকুমের স্পষ্ট লঙ্ঘন। অনুরূপভাবে যেখানে পবিত্র কুরআনে পুরুষদেরকে দৃষ্টিনিচু রেখে গাইরে মাহরাম নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাদিস শরিফে বেগানা নারীদের প্রতি দৃষ্টি দেয়াকে নিষেধ করে তাকে চোখের যিনা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, অথচ ডা. জাকির নায়েক কুরআন ও হাদিসের এ সকল নির্দেশকে অমান্য করে তার সেমিনারে উপস্থিত অন্য সকলের সাথে বেগানা ও বেপর্দা নারীদের প্রতিও তাকিয়ে লেকচার দেন এবং তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। আবার কখনো মুখ খোলা বালেগা মেয়েদেরকে স্টেজে এনে শত শত বেগানা দর্শকের সামনে তাদের মাধ্যমে

২২৯ . সুনানে আবু দাউদ, ২/২৪৬পৃ. হাদিস নং.২১৪৮, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং. ৫৪৮১
২৩০ . সুনানে আবু দাউদ, ২/২৪৬পৃ. হাদিস নং.২১৪৯, তিরিমিযি, আস্-সুনান, ৪/৩৯৮পৃ. হাদিস নং.২৭৭৭

বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে সকলকে কবিরাহ গুনাহে নিমজ্জিত করেন। অধিকন্তু এ সকল সেমিনার ও অনুষ্ঠানকে তার টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার করার সময় সে সকল মুখ খোলা বা পর্দাহীন নারীদেরকে বারবার ও বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে দেখিয়ে বিশ্বব্যাপী দর্শকগণকে যিনার গুনাহের ভাগী করেছেন। এভাবে তিনি নারীদের চেহারার পর্দার প্রত্যক্ষ খিলাফের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক গোমরাহীর জন্ম দিয়েছেন। এমনি করে ডা. জাকির নায়েক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বক্তব্য পেশ করে মুসলিম সমাজে ভয়াবহ ফিতনা সৃষ্টি করেছেন। তার এ সকল গোমরাহী থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা কর্তব্য।

৫৫. নবীজির যুগে মিথ্যা প্রচারণায় ইসলামের কী লাভ হয়েছিল?

ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"আমাদের নবী করীম (ﷺ) এর সময়ে অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ছিল। তাতে ইসলামের উপকারই হয়েছে। এটা সত্যি।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৪৫৪পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এটি ডা. জাকির নায়েকের ইসলাম সম্বন্ধে একটি মনগড়া ব্যাখ্যা। ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলতে পারতেন যে তারা ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু মহান রবের ক্ষমতায় কিছুই করতে পারেনি। তাহলে এখনও ইহুদি নাসারারা যদি পূর্বের মত ইসলামের ক্ষতি সাধন করে, তাতে কি আমাদের উপকার হবে? নাউযুবিল্লাহ!

মাযহাব সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ পর্যালোচনা ঃ

৫৬. চার মাযহাবের অনুসরণ প্রসঙ্গ :

প্রচলিত একটি ভুল ধারণা What is Taqleed _ Taqleed kia hai নামক এক সাক্ষাৎকারে ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হয়,

اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کی ساتھ رواں دواں ھیں آپ یہ فرمائے کہ اس مقلد انہ ذہنیت دین کو فایدہ پہنچایا ھے یانقصان-

অনুবাদ ঃ বর্তমান পুরো বিশ্বের অধিকাংশ লোক তাকলীদের তথা মাযহাব অনুসণের মনোভাব পোষণ করছে, এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? মাযহাব অনুসরণের এ মনোভাব কি মুসলিম উম্মাহের উপকার করেছে, নাকি তা তাদের ক্ষতির কারণ হয়েছে? ডা. জাকির নায়েক এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

نقصان پہنچایا ھے میر حساب سے زیادہ نقصان پہنچایا ھے-

অর্থাৎ "মাযহাব অনুসরণ তাদেরকে ক্ষতি করেছে। আমার মতে অনেক ক্ষতি করেছে।" (http://www.youtube.com/watch?v=leuNHQR7PO)

ডা. জাকির নায়েক আরো বলেছেন,

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki.

-"মুসলমানদের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন মুসলমানের জন্য এ চার মাযহাব অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, এগুলোর কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হবে।" (http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-schoolof-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

ডা. জাকির নায়েক এখানে চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণের বিষয়কে "প্রচলিত ভুল ধারণা" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ডা. জাকির নায়েকের এ কথার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ডা. জাকির নায়েক যাকে প্রচলিত ভুল ধারণা বলছেন, সে সম্পর্কে দীর্ঘ বার- তেরশ' বছর যাবৎ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাসসিরগণের অভিমত উল্লেখ করা হলো– "মানাকেবে আহমাদ" নামক কিতাবে আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) উল্লেখ করেছেন, "মাইমুনী (রহ.) বলেছেন, ইমাম আহমাদ আমাকে বলেছেন,

يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام.

"হে আবুল হাসান! যে মাসআলায় তোমার কোনো ইমাম নেই, সে মাসআলা থেকে তুমি বেঁচে থাকো।" [মানাকেবে আহমাদ, আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) ১/২৪৫পৃ. দারুল হিজর, মিশর] "আখবার আবি হানিফা" নামক কিতাবে আল্লামা সুমাইরী (রহ.) ইমাম যুফার (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুফার (রহ.) বলেছেন,

انی لست أناظر أحدا حتی یقول قد أخطأت ولکنی أناظره حتی یجن قیل کیف یجن؟قال یقول بما لم یقل به أحد-

"অর্থাৎ কেউ ভুল স্বীকার করলেও তার সাথে আমি ইলমী আলোচনা করতে থাকি, যতক্ষণ না সে পাগল হয়ে যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে পাগল হয়? তিনি উত্তর দিলেন, "এমন মতামত পেশ করে, যা কেউ কখনো বলেনি।" [আখবার আবি

হানিফা, আল্লামা সুমাইরী (রহ.), পৃষ্ঠা-১১০] আল্লামা যারকাশী (রহ.) "বাহরে মুহীত" নামক কিতাবে লিখেছেন,

وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَصْرَ خَلَا عَنْ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ، لَا عَنْ مُجْتَهِدٍ فِي مَذْهَبِ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ رَفَعَ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ فِي هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِغَيْرِهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الِاجْتِهَادُ إلَّا فِيهَا.

-"স্বীকৃত বিষয় হলো, বর্তমান যুগে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ (মুজতাহিদে মুতলাক) নেই। তবে সংশ্লিষ্ট মাযহাবে মুজতাহিদ রয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হক্ব এই চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এ চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয় এবং এই চার মাযহাবের ওপরই কেবল ইজতেহাদ করা যাবে।" [আল-বাহরুল মুহীত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৪০] ইমাম শিহাবুদ্দীন নাফরাবী আল-মালেকী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায় (দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন হতে প্রকাশিত) লিখেছেন-

وَقَدْ انْعَقَدَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ عَلَى وُجُوبِ مُتَابَعَةِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعِ: أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – وَعَدَمِ جَوَازِ الْخُرُوجِ عَنْ مَذَاهِبِهِمْ،

-"বর্তমান মুসলমানদের এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, চার মাযহাব অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) <u>এগুলোর কোনো একটি অনুসরণ করা জরুরি</u>। মুসলিম উম্মাহের মাঝে এ ব্যাপারেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ চার মাযহাব থেকে বের হয়ে অন্য কোনো মাযহাব অনুসরণ করা জায়েয নেই।" "মারাকিস সুউদ" নামক কিতাবের গ্রন্থকার লিখেছেন,

والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفو غيرها الجميع منعه

"বর্তমানে চার মাযহাবের ওপর ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য যেকোনো মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে সকলেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।" আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ (রহ.) লিখেছেন,

وَفِي الْإِفْصَاحِ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ

-"এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, চার মাযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হবে এবং চার মাযহাবের মাঝেই সত্য নিহিত রয়েছে।"[২৩১] আল্লামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব (রহ.) "আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর" নামক কিতাবে লিখেছেন,

(ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) وَهُوَ ابْنُ الصَّلَاحِ (مَنَعَ تَقْلِيدَ غَيْرِ) الْأَئِمَّةِ (الْأَرْبَعَةِ) أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ – رَحِمَهُمُ اللَّهُ

-"পরবর্তী উলামাগণ যেমন আল্লামা ইবনুস সালাহ উল্লেখ করেছেন যে, চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমাদ (রহ.) ব্যতীত অন্য কারো মাযহাব অনুসরণ করা বৈধ নয়।"[২৩২] বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর মুকাদ্দামায় লিখেছেন-

ووقف التّقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلّدون لمن سواهم. وسدّ النّاس باب الخلاف وطرقه لمّا كثر تشعّب الاصطلاحات في العلوم. ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولمّا خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرّحوا بالعجز والإعواز وردّوا النّاس إلى تقليد هؤلاء كلّ من اختصّ به من المقلّدين. وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التّلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم..... ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمّة الأربعة.

-"বর্তমানে সমস্ত শহরে শুধু এ চার মাযহাবেরই অনুসরণ করা হয় এবং এর অনুসারীগণ অন্যদেরকে এ চার মাযহাবের মাস'আলা-মাসাইল শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর মানুষ এ ব্যাপারে মতানৈক্যের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর কারণ হলো, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের শাখা-প্রশাখায় নিত্যনতুন পরিভাষা সৃষ্টি। আর যখন মানুষ "ইজতেহাদ"-এর স্তরে উন্নীত হওয়া থেকে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং ইজতেহাদের বিষয়ে অযোগ্য ও দ্বীনের ব্যাপারে আস্থাহীন লোকদের হস্তক্ষেপের ভয় করল, তখন তারা নিরুপায় হয়ে মানুষকে এ চার মাযহাবের কোনো একটিকে অনুসরণের নির্দেশ দিল এবং চার মাযহাবের ক্ষেত্রে রদবদল বা তালফীক করা থেকে মানুষকে সতর্ক করল। কেননা এটি দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশা করারই নামান্তর। সুতরাং এ যুগে কেবল এ চার মাযহাবের মাসআলা-মাসাইলই চর্চা করা হয়। এ যুগে কারো "মুজতাহিদ" হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হবে, সুতরাং এ ধরনের দাবিদারের অনুসরণও

---

২৩১. আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ (রহ.), আল-ফুরু, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৩

২৩২. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, আল্লামা ইবনে আমীর আলহাজ্ব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ.১৪০৩হি.

নিষিদ্ধ। বর্তমান সময়ের মুসলমানগণ এ চার মাযহাবের ওপরই একমত হয়েছেন।"[২৩৩] আল্লামা যারকাশী (রহ.) "বাহরুল মুহীত-এ লিখেছেন,

الدَّلِيلُ يَقْتَضِي الْتِزَامَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ

-"দলিলের দাবি হলো, চার মাযহাবের মধ্যে তাদের কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসারে চলা জরুরি।" [আল-বাহরুল মুহিত, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৭৪] আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেছেন,

إن أَرَادَ أَنه لَا يتَقَيَّد بِوَاحِد بِعَيْنِه دون الْبَاقِينَ فقد أحسن بل هُوَ الصَّوَاب من الْقَوْلَيْنِ وَإِن أَرَادَ أَنِّي لَا أتقيد بهَا كلهَا بل أخالفها فَهُوَ مخطىء فِي الْغَالِب قطعا إِذا لحق لَا يخرج عَن هَذِه الْأَرْبَعَة فِي عَامَّة الشَّرِيعَة

-"কেউ যদি মনে করে যে, আমি চার মাযহাবের কোনোটিকেই অনুসরণ করব না বরং তার বিরোধিতা করব, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে ভ্রান্তিতে নিপতিত রয়েছে। কেননা শরীয়তের অধিকাংশ মাস'আলার বিশুদ্ধ ও হক্ব বিষয় এ চার মাযহাবে রয়েছে।" (ফাতাওয়ায়ে মিসরিয়্যা লি ইবনে তাইমিয়া, ১/৬১পৃ.)

ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "সিয়ার আ'লামিন নুবালা"-এ লিখেছেন,

لاَ يَكَادُ يُوجَدُ الحَقُّ فِيمَا اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الاجْتِهَادِ الأَرْبَعَةُ عَلَى خِلاَفِه

-"চার ইমাম যে বিষয়ে একমত হয়েছেন সে বিষয়ের বিপরীতে কোনো সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[২৩৪] আল্লামা মুনাবী (রহ.) "ফায়যুল কাদীর" নামক কিতাবে লিখেছেন,

فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء والافتاء لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت

-"বিচার ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর সব কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।" [ফায়যুল কাদীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২১০] মাযহাবের ব্যাপারে সালাফীদের ইমাম আব্দুল ওহ্হাব নজদী -এর অভিমত ঃ

২৩৩. মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৩

২৩৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', আল্লামা যাহাবী (রহ.), খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৭, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. তৃতীয় প্রকাশ. ১৪০৫হি.

ونحن أيضا في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير، الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم، ولا نقرهم ظاهرا على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة. ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد لدينا يدعيها،

"শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে আমরা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাবের অনুসারী। আমরা চার মাযহাবের অনুসারী কারো প্রতি কোনো বিরূপ মনোভাব রাখি না। তবে চার মাযহাব ব্যতীত অন্য মাযহাবের ব্যতিক্রম। কেননা সে সমস্ত মাযহাব সুশৃঙ্খলভাবে সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। যেমন–রাফেযী, যায়দী, ইমামিয়া ইত্যাদি এবং আমরা তাদের ভ্রান্ত মাযহাবসমূহের স্বীকৃতিও প্রদান করি না। বরং আমরা তাদেরকে চার ইমামের কোনো একজনকে অনুসরণ করতে বাধ্য করি। আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইজতেহাদের যোগ্য নই এবং আমাদের কেউ এর যোগ্য হওয়ার দাবিও করে না।" [আদ্-দুরারুস সুন্নিয়াহ্ মিনাল আজয়িবাতিন নজদিয়্যা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৭] আলোচনা দীর্ঘ হওয়ায় আরো অনেক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে যুগশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত আলেমের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে, একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। **যুগশ্রেষ্ঠ এ সমস্ত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য যদি ভুল ধারণা হয়, তবে ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য যে কোন স্তরের,** তা সহজেই অনুমেয়। যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরগণের বক্তব্যের সাথে বর্তমান সময়ের ডা. জাকির নায়েক কিংবা অন্য কোনো গাইরে মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীসের বক্তব্য তুলনা করুন। ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি শায়খ নাসীরুদ্দিন আলবানীর তুলনায় কিছুই নন। আর আমরা বলব, এখানে যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফতি, ঐতিহাসিকগণের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের একজনের তুলনায় নাসীরুদ্দিন আলবানীও কিছুই নন। যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ মুহাদ্দিসগণ যাকে ওয়াজিব বলছেন, ডা. জাকির নায়েক তাকে বলছেন, ভুল ধারণা। উলামায়ে কেরাম যাকে সফলতার কারণ বলছেন, ডা. জাকির নায়েক তাকে বলছেন, এটি মুসলিম উম্মাহের ক্ষতির কারণ। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহের। কাদের কথা গ্রহণ করা উচিত আর কাদের পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা তাবেয়ী মুহাম্মাদ বিন সিরীন (রহ.)-এর সেই কালজয়ী উক্তি–

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

-"নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং লক্ষ রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।"[২৩৫]

৫৭. এক মুখে দুরকম কথা; লক্ষনে তো মুনাফিক ছাড়া কিছুই বুঝা যায় না !

ডা. জাকির নায়েকের ইতিপূর্বের বক্তব্যে আমরা বুঝলাম যে মাযহাব মুসলমানদেরকে ক্ষতি করেছে। অথচ আরেক স্থানে এক লেকচারে বলেন-"**সর্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে কেউ ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কারো অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু 'তুমি কে?' এ প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হবে যে, আমি একজন মুসলিম।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং. ১/৬১পৃ.) তিনি তার আরেক লেকচারে বলেন- "**যদি কোনো ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র) অথবা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর আক্বিদা অথবা দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের গবেষণার সাথে একমত হন, তবে তার ওপর কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং ১/১৯৭পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্যে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়- ক. সর্বসাধারণ চার মাযহাব অনুসরণ করতে পারেন।

খ. আলেমদের জন্য নয়। গ. কোনো মুসলিম হানাফী, শাফেয়ী বলে পরিচয় দিতে পারবে না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা সবসময়ই বলে থাকি যে, বর্তমানের অধিকাংশ আলেমই মুজতাহিদের গুণাবলীর ধারে কাছেও নেই তাই যে কোন চার মাযহাবের মুজতাহিদের রায়ের উপর নিজের জীবন পরিচালিত করতে পারবেন। আর আমার একটি প্রশ্ন যে, কোন মুসলিম নিজেকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার দাবী করে হানাফী বললে কী অমুসলিম বুঝা যায়? তা না হলে জাকির নায়েক কেন এ কথাটি বললেন?

৫৮. চার মাযহাব কি কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত?

ডা. জাকির নায়েক ইসলামে যেকোনো ধরনের মতপার্থক্যকে হারাম বলেছেন এবং এই হারাম ফেরকাবাজির মধ্যে তিনি চার মাযহাবকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং উভয় আয়াতের ক্ষেত্রে মনগড়া তাফসীর করেছেন। যেটি হারাম নয়, সেটিকে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২৩৫ . মুসলিম শরীফ, ১/১৪পৃ. আল্লামা নববী, শরহে মুসলিম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৪

অথচ পৃথিবীর কোনো মুফাসসির উক্ত আয়াত দুটির ব্যাখ্যায় শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের মতানৈক্যকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। বরং তাঁরা ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্যের বিপরীত অর্থই প্রদান করেছেন; অথচ ডা. জাকির নায়েক একেবারে মনগড়া ব্যাখ্যা করে চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একটি হালাল ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে হারাম বলা বড় বড় কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াত এবং সূরা আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন।

ডা. জাকির নায়েক তাঁর Sectarian Madhabs_Groups শিরোনামের লেকচারে বলছেন,

"The answer is given in the Glorious Qur'an, in Surah Al Imran, Ch. No. 3, V. No. 103, it says ...(Arabic)... 'Hold to the rope of Allah strongly, and be not divided'. Which is the rope of Allah? The Glorious Qur'an, is the rope of Allah (swt). It says that the Muslims should hold to the rope of Allah... the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith, and they should not be divided. And the Qur'an says as I mentioned earlier, in Surah Anam, Ch. 6, V. 159, that... 'Anyone who divides the Religion into sects - you have nothing to do with him. Allah will tell him about their affairs, on the day of judgement'. That means, it is prohibited for anyone to make sects in the Religion of Islam. But when you ask, certain Muslims...'What are you?' Some say...'I am a Hanifi', some say...'I am Shafi', some say...'I am a Hambli', some say... 'I am a Mal iki' . Wha t was our beloved Prophet ? Was he Shafi?... was he Hambli ?... Was he Maliki ?... What was he?

-"আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।" আল্লাহর রজ্জু কী? পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহর রজ্জু। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআন ও সহিহ হাদিসকে আঁকড়ে ধরা উচিত এবং বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের ছয় নং

সূরা, আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন, -"হে নবী! যে ইসলাম ধর্মে কোনো ধরনের বিভক্তির বা দলাদলির চেষ্টা করে তার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"ইসলামে বিভক্তি বা দলাদলি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এটি হারাম। কিন্তু আমরা যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কে? কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজি কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, তিনি কি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন। তিনি কী ছিলেন?" আমরা এখানে উল্লিখিত আয়াত দুটির সঠিক উদ্দেশ্য ও তাফসীর নিয়ে আলোচনা করব–

সূরা আল-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলেছেন, "তোমরা সকলে 'আল্লাহর রজ্জু'কে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পর তাফাররুক তথা বিভক্তি সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। এ আয়াতে বিভক্তি বা ফেরকা সৃষ্টির যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এতে আসলে কোন ধরনের বিভক্তি উদ্দেশ্য? ডা. জাকির নায়েক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসলামে "মুসলমান" ব্যতীত যে নামই প্রদান করা হবে, তাকেই ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তিনি বলেছেন,

See, whatever label you give, there is bound to be Tafarraqa

-"মুসলমানদেরকে মুসলিম ব্যতীত অন্য যে নামই প্রদান করা হবে, তা কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত হবে।" (Dr. Zakir Naik talks about salafi_s _AHL E HADITH– YouTube http://www.youtube.co m/watch?v=Szzn9lFg9 n0

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ,)

ডা. জাকির নায়েক শুধু হানাফী, শাফেয়ী...এগুলোকেই ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত মনে করেননি বরং তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকেও ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন।

বিজ্ঞ পাঠক! এখানে আমাদের জন্য লক্ষণীয় বিষয় হলো–এ আয়াত দুটির ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ কী লিখেছেন এবং এ আয়াতগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা কী, ডা. জাকির নায়েক যেভাবে আয়াত দুটি দ্বারা চার মাযহাবকে হারাম ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এটি আসলে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি না। ডা. জাকির নায়েক যে ব্যাখ্যা

দিয়েছেন, এ ধরনের ব্যাখ্যা পৃথিবীর কোনো মুফাসসির যদি প্রদান করতেন এবং শাখাগত বিষয়ের মতানৈক্যকে হারাম বলতেন, তবে ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক কুরআনের নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য তথা মাযহাবসমূহকে হারাম বলেছেন। অথচ মুফাসসিরগণ সংশ্লিষ্ট আয়াত দুটির যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, ডা. জাকির নায়েক সম্পূর্ণ তার বিপরীত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কুরআনের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবীতে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَلَا تَفَرَّقُوا مُتَابِعِينَ لِلْهَوَى وَالْأَغْرَاضِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَكُونُوا فِي دِينِ اللَّهِ إِخْوَانًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَنْعًا لَهُمْ عَنِ التَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا". وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الِاخْتِلَافِ فِي الْفُرُوعِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اخْتِلَافًا إِذِ الِاخْتِلَافُ مَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الِائْتِلَافُ وَالْجَمْعُ، وَأَمَّا حُكْمُ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ فَإِنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهَا بِسَبَبِ اسْتِخْرَاجِ الْفَرَائِضِ وَدَقَائِقِ مَعَانِي الشَّرْعِ، وَمَا زَالَتِ الصَّحَابَةُ يَخْتَلِفُونَ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُتَآلِفُونَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ) وَإِنَّمَا مَنَعَ اللَّهُ اخْتِلَافًا هُوَ سَبَبُ الْفَسَادِ.

-"তোমরা বিভক্ত হয়ো না, এর সম্ভাব্য অর্থ হলো–তোমরা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। বরং তোমরা আল্লাহর দ্বীনের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকো। সুতরাং এ আয়াতে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা এবং বিভক্তি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের এ আয়াতে ফুরূ তথা শাখাগত মাস'আলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতবিরোধ রয়েছে, তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃত অর্থে কোনো অনৈক্য নয়। কেননা প্রকৃত অনৈক্য হলো সেটিই, যার কারণে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট থাকে না ও পারস্পরিক মিলন সম্ভব না হয়। কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য দেখা যায়, এটি মূলত শরীয়তের আবশ্যক বিধানসমূহ কুরআন ও হাদীস থেকে বের করার ক্ষেত্রে জটিলতা এবং শরীয়তের নির্দেশনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম নিত্যনতুন মাস'আলার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করেছেন; অথচ তাঁরা একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,"আমার উম্মতের মধ্যে

[মাসআলার ক্ষেত্রে] যে মতপার্থক্য তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ওই অনৈক্যকে নিষিদ্ধ করেছেন, যা বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের কারণ হবে।"[তাফসীরে কুরতুবী, ৪/পৃষ্ঠা, ১৫৯]

আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবী (رحمه الله)-এর তাফসীর

আল্লামা আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর "আহকামুহস সুগরা" নামক কিতাবে লিখেছেন,

(ولا تفرقوا): يعنى فى العقائد : و قيل : لا تحاسدوا.....وقيل : المراد التخطئة فى الفروع اى : لا يخطىء أحدكم صاحبه وليمض كل واحد على اجتهاده فإن الكل معتصم بحبل الله وعامل بدليل والتفرق المنهى عنه ما أدى إلى الفتنة والتشتيت وأما الاختلاف فى الفروع فهو من محاسن الشريعة لقوله عليه السلام (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد-

-"তোমরা বিভক্ত হয়ো না, অর্থাৎ আক্বীদার ক্ষেত্রে তোমরা বিভক্ত হয়ো না। অথবা তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা করো না। অথবা শাখাগত বিষয়ে একে অপরকে ভুল সাব্যস্ত করো না। অর্থাৎ শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে একজন অপরজনকে ভুল সাব্যস্ত করবে না বরং প্রত্যেকেই তার ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবে। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরেছে এবং প্রত্যেকেই দলিলের ওপর আমল করছে। আর এখানে যেই দলাদলির কথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটি হলো, সেই ফেরকাবাজি মুসলমানদের মাঝে ফেতনা এবং বিভক্তির কারণ হয়। কিন্তু শাখাগত বিষয়ের মতানৈক্য মূলত শরীয়তের সৌন্দর্য। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোনো ফয়সালাকারী যদি ইজতেহাদ করে এবং তার ইজতেহাদ ঠিক হয়, তবে সে দুটি সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি সে ইজতেহাদ করে এবং তার ইজতেহাদ ভুল হয় তবে সে এক সওয়াবের অধিকারী হবে।" [আহকামুস সুগরা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী (رحمه الله) তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন,

১. তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে মতানৈক্য করো না। কেননা ধর্ম একটিই সঠিক ও সত্য। এ ছাড়া যত ধর্ম আছে, সবগুলো ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট। সুতরাং যখন একটি ধর্মই সঠিক, অতএব তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অনৈক্য করো না।

২. দ্বিতীয়ত, এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পারস্পরিক শত্রুতা, বিবাদ এবং হানাহানি থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা জাহেলী যুগে সদা বিবাদ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকত।

৩. তাদেরকে এমন বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, যা তাদের মধ্যকার হৃদ্যতা ও ভালোবাসাকে বিনষ্ট করে এবং তাদের অনৈক্যের কারণ হয়।

এ সমস্ত তাফসীর থেকে স্পষ্ট যে, চার মাযহাবের ওপর মুসলিম উম্মাহের আমল মূলত কোনো বিভক্তি নয়। কেননা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ বার শত বৎসর যাবৎ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এর ওপর আমল করে আসছে। সুতরাং দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ সমগ্র মুসলিম উম্মাহের এ ঐকমত্যকে বিনষ্ট করার জন্য যারা নতুন মতবাদ সৃষ্টি করে, মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে, তারাই মূলত মুসলিম উম্মাহের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে, তারাই মূলত আল্লাহ তা'আলার এ বিধানকে লঙ্ঘন করছে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতে মুসলমানদের বৃহত্তর জামাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।

শাখাগত মাস'আলা-মাসায়েলের মাঝে মতপার্থক্য, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও ছিল। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে যদি মতপার্থক্য হতো, তার সমাধান দিতেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) নিজে। আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবর্তমানে অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। অতঃপর সাহাবীদের কাছ থেকে তাবেঈগণ ইলম শিখেছেন। তাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছেন তাবে তাবেঈন। সুতরাং অধিকাংশ শাখাগত মাসআলার মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, এর মূল উৎস হলো, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যকার মতপার্থক্য। অতএব, ডা. জাকির নায়েক এ মতপার্থক্যকে কিভাবে ইসলামের অনৈক্যের কারণ মনে করেন এবং তিনি কিভাবে একে হারাম সাব্যস্ত করেন?

চার ইমাম সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক নিজেই তাঁর "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ শিরোনামের লেকচারে বলেছেন,

All these four great Aimmas, came to give us knowledge, the teaching of Allah and His Rasul. Their Madhab was no Madhab but the Madhab of the Rasul.

-"বিখ্যাত এ চার ইমামের প্রত্যেকেই আমাদেরকে জ্ঞান দানের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শিক্ষাই দিয়েছেন। তাদের একমাত্র মাযহাব ছিল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাযহাব।"

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-publiclectures-by-dr-zakir-naik/)

সুতরাং এ চার ইমামের মাযহাব যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মাযহাবই হয়ে থাকে, তবে যারা তাঁদের অনুসরণ করছে তাদেরকে কেন সমালোচনা করা হবে?

সূরা আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াতের তাফসীর

ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কুরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে সূরা আল-আন্‌আামের ১৫৯ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন।

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের ছয় নম্বর পারার সূরা আল-আন্‌আমের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন, "হে নবী! যে ইসলাম ধর্মে কোনো ধরনের বিভক্তির বা দলাদলির চেষ্টা করে তার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।" ইসলামে বিভক্তি বা দলাদলি সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। এটি হারাম। কিন্তু আমরা যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি তুমি কে? কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজি কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, তিনি কি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন। তিনি কী ছিলেন?

মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ হলো– এ আয়াতটি মূলত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ। [এটি ইবনে আব্বাস (রা.), যাহ্হাক, কাতাদাহ প্রমুখ মুফাসসিরগণের অভিমত। তাফসীরে ইবনে কাসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭, তাফসীরে বাহরে মুহীত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৩, তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৯]

১. এ আয়াতে যে বিভক্তির কথা বলা হয়েছে, সেটি দ্বারা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মত উদ্দেশ্য হয়, তবে এখানে ওই সমস্ত লোকের মতানৈক্য উদ্দেশ্য হবে, যারা বিদআতী, প্রবৃত্তি পূজারি, স্বেচ্ছাচারী এবং পথভ্রষ্ট। [এটি আহওয়াছ (রা.) এবং উম্মে সালামা (রা.)-এর অভিমত, বাহরে মুহীত, আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রহ.) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭]

২. আয়াতটিকে যদি ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে নির্দিষ্ট না করে ব্যাপক রাখা হয়, তখন উদ্দেশ্য হবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অনৈক্য। যাকে এ আয়াতে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে। তাদেরকে যে শাস্তি প্রদান করা হবে বা তারা যে শাস্তির যোগ্য হবে, তার জন্য হে নবী আপনি দায়ী নন। সুতরাং এখানে অনৈক্য দ্বারা ওই বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে, যা হারাম ও নিষিদ্ধ। যেমন – তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত। শাখাগত বিষয় তথা দলিলের ভিত্তিতে যে মতপার্থক্য তা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৭)। তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৬)

৩. এ আয়াতে র একটি প্রচলিত তেলাওয়াত হলো, 'ফার-রাকু' কিন্তু আরেকটি প্রসিদ্ধ তেলাওয়াত হলো, ফা'রাকু। আর তখন এর অর্থ হবে, যারা দ্বীন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। [এটি হযরত আলী, হামযা এবং কাসায়ী (রহ.)-এর ক্বিরাত, তাফসীরে বায়যাবী, পৃষ্ঠা-৪৭০, তাফসীরে বাগাবী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৮, তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৫]

৪. আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, "তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই বা আপনি তাদের থেকে মুক্ত।" এ অংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন, যদি আয়াতের প্রথম অংশ, অর্থাৎ যারা দ্বীনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ইহুদী ও খিষ্টান তাহলে এ অংশের বিধান যুদ্ধের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যাবে। তাদের থেকে আপনি মুক্ত, পূর্বে যার অর্থ ছিল, তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সাথে যুদ্ধের হুকুম দেয়ায় এ হুকুম রহিত হয়ে যাবে। [তবারী, তাফসীরে তবারী, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৭২]

আর যদি প্রথম অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, ওই সমস্ত লোক, যারা বিদ'আতী, যারা প্রবৃত্তি পূজারি, তাহলে এ অংশের অর্থ হবে পরকালে তাদের শাস্তির ব্যাপারে আপনি দায়িত্বমুক্ত। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৮, তাফসীরে বাগাবী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২১০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতানৈক্য, তা হারাম নয়। আর ওই জিনিস কিভাবে হারাম হবে, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্তমানে হয়েছে এবং তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনদের মাঝে শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্য সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং কুরআনের এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা আর মানুষের সামনে হালালকে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করা কতটুকু বাস্তবসম্মত ও বৈধ? বরং এটি মুসলমানদের সাথে প্রতারণারই শামিল।

৫৯. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে বাহাত্তর দলের মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল

ডা. জাকির নায়েক তাঁর আলোচনায় শুধু চার মাযহাবকেই ভ্রান্ত দলের অন্তর্ভূক্ত মনে করেননি, বরং তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতকেও ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ডা. জাকির নায়েক বলেছেন,

"See whatever label you give there is bound to be Tafarraq. When the Shias came people said "Be a Sunni." Again there was group Ahle Sunnah Wal Jamat. Then, again there was division Hanafi, Hanbolii, Shafi, Maleki, ThenWe came with Salafi, Ahle Hadith.... there is group in this. The moment the name given by human beings – there is bound to be Tafarraqu.

দেখুন! আপনি মুসলমানদেরকে যে নামই প্রদান করবেন, তা হবে দলাদলি সৃষ্টি। যখন শিয়াদের আবির্ভাব হলো, তখন মুসলমানরা নিজেদেরকে সুন্নি বলেছে। অতঃপর একটা দল সৃষ্টি হয়েছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে। অতঃপর হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আবির্ভাব হয়েছে। এরপর এসেছে ছালাফী, আহলে হাদীস। সুতরাং মুসলমানরা যে নামই প্রদান করবে, তারা তাফার্‌রাকু অর্থাৎ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত হবে।

এভাবে ডা. জাকির নায়েক নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হক দলসমূহকেও ভ্রান্ত ফেরকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(Dr. Zakir Naik talks about salafi_s_AHLE HADITH- YouTube http://www.youtube.com/watch?v = Szzn9IFg9n0)

কিন্তু তিনি হয়তো এতটুকু খেয়াল করেননি যে, রাসূল (সা.)'এর হাদীসে তিহাত্তর দলের কথা বলা হয়েছে এবং তন্মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র দল হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। অথচ ডা. জাকির নায়েক হাদীসটির সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে বাতিল বলেছেন।

পৃথিবীর সকল হকপন্থী আলেম এ ব্যাপারে একমত যে তিহাত্তর দলের মাঝে মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র দল হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত, অর্থাৎ যারা রাসুল (ﷺ)-এর সুন্নাহ এবং সাহাবাদের জামাতকে অনুসরণ করে।

কুরআনের আলোকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১০৬ নং আয়াতে বলেছেন-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

-"সেদিন (কিয়ামতের দিন) কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এবার সে কুফুরির বিনিময়ে আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো।"

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)'র উক্তি বর্ণনা করেছেন-

وَتَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

-"কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে।"[২৩৬] বুঝা গেল সাহাবিদের যুগ থেকেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলোচনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এবং যে দলের সফলতার ইঙ্গিত বহন করে পবিত্র কোরআন। ইমাম ইবনে আবি হাতেম (রহ.) (ওফাত.৩২৭হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সনদসহ একটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ قَالَ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

-"হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন...কিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।"[২৩৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) (ওফাত.৯১১হি.) বলেন-

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو نصر فِي الْإِبَانَة واللالكائي فِي السّنة عَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة قَالَ {تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} قَالَ تبيض وُجُوه أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع والضلالة

-"ইমাম আবু হাতেম (রহ.) তার তাফসীরে, আবু নছর (রহ.) তার ইবানাত গ্রন্থে, খতিবে বাগদাদী (রহ.) তাঁর তারিখে বাগদাদে, লালকায়ী তাঁর সুন্নাহ বলেন গ্রন্থে কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং আহলে বিদআতি বা দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে।"[২৩৮] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) (ওফাত.৯১১হি.) আরও বর্ণনা করেন-

وَأخرج الْخَطِيب فِي رُوَاة مَالك والديلمي عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله تَعَالَى {يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} قَالَ: تبيض وُجُوه أهل السّنة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع

২৩৬.ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/৭৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি.

২৩৭. ইমাম আবি হাতেম, আত্-তাফসীর, ৩/৭২৯পৃ. হাদিস, ৩৯৫০, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে আদ্-দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২৩৮. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে আদ্-দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

-"ইমাম খতিবে বাগদাদি (রহ.) তাঁর তারিখে বাগদাদে, ইমাম মালেক, ইমাম দায়লামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হলো আহলে সুন্নাহ (জামাত)। আর আহলে বিদআতী বা দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে।"[২৩৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহ.) (ওফাত.৯১১হি.) আরও বর্ণনা করেন-

وَأخرج أَبُو نصر السجْزِي فِي الْإِبَانَة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ {يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} قَالَ: تبيض وُجُوه أهل الْجَمَاعَات وَالسّنة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع والأهواء

-" ইমাম আবু নছর আল-সায্যি (রহ.) তার আল-ইবানাত গ্রন্থে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন যাদের মুখ উজ্জল হবে তারাই হলো আহলে জামাত অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত, আর আহলে বিদআতী, দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং যাদের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজা থাকবে তাদের মুখ কালো হবে।"[২৪০]

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْخَطِيبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ قَالَ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَةِ.

-" কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ উজ্জ্বল হবে এবং বিদআতী ও দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে (যাদেরকে আহলুল বিদআত ওয়াল ফুরকা বলা হয়)।"[২৪১] ইমাম দায়লামী (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন-

{يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه} تبيض وُجُوه أهل السّنة وَتسود وُجُوه أهل الْبدع

-"এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন যাঁদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হলো আহলে সুন্নাহ (জামাত)। আর আহলে বিদআতি বা দ্বীন থেকে

২৩৯. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তাহের পাটনী, তাযকিরাতুল মাওদুআত, ১/৮৪পৃ.

২৪০. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে দুররুল মানসূর, ২/২৯১পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম আবি হাতেম, আত্-তাফসীর, ৩/৭২৯পৃ.

২৪১. শাওকানী, ফতহুল ক্বদীর, ১/৪২৫পৃ. দারু ইবনে কাসির, দামেস্ক, বয়রুত, প্রকাশ.১৪১৪হি.

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে।"[২৪২] আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যাঁদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং বিদআতী ও দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে আহলুল বিদআত ওয়াল ফুরকা বলা হয়)।"[২৪৩]

হাদিসের আলোকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের প্রমাণ

হযরত ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-"আমার উম্মতের মধ্যে সে সমস্ত জিনিসের আবির্ভাব ঘটবে, যা বনী ইসরালের মধ্যে ছিল। দু'টি জুতার একটি অপরটির সাথে যেমন মিল থাকে। এমনকি বনী ইসরাঈলের কেউ যদি প্রকাশ্যে মায়ের সাথে যিনা করে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যে তা করবে। নিশ্চয় বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত তিয়াত্তার দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে যাবে তবে একটি দল ব্যতীত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তারা কারা? রাসূল (ﷺ) উত্তর দিলেন, قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وأصحابي -"আমি এবং আমার সাহাবার আদর্শের ওপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"[২৪৪] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহ.) বলেন-

فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

-"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নাযাতপ্রাপ্ত দলটিই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত।"[২৪৫] আল্লামা ইমাম ইরাকী (রহ.) বলেন-

أهل السّنة وَالْجَمَاعَة -"এটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত।"[২৪৬] বিখ্যাত তাফসিরকারক আল্লামা ইসমাঈল হাক্কি (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

২৪২.ইমাম দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৫/৫২৯পৃ. হাদিস, ৮৯৮৬

২৪৩.ইবনে তাইমিয়া, মুস্তাদরাক আ'লা মাজমাউল ফাত্ওয়া, ২/২৫২পৃ. (শামিলা)

২৪৪ . খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬১পৃ. কিতাবুল ই'তিসাম বিস্-সুন্নাহ, হাদিস নং.১৬১, তিরমিযি, আস্-সুনান, ৫/২৬পৃ. হাদিস, ২৬৪১, আহলে হাদিস আলবানী সুনানে তিরমিযির তাহক্বীকে হাদিসটি 'হাসান' বলেছেন, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/৩০পৃ. হাদিস, ৬২, ১৪/৫২পৃ. হাদিস, ১৪৬৪৬, মাকতুবাতু ইবনে তাইমিয়া, কাহেরা, মিশর, প্রকাশ.১৪১৫হি. বায়হাকি, ই'তিক্বাদ, ১/২৩৩পৃ. বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১/২১৩পৃ. হাদিস, ১০৪

২৪৫. মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ১/ ২৫৯পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪২২হি.।

২৪৬. ইমাম ইরাকী, তাখরীজে ইহইয়াউল উলূম, ১/ ১১৩৩পৃ. দারুল ইবনে হাযম, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪২২হি.।

وفرقة ناجية وهم اهل السنة والجماعة

-"নাযাতপ্রাপ্ত দলই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।"[২৪৭] আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

ولا شك أنهم أهل السنة والجماعة.

-"এতে কোন সন্দেহ নেই নাযাত প্রাপ্ত দলটিই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত।"[২৪৮] এ বিষয়ে উপরের হাদিসের ন্যায় সাহাবি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) হতে আরেকটি সূত্র বর্ণিত এভাবে আছে যে, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন "তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।

كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

'বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি দল জান্নাতে যাবে। আর তারা হল জামাত অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।' আর আমার উম্মতের মাঝে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজা এমনভাবে প্রবেশ করবে, যেমন জলাতঙ্ক রোগ, এ রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে।"[২৪৯] আল্লামা শায়খ মাতুলী শা'রাভী (রহঃ) {ওফাত.১৪১৮হি.}এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন-

والجماعة: هم أهل السنة والجماعة

-"এখানে জামাত বলতে রাসূল (ﷺ) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝিয়েছেন।"[২৫০] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম আব্দুর রউফ মানাভী (রহঃ) বলেন-

والجماعة أي أهل السنة والجماعة

-"এখানে জামাত বলতে রাসূল (ﷺ) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝিয়েছেন।"[২৫১] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেন-

الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة

২৪৭. ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রূহুল বায়ান, ১/১৩পৃ. সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২৪৮. মোবারকপুরী, মের'আতুল মাফাতিহ, ১/ ২৭৫পৃ.

২৪৯. খতিব তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬১পৃ. কিতাবুল ই'তিসাম বিস্-সুন্নাহ, হাদিস নং.১৬২, মুসনাদে আহমদ,আবু দাউদ, আস্-সুনান, ৪/১৯৮পৃ. কিতাবুস্-সুন্নাহ, হাদিস, ৪৫৯৭, আহলে হাদিস আলবানী সুনানে আবি দাউদের তাহক্বীকে হাদিসটি 'হাসান' বলেছে কিন্তু পাগলের মত আবার মিশকাতে সহিহ বলেছে।

২৫০. শায়খ শারাভী, তাফসীরে শারাভী, ৭/৪০০২পৃ.।

২৫১. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ২/২০পৃ. হাদিস ঃ ১২২৩, মাকতুবাতুল তাযারিয়াতুল কোবরা, মিশর, প্রকাশ.১৩৫৬হি.।

-"নাযাত প্রাপ্ত দলই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।"[২৫২] আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের আলেম আযিমাবাদী (ওফাত.১৩২৯হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

هُمْ أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الناجية

-"এটা দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে, যা একমাত্র নাযাত প্রাপ্ত দল।"[২৫৩] আহলে হাদিস মোবারকপুরী (ওফাত.১৩৫৩হি.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন-

هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهِيَ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ

-"এটা দ্বারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝানো হয়েছে, যা একমাত্র নাযাত প্রাপ্ত দল।"[২৫৪] এ ছাড়া এ বিষয়ে উপরের হাদিসের অনুরূপ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে আরেকটি সূত্র পাওয়া যায়।[২৫৫]

ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) {ওফাত.৩৭৩হি.} এ হাদিসটি কিছুটা মতন পরিবর্তন করে সংকলন করেন এভাবে-

قالوا: يا رسول الله ما هذه الواحدة؟ قال: أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِي أنا عَلَيْهِ، وأصْحَابِي

-"সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! নাযাতপ্রাপ্ত একমাত্র দল কোনটি? তিনি বললেন, তারা হলো আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জা'মাত যারা আমার এবং সাহাবিদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[২৫৬] এ হাদিসে প্রমাণিত হলো যে রাসূল (ﷺ)'র মুখেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নাম উচ্চারিত হয়েছে বা প্রচলন ছিল।[২৫৭] এ সমস্ত হাদিসে সত্যের

২৫২. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ২/২০পৃ. হাদিস ঃ ১২২৩, মাকতুবাতুল তাযারিয়াতুল কোবরা, মিশর, প্রকাশ.১৩৫৬হি.।

২৫৩. আযিমাবাদী, শরহে সুনানে আবি দাউদ, ১২/২২৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৫ হি.।

২৫৪. মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযি, ৭/৩৩২পৃ. ও মের'আতুল মাফাতিহ, ১/২৭১পৃ. ও ১.২৭৮পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

২৫৫. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৩৮পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

২৫৬. ইমাম আবু লাইস সমরকন্দী, তাফসীরে বাহারুল উলূম, ১/৪৫৬পৃ. দারু ইহইয়াউত্-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

২৫৭. তার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় সাহাবিদের যুগেই এ সঠিক দলের প্রচলন ছিল যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বর্ণনা করেন-

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؟ فَقَالَ: أَنْ تُحِبَّ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا تَطْعَنَ الْخَتَنَيْنِ، وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যারা রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর রাসূল (ﷺ) এবং সাহাবিদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র দল হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত। এ ছাড়া যত সম্প্রদায় তথা রাফেযী, খারেজী, মুরযিয়া, কাদেরীয়া, জাহমিয়া, হারুরিয়া, শিয়া, আহলে হাদিস, কওমী-দেওবন্দী সকলেই ভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট।

বাহাত্তর দল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন-

The Prophet had said that there would be 73 sects.

Some may argue by quoting the Hadith of our beloved Prophet, from Sunan Abu dawood Hadith No. 4579. In this Hadith the Prophet (pbuh) is reported to have said. ~My community will split up into seventy-three sects."

This hadith reports that the prophet predicted the emergence of seventy-three sects. He did not say that Muslims should be active in dividing themselves into sects. The glorious Qur'an commands us not to create sects. These who follow the teachings of the Qur'an and Sahih Hadith and do not create sects are the people who are on the true path.

According to Tirmidhi Hadith No. 171, the prophet (pbuh) is reported to have said, "My Ummah will be fragmented into seventy three sects, and all of them will be in Hell fire except one sect." The companions asked Allah's messenger which group that would be. Where upon he replied, "It is the one to which In and my companions belong."

-"হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) কে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন- শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃ) কে মুহাব্বত করা। এবং হযরত আলী ও হযরত উসমান (রাঃ)'র সমালোচনা না করা এবং চামড়ার মৌজাদ্বয়ের উপরে মাসেহ করা। (মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ২/৪৭২পৃ.) এ রকম বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর পাওয়া যায় (তথ্য সূত্র ঃ মোল্লা জিওন, তাফসীরে আহমদিয়্যাহ তে সুরা আনআমের ১৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। এ ছাড়া আমরা সুরা আলে ইমরানের ১০৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বিস্তারিত আলোকপাত করবো।

The glorious Qur'an mentions in several verses, "Obey Allah and obey His Messenger". A true Muslim should only follow the glorious Qur'an and the Sahih Hadith.

"আমাদের নবীজি (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে তিহাত্তর দল হবে"।

কেউ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বিতর্ক করতে পারে। হাদীস নং ৪৫৭৯। এ হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মত তিহাত্তর দলে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই হাদীসে রাসূল (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তেহাত্তর দল হবে। তিনি এ কথা বলেননি যে, মুসলমানদেরকে সক্রিয় হয়ে তিহাত্তর দল সৃষ্টি করতে হবে। কোরআনে দলাদলি সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে এবং যারা দলাদলি সৃষ্টি করে না, তারা সঠিক পথের ওপর রয়েছে। তিরমিযী শরীফের ১৭১ নং হাদীস অনুযায়ী, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সকলেই জাহান্নামে নিপতিত হবে, মাত্র একদল ব্যতীত।

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, কোন দলটি জান্নাতে যাবে? তখন রাসূল (ﷺ) উত্তর দিলেন,

"It is the one to which I and my companions belong."

"আমি এবং আমার সাহাবাদের পথে যারা চলবে, সেই দল"।

কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করো। একজন সত্যিকারের মুসলমান শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস মানতে পারেন।"

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

এখানে ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবসহ সালাফী, আহলে হাদীস সবগুলোকে তিহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ তিনি এতটুকু খেয়াল করেননি যে মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে, অবশিষ্ট বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর সব মানুষ কি জাহান্নামে যাবে? পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করে থাকে। আর কিছু লোক আছে, যারা সালাফী। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। কেউ আহলে হাদীস, কোথাও লা-মাযহাবী। সুতরাং সবাই যদি বাহাত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সত্যের ওপর

প্রতিষ্ঠিত দল কোনটি? ডা. জাকির নায়েক? তিনি কি একাই জান্নাতে যেতে চান? সারা পৃথিবীর সবাইকে জাহান্নামী বানিয়ে তিনি একাই জান্নাতে যেতে চান?

দীর্ঘ ১২-১৩ শত বছর সারা পৃথিবীর সব মানুষ চার মাযহাব অনুসরণ করেছে। তবে তারাও কি জাহান্নামী? যেহেতু জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে 'মুসলমান' বাদে যেকোনো লেবেল লাগালেই সেটা দলাদলির অন্তর্ভুক্ত হবে, অতএব তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী ১২-১৩ শত বছরের সকল মুসলমান জাহান্নামী।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

বিজ্ঞ পাঠক। ডা. জাকির নায়েক তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের তিহাত্তর দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। বাকি বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেছেন, জান্নাতী দল কোনটি। রাসূল (ﷺ) উত্তর দিয়েছেন,

"It is the one to which I and my companions belong".

যে দলটি আমি এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হাদীসের এ বক্তব্যের সাথে এবং ডা. জাকির নায়েকের নিচের বক্তব্যটি একটু মিলিয়ে দেখুন!

Those who follow the teachings of the Qur'an and Sahih Hadith, and do not create sects are the people who are on the true path.

'যারা শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে এবং কোনো বিভক্তি সৃষ্টি করে না, তারা হলো সত্য পথপ্রাপ্ত'। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের অনুসরণ করবে। অথচ ডা. জাকির নায়েক সাহাবীদের আদর্শ বাদ দিয়ে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সার্টিফিকেট তাদেরকে দিয়েছেন, যারা কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করবে। এখানে তিনি সাহাবীদের অনুসরণের বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন কেন? রাসূল (ﷺ) যেখানে বলেছেন, যে দলটি আমার এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর চলবে। এখানে ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস মানলেই 'ট্রু মুসলিম' হয়ে যাবে। রাসূল (ﷺ) তো তা বলেননি। তিনি বলেছেন, আমার আদর্শ তথা কোরআন ও সুন্নাহ এবং আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর যারা চলবে। তিনি এখানে সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

ডা. জাকির নায়েক শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বলেছেন,

'তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো, অনুসরণ করো আল্লাহর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আমর' তথা আলেম বা শাসক রয়েছেন, তাঁদের অনুসরণ করো। কোরআনে তো শুধু এ কথা বলা হয়নি যে,

A true Muslim should only follow the Glorious Qur'an and the Sahih Hadith.

'সত্যিকার মুসলিম শুধু (only) কোরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করবে।'

ডা. জাকির নায়েক কোরাআনের ও আয়াতের ক্ষেত্রে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আয়াতের প্রথম অংশ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আয়াতের যে অংশে শাসক বা আলেমগণের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে, সেটি এড়িয়ে গেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এসব কোরআন ও ইসলামের স্পষ্ট অপব্যাখ্যা।

৫৯. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে অনুসরণের মূলনীতি ?

ডা. জাকির নায়েক বলেন-"**একজন মুসলমানের কুরআন এবং ছহীহ হাদীসের ওপর আমল করা উচিত। তার কোনো আলেম বা ইমামের ততক্ষণ পর্যন্ত একমত হওয়া উচিত যতক্ষন পর্যন্ত তার আক্বিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন এবং ছহীহ হাদীস মুতাবিক হবে।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/১৯৭পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! ডা. জাকির নায়েক নিজেই চার মাযহাবের ইমামদের বিষয়ে তার এক লেকচারে বলেছেন-"তাঁরা ছিলেন ইসলামের জ্ঞানে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাঁদেরকে তাদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৬১পৃ.)

পাঠকবৃন্দ! তাদের ভুল ধরতে কাদের প্রয়োজন? ইসলামী শরীয়তে হাসান, দ্বঈফ সবগুলোই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

৬০. চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ কি ভুল ফাতওয়া দিয়েছেন ?

ডা. জাকির নায়েক বলে, **"আমি জানি সব মানুষই ভুল করতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা ভুল করেছেন, ইমাম শাফেয়ী (র) ভুল করেছেন, ইমাম মালেক ও ইমাম হাম্বলী (র)-ও ভুল করেছেন।"**[২৫৮]

২৫৮. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৯২পৃ.

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পৃথিবীর সব মানুষের বিষয়ে তিনি বলেছেন ভুল করতে পারেন অর্থাৎ সন্দেহ রেখেছেন। কিন্তু দেখুন চার মাযহাবের ইমামদের বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত হয়ে গেলেন। আমাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা হচ্ছে চার মাযহাবই হক্ব, তবে ইজতিহাদী ভুল হওয়া স্বাভাবিক; সে জন্য নবিজী নিজেই বলেছেন যে, ইজতিহাদী ভুল হলে একগুণ সাওয়াব। (সহীহ বুখারী) তবে জাকির নায়েকের বুঝা উচিত ছিল যে, মুজতাহিদদের ভুল আরেক মুজতাহিদই ধরতে পারেন। অথচ জাকির নায়েক এরপর আলবানী সম্পর্কে বলেন-"তিনি এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি কুরআন-হাদিস অনুযায়ীই কথা বলেন।"[২৫৯] তাহলে আমার জাকির নায়েকের কাছে প্রশ্ন হলো যে, চার মাযহাবের ইমামদের প্রতি আপনার দুষমনী কেন? তা না হলে বক্তব্যে একই স্থানে আলবানীকে খাস করলেন কেন? তাই কারণ কারও অজানা নয় যে আপনি যে আহলে হাদিসদের দালালী করছেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার লিখিত প্রকাশের পথে **"পৃথিবীর সবচেয়ে ভুয়া তাহকীককারী শায়খ আলবানীর মুখোশ উন্মোচন"** এবং ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে স্বয়ং আহলে হাদিস ইবনে বায পর্যন্ত তার ফতোয়ার কিতাবে আলবানীকে ভুয়া তাহকীককারী বলেছেন।

এ নীতিতে সে হুবহু শায়খ আলবানীকে অনুসরণ করেছেন, কেননা আমরা ইতিপূর্বের আলোচনায় পেয়েছি যে আলবানী পূর্বসূরী ইমামদের সমালোচনা করেছেন সে হিসেবে ডা. জাকির নায়েকও আলবানীকে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করাটাই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) {৩২১হি.}আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আক্বিদা বর্ণনা করেন-

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل

-"পূর্ববর্তী যুগের 'সালাফে সালিহীন' (নেককার পূর্ববর্তীগণ) ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তীকালের কল্যাণময় আলেমগণ, মুহাদ্দিস ও হাদিস অনুসারীগণ এবং ফকীহ-মুজতাহিদ ও ফিকহ-অনুসারীগণ, তাদের সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান ও প্রশংসার সাথে স্মরণ ও উল্লেখ করতে হবে। **আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে কুটুক্তি বা বিরূপ মন্তব্য করে সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।**"[২৬০] তাই ডা. জাকির নায়েকও সেই ভ্রান্ত পথের অনুসারী হয়েছেন চার মাযহাবের ইমামসহ অন্যান্য বুযর্গদের সমালোচনা করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৫৯ . জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৯২পৃ.
২৬০ .ইমাম তাহাবী, আকিদাতুত তাহাবী, (শুধু মতন), ১/৮২পৃ. ক্রমিক.৯৭

*চার ইমামদের থেকে বড় মুজতাহিদ হওয়ার দাবীর ধৃষ্টতা !

ডা. জাকির নায়েক একজন মুজতাহিদ না হয়ে চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামদের সমালোচনা করার সাহসিকতা দেখিয়েছেন। তার পূর্বে এ সাহসিকতা কেউ দেখাননি।

৬১. চার মাযহাবের ইমামদের থেকে কি আলবানী বড় ইমাম হয়ে গেলেন?

চার মাযহাবের ইমামদের সমালোচনা করে আহলে হাদিসদের মুহাদ্দিসে আযম নাসিরুদ্দীন আলবানী (মৃত.১৯৯৯ইং.) সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক বলেন,-"তবে তিনি (আলবানী) এমন একজন বিশেষজ্ঞ যিনি কুরআন-হাদিস অনুযায়ী কথা বলেন।"[২৬১] অন্য এক লেকচারে সে বলে,-"**আমি নাসিরুদ্দীন আলবানীর কথাই অনুসরণ করবো।**"[২৬২] ইতোপূর্বে আলবানীর প্রশংসায় তার এ রকম বহু বক্তব্য উল্লেখ করেছি তাতেই বুঝা যায় সে তাবেয়ী বিদ্বেষী ও অন্ধ আলবানীর পূজারী। একজন তাবেয়ীর কথা মত অনুসরণ করতে তার কাছে তিতা লাগে আলবানীর অনুসরণ তার কাছে মধুর মত লাগে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারই বলুন আপনাদের কাকে অনুসরণ করা উচিত।

৬২. চার মাযহাবের ইমামদের ভুল ধরার নব কৌশল ঃ

ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবের ইমামগণ ভুল করেছেন বলেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং সে তাদের ভুলের উদাহারণ তুলে ধরেন। তার দৃষ্টিতে কিছু ভুলের নমুনা নিচে প্রদত্ত।

৬৩. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ)এর ভুল সিদ্ধান্ত ঃ

ডা. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর অনেকগুলো ভুল থেকে একটি মাস'আলা তুলে ধরেন তা হল যে 'ওযু অবস্থায় যদি কেউ তার স্ত্রীকে স্পর্শ করে তাহলে তার ওযু ভেঙ্গে যাবে' এটিকে তাহার ভুল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬৩] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমাদের বক্তব্য হলো চার মাযহাবই সঠিক। সে হিসেবে ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ)-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে তার অভিমত সঠিক। যদিও ইজতিহাদ ভুলও হয়ে থাকে তাহলেও নবির এ হাদিস[২৬৪] মোতাবেক একটি সাওয়াবের ভাগী হবেন। এখানে জাকির নায়েক এ যুগের ইসলামী কোনো বিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেম নয়; কিভাবে সে

২৬১ . জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৯২পৃ.
২৬২. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৯২পৃ.
২৬৩. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৬৯-৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপক আলোকপাত করেছেন। করে শেষে লিখছেন-"**ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতটাই সঠিক।**" অর্থাৎ শাফেয়ীর টি ভুল। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার, ৫/৭৩পৃ. নিচের অংশ দেখুন)
২৬৪ . সহিহ বুখারী, হাদিস নং

একজন মুজতাহিদ ইমামমের ভুল ধরার সাহস রাখে, যা আজ পর্যন্ত কোনো ইমাম, মুহাদ্দিসরা করে নি। তা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত। এ বিষয়ে ইমাম আযম (রহ.)-এর দলিল হলো মারফূ হাদিস- হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

-"হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গভীর রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন তখন) আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে শুয়ে থাকতাম। আমার পা তাঁর কিবলার (সামনে) থাকত। তিনি যখন সাজদা করতেন, তখন আমাকে খোঁচা দিতেন, তখন আমি আমার দুই পা গুটিয়ে নিতাম। তিনি সাজদা থেকে উঠে গেলে আমি আবার আমার দুই পা লম্বা করে দিতাম। তিনি বলেন সে সময় ঘরে কোন বাতি বা আলো ছিল না।"[২৬৫] এ হাদিসে রয়েছে ওযু অবস্থায় নয় বরং নামাযেও স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযু ভাঙ্গবে না। যেমন আরেকটি বর্ণনা রয়েছে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

-"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন এবং এরপর তিনি ওযু না করেই সালাত আদায় করলেন।"[২৬৬] আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলিল হলো মওকুফ হাদিস -

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন, কেউ তার স্ত্রীকে চুমু খেলে (তার ওযু ভঙ্গ হবে এবং পুনরায়) তাকে ওযু করতে হবে।"[২৬৭] এ ছাড়া আরেকটি মাওকুফ হাদিস হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে-

عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

২৬৫ .সহিহ বুখারী, ১/৮৬পৃ. কিতাবুস সালাত, হাদিস নং, ৩৮২, ও ৫১৩, সহিহ মুসলিম, ১/৩৬৭পৃ. কিতাবুস সালাত, হাদিস ঃ ৫১২

২৬৬ .ইমাম নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ১/১৩৫পৃ. হাদিস, ১৫৫, আস্-সুনান, ১/১০৪পৃ. হাদিস ঃ১৭০

২৬৭ .ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ২/৬০পৃ. হাদিস, ১৩৫, ও ১৩৬

"তিনি বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে চুমু খায় বা তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে, তবে তাকে ওযু করতে হবে।"[২৬৮] প্রমাণিত হলো উভয় পক্ষেই সহিহ হাদিস রয়েছে তবে ইমাম আযম (রহ.)-এর পক্ষে হাদিসে সহিহ তো আছেই তার পাশাপাশি তাঁর মতের প্রধানশক্তি হলো সেটি মারফূ তথা রাসূল (ﷺ)-এর কর্ম। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পক্ষে সহিহ হাদিস থাকলেও সেটি মাওকুফ সাহাবিদের উক্তি বা কর্ম। তাই বুঝতে পারলাম ডা. জাকির নায়েকের ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কে ভুল ধরা মানে সাহাবিদের ভুল ধরার নামান্তর। যা একমাত্র পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো লোকের দ্বারা সম্ভব নয়।

৬৪. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)এর ভুল সিদ্ধান্ত ঃ

জাকির নায়েক তার দৃষ্টিতে পড়া ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ভূল ধরার পর ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর ভুল ধরার কৌশল খুঁজতে লাগলো। তিনি এক পর্যায়ে তার ধারণায় অনেক ভূল হতে উদাহারণস্বরূপ একটি তুলে ধরেন যে নামাযে আমিন আস্তে বলা হলো তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত; আর শাফেয়ী (রহ.)-এর মত নামাযে আমিন জোরে বলা হলো তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত।[২৬৯] জাহেল পথভ্রষ্ট জাকির নায়েকের ভেবে দেখার উচিত ছিল যে হানাফি মাযহাবের পক্ষে কোন সহিহ হাদিস আছে কী না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পক্ষে যেমন সহিহ হাদিস রয়েছে তেমনিভাবে ইমাম আযম (রহ.)-এর মতের পক্ষেও হাদিস রয়েছে। তাই কিছু হাদিস পড়েই শুধু লাফালাফি করলেই হবে না; বরং সব রকম হাদিসের জ্ঞান না রেখে সালাফি আহলে হাদিসের মতের পক্ষের কিছু হাদিস পড়ে মুহাদ্দিস সাজলে চলবে না। ইমাম আযমের বক্তব্য হলো আমিন যেহেতু দোয়া; আর দোয়া আল্লাহ বিনয়ের স্বরে বলার জন্য আদেশ করেছেন। সেহেতু আমিন আস্তে বলাই উত্তম। হানাফি মাযহাবের পক্ষে এ বিষয়ে মারফূ, মাওকুফ, মাকতু সব ধরনেরই হাদিস রয়েছে।[২৭০] সাহাবি হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বলেন-

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: «آمِينَ» خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

২৬৮ .ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ২/৬০পৃ. হাদিস, ১৩৪

২৬৯ .জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা. জাকির নায়েক ৭৫ পৃষ্ঠায় সে বলে, শাফেয়ী মাযহাবের মতটাই সঠিক।" সে ৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন-"তবে ব্যাপারটা এমন না যে তিনি ইচ্ছা করে ভুল করেছেন।"

২৭০ .নামাযে আমিন আস্তে বলার পক্ষে বিস্তারিত দলিল জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" ২য় খণ্ড দেখুন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

-"তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে নামায আদায় করেন। তিনি 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' পাঠান্তে 'আমিন' বললেন। আমিন বলার জন্য তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর নিচু (Lower) করলেন।"[২৭১] এ বিষয়টি নিয়ে জাকির নায়েক ইমাম আযম (রহ.) কে হাসি তামাশা করে বলেন, "আমি শব্দ করে আমিন বলি। আর এ কারণেই আমি একজন পাক্কা হানাফী।"[২৭২] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যারা ইমাম আযমের বিপরীত মত পোষণ করেন অথচ যার মতের পক্ষে অসংখ্য সহিহ হাদিসে পাক রয়েছে তারা কী তাঁর অনুসারী দাবী করতে পারেন? এ বিষয়ের প্রমাণে আমি এখানে বিস্তারিত হাদিস উল্লেখ করে আমার কিতাব দীর্ঘায়িত করতে চাই না; কেননা এ কিতাবে জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদের অনেক বিষয়ের জবাব সামনে দিতে হবে। নামাযে আমিন আস্তে বলার পক্ষে বিস্তারিত দলিল জানতে আমার লিখিত ***"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"*** ২য় খণ্ড দেখুন।

৬৫. ডা. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম মালেক (রহ.)'র ভুল সিদ্ধান্ত ঃ

জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে ইমাম মালেক (রহ.) এর ভুল হলো নামাযে দু'হাত ঝুলিয়ে রাখা বা দু'হাত ছেড়ে দেওয়া। আর তার দৃষ্টিতে শুদ্ধ হলো নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধা।[২৭৩] তিনি তার মতের সপক্ষে দুটি হাদিস এনেছেন যে হাদিসগুলো কে আহলে আলবানী সহিহ বলার কারণে তিনি এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অথচ এ হাদিস দুটি অত্যন্ত দুর্বল বা মওদু বলাও চলে। ইমাম মালেক (রহ.) এর মতের পক্ষেও সহিহ হাদিস রয়েছে; কিন্তু জাকির নায়েক তো হাফিযুল হাদিস নন যে তিনি সব হাদিস জেনে গেছেন। ইমাম মালেক (রহ.)-এর এ মতের সপক্ষে বিস্তারিত হাদিস জানতে আপনারা আমার লিখিত **"সহিহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার পদ্ধতি"** এর ১০-১৪পৃষ্ঠা দেখুন।

৬৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ কি ভুল ???

ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবের ইমামরা ভুল করেছেন বলেছেন। আচ্ছা! এখন আমরা দেখবো চার মাযহাবের ইমামদের মতাদর্শ কোনটি ছিল। এ প্রসঙ্গে ডা. জাকির নায়েক বলেন, -"এই চারজন ইমামের মাযহাবই ছিলো আমাদের রাসূল (ﷺ)-এর মাযহাব। তারা সবাই রাসূলের

২৭১ .আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ২/৩৬০পৃ. হাদিস ঃ ১১১৭, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/৯পৃ. হাদিস ঃ ৩, বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ২/৮৩পৃ. হাদিস ঃ ২৪৪৭, ও মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, /৩৯০পৃ. হাদিস ঃ ৩১৬৪, আমিমুল ইহসান, ফিক্বহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৭৭পৃ. হাদিস ঃ ৪৫১, ই.ফা. । সনদটি সহিহ, কোন দুর্বল রাবী এ সনদে নেই।

৭২ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৮৪পৃ.

৩ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৮৫পৃ.

মাযহাব অনুসরণ করেছেন।"[২৭৪] সুন্দর উত্তর। আচ্ছা! এখন যদি ডা. সাহেবকে প্রশ্ন করা হয় তাদের চলার পথতো আল্লাহ ও তার রাসূলের পথই ছিল তাহলে এই পথ কিভাবে ভুল হতে পারে? তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ/মত কি ভুল ??? নাউযুবিল্লাহ! (এখানে ইবনে রজব হাম্বলীসহ অন্যান্যদের কথা আসবে যে মাযহাবের ইমামগণ কোন সহিহ হাদিস পেলেই মাসআলা সাবিত করতেন)

৬৭. মাযহাবের ভুয়া সংজ্ঞা দিয়ে আবারও ভুল বুঝানোর চেষ্টা ঃ

জাকির নায়েক তাক্বলীদ বা মাযহাবের এমন এক মনগড়া সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যা আজ পর্যন্ত কোন অভিধানবিদ এবং কোন আলেম দেননি। সে আকাশ-পাতাল পার্থক্যের ন্যায় সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে-**"আপনি যদি আপনার ইমামমের কোন মতামত কেউ ভুল প্রমাণ করা সত্ত্বেও আপনি তা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন তাহলে সেটাই তাক্বলীদ।"**[২৭৫] নাউযুবিল্লাহ !!

তাকলীদ বা মাযহাবের সংজ্ঞার আসল রূপ ঃ মুজতাহিদ[২৭৬] ফকীহ যারা কুরআন সুন্নাহ, সাহাবীদের ফাতওয়া, কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ঐকমত্যে এবং যুক্তির নিরিখে কুরআন সুন্নাহ থেকে মাসয়ালা বেরকারী গবেষক দলের নাম। ***আর এ মুজতাহিদদের উদ্ভাবিত মূলনীতির আলোকে বের হওয়া মাসআলার নাম তাক্বলীদ বা মাযহাব।*** যারা ঐ মাযহাবের সম্মানিত অনুসারী ফিক্বহ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদেরকে মুকাল্লিদ বলা হয়। তাক্বলীদের পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম একই ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে একটা সংজ্ঞার সাথে অন্য সংজ্ঞার কিছু তারতম্য রয়েছে। এখানে আমরা তাক্বলীদের তিন ধরনের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করব।

তাক্বলীদের প্রথম ধরনের সংজ্ঞা ঃ ১.ইমাম গায্যালী (রহ.) 'কিতাবুল মুস্তফা' এর ১/৩৭০ পৃষ্ঠায়[২৭৭] লিখেছেন- التَّقْلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ -"তাক্বলীদ হলো কোনো (মুজতাহিদ ইমামমের) উক্তিকে বিনা দলিলে গ্রহণ করা।" তাই আমরা তাদের রায়ের পরে কুরআন হাদিসের কোন দলিল খুঁজি না, কেননা কুরআন হাদিস হলো আমাদের

২৭৪ . জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং.৫/৮৯পৃ.

২৭৫ . জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৯২পৃ.

২৭৬ .ইমাম জুরজানী (রহ.) বলেন-

استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي.

-"একজন ফকিহ সঠিক ধারণা রেখে শরিয়তের হুকুমটি হাসিল করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই ইজতিহাদ।' (জুরজানী, তা'রিফাত, ১/১০৪পৃ.) মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থে অনুরূপ বলা হয়েছে (তথ্য সূত্রে মু'জামুল ওয়াসিত, ১/১৪২পৃ.)

২৭৭. যা দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন হতে ১৪১৩হি. সালে প্রকাশিত।

জন্য দলিল আর মুজতাহিদগণ তা গবেষণা করেই মাস'আলার সমাধান আমাদের জন্য বের করেছেন। কেউ যদি মাযহাব মানার পরেও বিপরীতে দলিল অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে (যা বর্তমান আহলো হাদিসদের স্বভাব) তবে বুঝতে হবে সে মাযহাব কী তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

২.আল্লামা আ'মাদী (রহ.) তাক্বলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে

العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة

-"আবশ্যক কোন দলিল ব্যতীত অন্যের[২৭৮] কথার উপর আমল করা।"[২৭৯] এখানে "আল আমালু বি কওলিল গায়ের" (অন্যের কথা অনুযায়ী আমল) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। "কওল" (কথা) দ্বারা অন্যের কথা ও কাজ দু'টিই অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি আল্লামা তাফতাযানি (রহ.)'র অভিমত। (বায়ানুল ফাওয়াইদ) এখানে "হুজ্জাত" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন দলিল, যা গ্রহন ও যার উপর আমল করা আবশ্যক। অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা। অতএব এ শর্তের দ্বারা যে সমস্ত ক্ষেত্রে হুজ্জাত পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে তার অনুসরন তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যেমন- ক. আল্লাহর কথা অনুযায়ী আমল করা। কেননা এখানে আল্লাহর কথা অনুযায়ী আমল করার হুজ্জাত হলো, সে সমস্ত দলিল, যা আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসুল সমূহের প্রতি এবং তার কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশনা ইঙ্গিত দান করে। সুতরাং আল্লাহর কোন নির্দেশের উপর আমল করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

খ.রাসূলের কথা অনুযায়ী আমল করা। এটিও তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এটা, "হুজ্জাত" বা দলিল। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা তার রাসূলের কালাম গ্রহণের কথা নির্দেশ দিয়েছেন।

গ. "মুসলিম উম্মাহর ইজমার উপর আমল করা।" এটিও তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এদের ঐকমত্যের উপর আমলের নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহে রয়েছে।

ঘ.কাজির জন্য সাক্ষীর কথা অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। এটিও তাক্বলীদ নয়। কেননা সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সাক্ষীর কথা গ্রহণের নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহে রয়েছে এবং এর উপর ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঙ. মুফতির ফাতওয়ার উপর "সাধারণ মানুষের" আমল। এটিও তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এ বিষয়ে শরীয়তের "হুজ্জাত" রয়েছে। (সুরা আম্বিয়া-৭) আর তা হলো, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহের "ইজমা" সংগঠিত হয়েছে যে, সাধারন মানুষ

২৭৮. এখানে অন্যের বলতে মুজতাহিদদের কথা বুঝানো হয়েছে, কেননা মুজতাহিদ ছাড়া কারও অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়।

২৭৯. আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম, ৪/২২১পৃ.

প্রয়োজন হলে মাসয়ালার জন্য ফাতওয়া প্রদানকারীর শরাণাপন্ন হবে। এবং মুফতির ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করা তার উপর আবশ্যক হবে। এখানে হুজ্জাত হলো, মুসলিম উম্মাহের ইজমা। এছাড়া কুরআন ও সুন্নাহে এ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে।

চ. হাদিস বর্ণনাকারীর (রাবী) নিকট থেকে "আমলযোগ্য" কোন হাদিস গ্রহণ করে তার উপর আমল করলে সেটা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এখানে "হুজ্জাত" হলো, আল্লাহর রাসূল আদেশ করেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও এবং উপস্থিতরা অনুপস্থিত নিকট পৌছে দাও। (মিশকাত কিতাবুল ইলম সহিহ বুখারীর সূত্রে)

ছ. কোন সাহাবির অনেক বক্তব্য, যার সাথে অন্য সাহাবিগণ বিরোধিতা করেননি, তার উপর আমল করাও তাক্বলীদ নয়। কেননা এ ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জাত বা দলিল রয়েছে অনুসরণের জন্য।

৩. একই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল্লামা ইবনে আব্দুশ শুকুর "মুসাল্লামুস সুবুত" নামক কিতাবে যেমন বলা হয়েছে العمل بقول الغير من غير حجة -"তাক্বলীদ হচ্ছে কোন দলিল প্রমাণ ছাড়াই অন্যের (মুজতাহিদের) মতানুযায়ী আমল করা।"

৪. আল্লামা ইযযুদ্দিন (রহ.) তাঁর "শরহে মুখতাসারে ইবনে হাজেবে" এ ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

৫. আহলে হাদিসদের ইমাম কাযি শাওকানী বলেন-

وَقِيلَ: هُوَ قَبُولُ قول الْغَيْرِ دُونَ حُجَّتِه، أَيْ: حُجَّةِ الْقَوْلِ.

-"কেউ কেউ বলেছেন, তাক্বলীদ হচ্ছে কোন দলিল প্রমাণ ছাড়াই অন্যের (মুজতাহিদের) মতানুযায়ী আমল করা। অর্থাৎ-এখানে হুজ্জাত মানে কারও বক্তব্য।"[২৮০]

৫. আল্লামা ইবনে হাজেব (রহ.) তাক্বলীদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন-

العمل بقول غيرك من غير حجة

-"আবশ্যক দলিলবিহীন অন্যের কথা আমল করা।"[২৮১]

৬. আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) লিখেছেন قبول قول الغير من غير حجة - "হুজ্জাত ছাড়া অন্যের কথা গ্রহণ করা হলো তাক্বলীদ।"[২৮২]

৭. আল্লামা শাওকানী তার কিতাবে উল্লেখ করেন শায়খ আবু মানসূর এবং শায়খ আবুল হামিদ তাক্বলীদের সংজ্ঞায় বলেন-

২৮০. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল, ২/২৩৯পৃ.

২৮১. ইবনে হাজেব, শরহে মুসাল্লামুস সবুত, ২/৪০০পৃষ্ঠা., শায়খ জাকারিয়া আনসারী, গায়াতুল উসূল, ১/১৫৮পৃ. দারুল কুতুব আরাবিয়্যাতুল কোবরা, মিশর (শামিলা)।

২৮২. রওযাতুন নাজের,পৃ.২০৫

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: هُوَ قَبُولُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ تَظْهَرُ عَلَى قَوْلِهِ.

-" হুজ্জাত ছাড়া অন্যের কথা (মুজতাহিদের) গ্রহণ করা, যে বিষয়ে দলিল প্রকাশমান নয়; সেটাই তাক্বলীদ।"[২৮৩] মৌলিক দিক থেকে এ সংজ্ঞাগুলো এবং পূর্বোক্ত আল্লামা সাইফুদ্দিন আ'মাদী (রহিমাহুল্লাহ) এর সংজ্ঞার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ সংজ্ঞাগুলো থেকে তাকলীদ সম্পর্কে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

১. শরিয়তের বিষয়ে "আমি" (যে মুজতাহিদ নয়), তারই সমশ্রেণীর আরেকজন "আমীর" কথা অনুযায়ী আমল করা।

২. একজন মুজতাহিদ আলেম আরেকজন মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী আমল করা; আমলকারী মুজতাহিদ এক্ষেত্রে ইজতিহাদ করুক বা না করুক।

৩. মুজতাহিদ নয় এমন কোন ব্যক্তির কথা অনুযায়ী কোন মুজতাহিদ আমল করা।

***তাক্বলীদের দ্বিতীয় সংজ্ঞা ঃ** ১.আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (রহিমাহুল্লাহ) "জামউল জাওয়াম" নামক কিতাবে তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন

التقليد أَخْذُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ

-"দলিল সম্পর্কে পরিচয় না জেনে অন্যের (মুজতাহিদের) কথা গ্রহণ করা।"[২৮৪]

২. এখানে অন্যের কথা গ্রহণ করার দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো, অন্যের কথা সঠিক হওয়ার বিশ্বাস রেখে তার ওপর আমল করা। দলিল সম্পর্কে অবগত না হয়ে এ কথার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করতে গিয়ে ইমাম জালাল আল-মাহাল্লী (রহিমাহুল্লাহ) "জামউল জাওয়ামে" এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন-

فَخَرَجَ أَخْذُ غَيْرِ الْقَوْلِ مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّقْرِيرُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِتَقْلِيدٍ، وَأَخْذُ الْقَوْلِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ فَهُوَ اجْتِهَادٌ وَافَقَ اجْتِهَادَ الْقَائِلِ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الدَّلِيلِ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْمُجْتَهِدِ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَى مَعْرِفَةِ سَلَامَتِهِ عَنْ الْمُعَارِضِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْهُ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى اسْتِقْرَاءِ الْأَدِلَّةِ كُلِّهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الْمُجْتَهِدُ

-"দলিল সম্পর্কে অবগত হওয়ার অর্থ হলো, কিভাবে দলিল থেকে মাসয়ালা বের করা হয়, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া। এটি মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা প্রথমত দলিলটি দলিল হওয়ার জন্য তার প্রতিবন্ধক (عارض) বিষয় থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি। আর দলিলের সব ধরনের ত্রুটি ও প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি আনুষাঙ্গিক সমস্ত দলিল সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সে সম্পর্কে

২৮৩. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল, ২/২৩৯পৃ.
২৮৪. সুবকী, জামউল জাওয়াম খ. ২, পৃষ্ঠা-৪৩২

গবেষণার ওপর নির্ভর করে। আর এ ধরনের গবেষণা করা মুজতাহিদের কাজ। কেননা শরীয়তের বিষয়ে আমী (মূর্খ) ব্যক্তি সে স্তর পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।"[২৮৫]

আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহিমাহুল্লাহ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো মুজতাহিদ আলেমের কথা গ্রহন করে, তবে সেটাও তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু আল্লামা আমাদী (রহিমাহুল্লাহ) যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী একজন সাধারন ব্যক্তির জন্য কোনো মুজতাহিদের অনুসরণের বিষয়টি তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, বরং সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো মুজতাহিদ পর্যন্ত সরাসরি পৌছতে না পারে, তখন সে মাসয়ালার ক্ষেত্রে মুফতির কাছ থেকে ফতোয়া নিবে। আর এ ধরনের ফতোয়া নেয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুজ্জাত আছে। সুতরাং আল্লামা আমাদী (রহিমাহুল্লাহ) নিকট এটি তাকলীদ নয়। কিন্তু আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি (রহিমাহুল্লাহ)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য কোনো মুজতাহিদের অনুসরন তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সাধারণ মানুষ দলিল সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে অক্ষম।

৩.আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার বিখ্যাত উসূলের কিতাব "মুসাওওয়াদা" তে এবং তাঁর অন্য এক পুস্তকে লিখেছেন,-

التقليد : قبول القول بغير دليل

-"তাক্বলীদ হলো দলিল ছাড়া কোনো কথা গ্রহণ করা।"[২৮৬]

৪. শায়খ জাকারিয়া আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) {ওফাত. ৯২৬হি.} তাঁর কিতাবে বলেন-

اخذ قول الغير من غيرمعرفة دليله

-"কোন কওল বা কথা/উক্তিকে দলিলের পরিচয় ব্যতিত গ্রহন করাকে তাক্বলীদ বলা হয়।"[২৮৭]

৫.ইমাম আবু বকর আশ্-শাশী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ، وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ قَالَهُ.

২৮৫. জালালুদ্দীন মহল্লী, শরহে জামউল জাওয়ামে, ২/৪৩২পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
২৮৬. ইবনে তাইমিয়া, মুস্তাদরাক আ'লা মাজমাউল ফাতওয়া, ২/২৫২পৃ.
২৮৭. শায়খ জাকারিয়া আনসারী, গায়াতুল উসূল, ১/১৫৮পৃ. দারুল কুতুব আরাবিয়্যাতুল কোবরা, মিশর।

-"তাকলীদ হলো, অন্যের কথা গ্রহণ করা, অথচ সে কোথা থেকে বলেছে, তা তুমি জান না।"[২৮৮] এ সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে আক্ষরিক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক দিক থেকে এগুলোর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। এ সমস্ত সংজ্ঞা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তাকলীদের অর্ন্তভুক্ত হবে-

১.শরিয়তের বিষয়ে মুজতাহিদ নয় (আমী), এমন ব্যক্তির কথা আরেকজন "আমী" গ্রহণ করা।

২. কোনো মুজতাহিদ সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ না করে, অন্য আরেকজন মুজতাহিদের ইজতিহাদের উপর আমল করা।

৩.মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তি (আমী) কোনো মুজতাহিদ আলেমের তাকলীদ করা।

৪. কোন মুজতাহিদ কোন "আমির" কথার উপর আমল করা।

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন মুজতাহিদ যদি অন্য মুজতাহিদের মতের সাথে তার দলিল সম্পর্কে অবগত তার কথা অনুসরণ করে, তবে সেটা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আমরা তাক্বলীদের দ্বিতীয় যে সংজ্ঞা দিয়েছে, এ সংজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় না যে, কুরআন,সুন্নাহ এবং ইজমার কোন বিষয় গ্রহণ করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত কি না? প্রথম সংজ্ঞায় এ বিষয়গুলো আরেও কিছু বিষয়য়ের অনুসরণ তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আমরা তাক্বলীদের তৃতীয় আরেকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করবো, যেখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তাক্বলীদের তৃতীয় সংজ্ঞা ঃ তাক্বলীদের তৃতীয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) তার "তাহরীর" নামক একটি গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন-

وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي "التَّحْرِيرِ": التَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ بِلَا حُجَّةٍ منها.-

-"তাক্বলীদ হলো, দলিলবিহীন এমন ব্যক্তির কথার উপর আমল করা, যার কথা শরিয়ত স্বীকৃত কোন দলিলের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২৮৯] এখানে "শরিয়ত স্বীকৃত 'হুজ্জাত' বা দলিলের অন্তর্ভুক্ত নয়।" এ কথার দ্বারা কোরআনের উপর আমল করা, রাসূলের সুন্নাহের উপর আমল করা এবং 'ইজমার' উপর আমল করার বিষয়টি তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এগুলোর উপর আমলের ব্যাপারে শরিয়ত স্বীকৃত নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, কাযি যখন সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেবে।

২৮৮. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল, ২/২৩৯পৃ.
২৮৯. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল, ২/২৩৯পৃ.

এ ক্ষেত্রে সাক্ষীর কথা অনুযায়ী কাজির ফয়সালা দেয়াটা তাক্বলীদ নয়। কেননা, তার সাক্ষ্য গ্রহনের ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশনা রয়েছে। হাদিস বর্ণনা কারী রাবির নিকট থেকে "আমলযোগ্য" হাদিস গ্রহণ করলে তার উপর আমল করাও তাক্বলীদ নয়। তেমনিভাবে কোন সাহাবির মতামতের সাথে যদি অন্য সাহাবিরা একমত হন এবং কেউ তার বিরোধিতা না করেন, তবে তার কথা অনুসরণ করাটাও তাক্বলীদ নয়। কেননা, এ সমস্ত ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্দেশনা রয়েছে। কোন সাধারন মানুষের জন্য মুফতির ফাতওয়ার উপর আমল করাটা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? কিছু কিছু আলেম মনে করেন, সাধারণ মানুষের জন্য মুফতিকে জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে শরিয়তের "হুজ্জাত" রয়েছে, সুতরাং এটি তাক্বলীদ নয়। তবে ব্যাপকভাবে ওলামায়ে কেরাম একে তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মুফতির ফাতওয়ার উপর নির্ভর করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। একই ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আল্লামা শাওকানী তার "ইরশাদুল ফুহুল" এ বলেন-

هُوَ قَبُولُ رَأْيِ مَنْ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ بِلَا حُجَّةٍ. -"দলিলবিহীন এমন ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা, যার কথা গ্রহণের ব্যাপারে শরিয়তের কোন হুজ্জাত নেই।"[২৯০]

মাযহাব প্রসঙ্গে ডা. জাকের নায়েকের অন্য অনুষ্ঠানে আরেক ভুয়া সংজ্ঞা ঃ

ডা. জাকির নায়েক তাক্বলীদের সংজ্ঞায় বলেন-

تقلید وہ کہتے ہے کہ آنکہ بند کر ماننا

-"চোখ বন্ধ করে অনুসরণকে তাক্বলীদ বলে।" (www.Youtube.com/watch?v=leuNHQR7POI)

তিনি একটু অগ্রসর হয়ে বলেন-

اگر وہ انسان جس کے بات ما نتے ہیں اس کے خلاف ثبت پیش کر تے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں پہر بہی آپ اس کے بات مانتے ہیں اسے کہتے ہیں تقلید۔

-"আপনি যাকে অনুসরণ করছেন তার বিরুদ্ধে যদি কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রমাণ পেশ করা হয়, তার পরও যদি আপনি তাকে অনুসরণ করেন, তবে একে বলা হবে তাক্বলীদ।" নাউযুবিল্লাহ

What is Taqleed_Taqleed kia hai_By Dr. Zakir Naik in Urdu-You Tube, http:

www. Youtube. com/watch?v=leuNHQR7POI

২৯০. শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল, ২/২৩৯পৃ.

ডা: জাকির নায়েক তার এ বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন-

مطلب ایک آدمی قرآن وحدیث میں اسکالر ہیں اس نے فتوی دیا آپنے اس کے بات مان لی؛ ٹھیک ہے آپ توعام آدمی ہے۔ قرآن میں ہے : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس سے چوچھوجس کے پاس علم ہے – آپ نے پوچھا اور اسکے بات مان لیا اسے تقلید نہیں کہتے ہے لیکن دوسر اکہتا ہے: جوعالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوی قرآن وحدیث کے خلاف ہیں پہر بہی آپ.....نہی- نہی وہ بڈا عالم ہے میں اس کے بات ما نوں گا۔ حوالہ ملنے کے بعد ثبت ملنے کے بعد قرآن اور حدیث کے روشنی ہیں پہر بہی آپ اس عالم کی بات مان لے اسے کہتے ہیں تقلید-

-"উদ্দেশ্য হলো, এক ব্যক্তি কুরআন ও হাদিসের উপর দক্ষ। তিনি কোনো ফত্ওয়া প্রদান করার পর আপনি তার কথা গ্রহণ করলেন। ঠিক আছে! কেননা আপনি সাধারণ মানুষ। কুরআনে আছে, "যার নিকট ইলম আছে, তার নিকট জিজ্ঞাসা করো। (সুরা নাহল-৪৩) আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করে তার কথা মেনে নিলেন, একে তাকলীদ বলে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, যে আলেমের নিকট আপনি গিয়েছেন, তার ফতওয়া কুরআন ও হাদিসের বিপরীত তবুও আপনি বললেন- না-না, তিনি বড় আলেম, আমি তাকে অনুসরণ করব, তবে এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের আলোকে কারও বিপরীতে প্রমাণ পাওয়ার পর এবং তার ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে অনুসরণ করার নাম হলো তাকলীদ।" নাউযুবিল্লাহ

ডা. জাকির নায়েক "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন-

what's the meaning of Taqlid? Taqlid means....Following the opinion of the scholar does not make you in the format of Taqlid, does not make you Muqallid. If after showing proof that the scholar you are following is wrong and then you follow him. Yes, that makes you a Muqallid.

-"তাকলীদের অর্থ কী? তাকলীদের অর্থ হলো, কোনো স্কলারের বক্তব্য গ্রহণ করা আপনাকে মুকাল্লিদ বানাবে না। আপনি যাকে অনুসরণ তাকে ভুল প্রমাণিত করার পরও যদি আপনি তার অনুসরণ করেন তাহলে এটিই আপনাকে মুকাল্লিদ বানাবে।"

{ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, (unity, part-3, 4.49) http//qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-de-zakir-naik/}

ডা. জাকির নায়েক এখানে তাকলীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন পৃথিবীর কেউ এ ধরনের সংজ্ঞা দেয়নি। কেননা কারও ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে তার সে বিষয়টি অনুসরণ করা জায়েয নয়। চার ইমাম বা অন্য কোনো মুজতাহিদ যদি ভুল করেন এবং সেটি যদি সুস্পষ্টভাবে ভুল প্রমাণিত হয়, তবে তার সে ভুল বিষয়টির উপর আমল করা অন্যদের উপর জায়েয নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। ইসলামী শরিয়তে ভুলের অনুসরণ বৈধ বলা যাবে এটি কল্পনা করাও অসম্ভব।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কুরআন ও হাদিসের আলোকে ভুল "প্রমাণিত" হওয়া আবশ্যক। এখন যে কেউ তার মতের বিরুদ্ধে কোনো মাসয়ালা পেল আর সাথে সাথে সে বলে দিল যে, এটি ভুল, কারও এ ধরনের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়টি বর্তমানে অধিকাংশ লা-মাযহাবিদের মাঝে দেখা যায়, তারা কোনো একটি মাসয়ালা তাদের মতের বিরুদ্ধে গেলেই বলে দেয় যে, এটি ভুল। অমুক ইমাম এটি ভুল করেছেন। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ ভুলটি সংশ্লিষ্ট আলেমের নয়, তার নিজের বুঝের ভুল। নিজের অজ্ঞতাকে সে আলেমের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে এ রোগটি এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, একে দুরারোগ্য ব্যাধি বললেও ভুল হবে না। শরিয়তের বিষয়ে সামান্য জ্ঞান রাখে না এমন ব্যক্তিরা দু-একটি বই পড়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় যে, ইসলামে অমুক অমুক ভুল আছে, বড় বড় ইমামগণ অমুক অমুক ভুল করেছেন। এগুলো সংশোধন করা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে এ ধরনের মূর্খ গবেষকের অভাব নেই।[২৯১] উদাহারণ হিসেবে বলা যায়, কাজী জাহান মিয়া তার 'আল-কোরআন দ্য চালেঞ্জ, সমকাল পর্ব-১ এ ইয়াজুজ মা'জুজ দ্বারা বর্তমান সময়ে গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকাকে উদ্দেশ্য নিতে গিয়ে ইয়াজুজ মা'জুজ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদিসের সকল বর্ণনা অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"প্রচলিত ধারণায় ইয়াজুজ-মাজুজের পৃথিবীতে আগমন (মডেল) কোরআনের ব্যাখ্যাকারী ও হাদিসবেত্তাগণ একটি অতি প্রাকৃতিক উদ্ভট জীবের কল্পনা করেছেন, যারা মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার প্রত্যয়ে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে। এ ধারণা মিথ্যা। কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা কুরআনের উপর কোনো দায় সৃষ্টি করে না। দায়টি ব্যাখ্যা কারীকারীদের ই- মাত্র।" (আল-কোরআন দ্য চালেঞ্জ, সমকাল পর্ব, পৃষ্ঠা , ৬৬, মদীনা পাবলিকেন্স থেকে প্রকাশিত।) সুতরাং ডা. জাকির নায়েক যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন এ সংজ্ঞা কোন গ্রহণযোগ্য আলেম দেননি। এটি ডা.জাকির নায়েকের পক্ষ থেকে মনগড়া রচনা এবং ভয়ংকর ধোঁকাবাজী।

তাক্বলীদের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখা আবশ্যক-

২৯১. বর্তমানে ডা. জাকির নায়েক এ ধরনের ব্যক্তিদের অন্যতম বলা যায়।

১. দ্বীনের মৌলিক আক্বীদার ক্ষেত্রে অন্যের তাক্বলীদ করা বৈধ নয়।[২৯২]

অকাট্য সুস্পষ্ট এবং মুতাওয়াতির বিষয়ের ক্ষেত্রেও অন্যের তাক্বলীদের কোনো সুযোগ নেই।

অকাট্য দলিল যদি এমন সুস্পষ্ট হয় যার বিপরীত কোন দলিল নেই তবে সে ক্ষেত্রেও তাক্বলীদের কোনো সুযোগ নেই।

যার তাক্বলীদ করা হয় তাকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করা কিংবা তা সুস্পষ্ট ভুল বিষয়কে শুধু গোঁড়ামিবশত আঁকড়ে থাকা শরিয়ত সম্মত নয়। ভুল যার থেকে প্রমাণিত হোক, ভুল বিষয়ে তাক্বলীদ শরিয়তে বৈধ নয়। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহের অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য কিংবা একাধিক অর্থপূর্ণ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রেই কেবল তাক্বলীদ স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে যারা মুজতাহিদ রয়েছেন কেবল তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য এবং সর্বসাধারণ যারা মুজতাহিদ নয় তাদের কথা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয় বরং সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, এ সমস্ত ক্ষেত্রে মুজতাহিদের তাক্বলীদ করবে।

তাকলীদ নিয়ে আরেকটি জালিয়াতি ঃ

পাঠকবৃন্দ! এ পর্যন্ত তাক্বলীদের সংজ্ঞা আলোকপাত করলাম তাতে বুঝতে পারলাম কোনো দলিলের দিকে না তাকিয়ে মুজতাহিদের ইজতিহাদকৃত মাসয়ালার উপর আমল করা কে তাক্বলীদ বলে। অনুসারীদেরকে মুকাল্লিদ বলে। অথচ ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"যদি দেখেন আপনার ইমাম ভুল করেছেন তারপর সেটা শুধরে দিলেন; তখনও আপনি মুকাল্লিদ থাকবেন।"**[২৯৩] তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ইমামের ফাতওয়া মানলে এটা অনুসরণকারী কে মুকাল্লিদ বলা যাবে না বরং তার সঠিক ফাতওয়া মানলে আর বাকী কিছু ভুল ফাতওয়াগুলো শুধরে দিয়ে আমল করলে মুকাল্লিদ হবে। নাউযুবিল্লাহ!

অথচ এ ধরনের সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত কোনো মুহাদ্দিস, ফকিহ, অভিধানবিদ কেউই দেননি।

পাঠকবৃন্দ! ইমামের ফাতওয়া ভুল করা নির্ণয় করতে পারবেন যে একজন মুজতাহিদ; কিন্তু আমজনতা সে কিভাবে নির্ণয় করবেন বলেন? পাঠকবর্গ তাহলে যে জাকির নায়েক, শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াত, উসূলে ফিকহ, উলূমে কুরআন, উসূলে হাদিস, ইলমে নাহু প্রভৃতি জ্ঞানের ধারে কাছেও নেই সে কিভাবে ভুল ধরবেন চার

২৯২. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা" দেখুন।

২৯৩. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৯০পৃ.

মাযহাবের সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামদের? আল্লাহ আমাদেরকে তার ফিতনা থেকে হিফাযত করুন।

৬৮. ইমামদের ইখতিলাফ বা মতভেদকে দল সৃষ্টির সাথে তুলনা ঃ

ইসলামে মতানৈক্য বা মতভেদ ঃ ডা. জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কোরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজি বা দলাদলির অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে পবিত্র কোরআনের দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং দুটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে চার মাযহাবকে কোরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আয়াত দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামে মতানৈক্য বা মতভেদ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আরবী ভাষায় 'মতানৈক্য বা মতপার্থক্য' বোঝাতে 'ইখতিলাফ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আর ইখতেলাফের পারিভাষিক অর্থ হলো,

الاختلاف والمخافة ان ينهج كل شخص طريقا مغاير اللاخر فى حاله او فى قوله

"ইখতিলাফ বা মতানৈক্য হলো, বিশেষ কোনো অবস্থা কিংবা বক্তব্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিপরীত বিষয়টি গ্রহণ করা।"

মতানৈক্য বা মতপার্থক্য একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আল্লাহ পাক মানুষের বর্ণ, ভাষা, চাহিদা-রুচি সবক্ষেত্রে ভিন্নতা দিয়ে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব বিবেচনা বুঝশক্তি। বুদ্ধি-বিবেচনার পার্থক্যের কারণে মানুষের চিন্তাচেতনায় সেই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যে ক্ষেত্রে মতানৈক্য আবশ্যক বা ফরয। কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যে ক্ষেত্রে মতানৈক্য হারাম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতানৈক্য বৈধ সীমার মধ্যে থাকে। কোনো ক্ষেত্রে মতানৈক্যই কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে বিষয়টির ব্যাপকতার কারণে প্রত্যেক বিষয়ের মতানৈক্যের সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

প্রবৃত্তিতাড়িত মতানৈক্য ঃ

কখনও মতানৈক্য মানুষের প্রবৃত্তির তাড়নায় সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে যেহেতু প্রবৃত্তির ইচ্ছাই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, এজন্য এ ধরনের মতানৈক্য কল্যাণকর কিছু থাকে না। এ সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো,

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বলেছেন,

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

"ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না"

পবিত্র কোরআনের সূরা আন-আমের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"হে নবী! আপনি বলুন, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না, আর যদি আমি তোমাদের প্রবৃত্তির

অনুসরণ করি, তবে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ব। অথচ আমি হেদায়াতপ্রাপ্তদের একজন।"

যেহেতু স্বেচ্ছাচারিতা ও নফসের কামনার বহুবিধ দিক রয়েছে এবং এর উৎস প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়, এজন্য বিষয়টি খুবই নাজুক। বাহ্যিক কিছু নিদর্শনের সাহায্যে বিষয়টি নিরূপণ করা সম্ভব। যেমন–

১. মতানৈক্যের বিষয়টি সরাসরি কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের বিরোধী হওয়া। (যেখানে দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ নেই)

২. পূর্বসূরিদের অনুসৃত পথ, যার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই, সে ব্যাপারে বিপরীত বক্তব্য পেশ করা, যার কোনো প্রমাণ সরাসরি কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস কোনোটিতে বিদ্যমান নেই।

৩. সুস্থ বিবেক যে বিষয়টি অসম্ভব ও অবৈধ মনে করে। যেমন–এমন মতবাদ, যাতে যেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মতানৈক্য

যে মতাক্যে মানুষের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকে না। বরং যা নিরেট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে ক্ষেত্রে কারও স্বার্থচিন্তার লেশমাত্রও থাকে না–এ ধরনের বিষয়ে মতানৈক্য করা আবশ্যক। যেমন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে একজন মুসলমানের মতানৈক্য। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতির সাথে একজন মুসলমানের মতানৈক্য আবশ্যক। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার শিথিলতার কোনো অবকাশ নেই।

মনে রাখতে হবে, তাদের সাথে মতানৈক্যের অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ রয়েছে। তারা তাদের কুফরী, শিরকী, বিদআতী আক্বীদা ত্যাগ করে ইসলামের সুস্পষ্ট বাণীকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। বরং মতানৈক্যের মূল বিষয় হলো, ইসলামের সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস এবং তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের মাঝে।

দোদুল্যমান মতানৈক্য

যে সমস্ত বিষয়ে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ উভয়ের সম্ভাবনা থাকে যেমন শাখাগত মাসআলা-মাসাইলের মাঝে ইখতেলাফ, এ ধরনের মতানৈক্য দোদুল্যমান। এখন যদি মতানৈক্য দলিলের দাবি অনুযায়ী, তার আদব এবং সুনির্দিষ্ট মূলনীতির আলোকে হয়ে থাকে এবং দলিলের আলোকে সত্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং ইসলামী আইনশাস্ত্রের বহুমুখী সম্ভাবনার একটি উত্তম উৎস হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি কোনো মূলনীতি اصول ছাড়া, ইখতেলাফের আদব রক্ষা ছাড়া, এ ধরনের মতানৈক্য করা হয়, তবে অবশ্যই তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হবে।

ফিকহশাস্ত্রে অসংখ্য মাসআলায় উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন নামাযে সূরা ফাতেহা শেষে জোরে আমিন বলা, ইমামের পিছে মুক্তাদীর ক্বিরাত পড়া, রক্ত বের হলে ওযু ভাঙা ইত্যাদি।

এ সমস্ত বিষয়ের মতভেদ দোদুল্যমান। কেননা সাধারণভাবে এটি প্রশংসনীয়। কিন্তু কেউ যদি অন্যকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে কিংবা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে এ ধরনের মতানৈক্যে লিপ্ত হয়, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয় হবে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, মতানৈক্যের যে সমস্ত আদব রয়েছে, সেগুলো রক্ষা করা হচ্ছে কি না। যদি মতানৈক্যের আদব রক্ষা না করে মতানৈক্য করা হয়, তবে এ ধরনের মতানৈক্য গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখনই সে মতানৈক্যের মাঝে অমূলক উক্তি ও শিষ্টাচারবহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করবে, তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মূলত এ মতানৈক্য নয়। বরং এটি প্রবৃত্তি পূজার অংশ। যেমন– আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ তার বিখ্যাত কিতাব, আসারুল হাদিস শরীফ-এর ভূমিকায় লিখেছেন, এক লা-মাযহাবী যুবক তার নিকট এসে মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইলে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে এবং বড় বড় আলেমদের নাম বিকৃত করে উচ্চারণ করতে থাকে। যেমন, আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.)-এর নাম সে ব্যঙ্গ করে, ইবনুল হাম্মাম (বাথরুমের ছেলে) বলে।

অতএব, শাখাগত মাসআলা-মাসাইলে মতভেদের ক্ষেত্রে আবশ্যকভাবে মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে। শাখাগত মাসআলায় মতভেদ যদি মুসলমানদের মাঝে হিংসা-দ্বেষ ও পারস্পারিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।

একটি ভুল সংশোধন :

বাংলাদেশে ইসলামের মূল ইবাদাতে শাখাগত মাসআলায় কোনো মতানৈক্য নেই। কারণ বাংলাদেশ কেন উপমহাদেশের সকল মুসলমানই হানাফী। তারা সকলে

ইসলামের মূল ইবাদাতসমূহের শাখাগত বিষয়ে একই পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে শত শত বছর ধরে। উলামায়ে কেরাম এর গবেষণা করে কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল জেনে অটল অবিচলভাবে একই পদ্ধতিতে দ্বীন পালন করে আসছেন। শত শত বছর ধরে চলে আসা এহেন মহা ঐক্যের মধ্যে যদি কেউ এসে নতুন চিন্তা চেতনা ও আমলের পদ্ধতির প্রচার চালায় এবং ওসব বিষয়কে হাতিয়ার বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে চায়, তা হবে একান্তই পরিকল্পিতভাবে একপক্ষীয় ফেরকাবাজি করা। যদি উপমহাদেশের মুসলমানগণ তাদের এহেন ফেরকাবাজি থেকে মুসলমানদের রক্ষাকল্পে কোরআন-হাদীস ও শরীয়তের দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে, তা হবে এ দেশের মুসলমানদের জন্য দ্বীনি দায়িত্ব পালনে সচেতনতা। কারণ এসব হলো মুসলমানদেরকে ফেরকা সৃষ্টি থেকে বাঁচানো।

উসুলে দ্বীন বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতপার্থক্য ঃ

দ্বীনের যে সমস্ত বিষয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোর ব্যাপারে মতানৈক্য বা মতপার্থক্যের কোনো সুযোগ নেই। অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত এ সকল বিষয়ে যেই দ্বিমত পোষণ করবে, সেই কাফের হয়ে যাবে। উদাহরণ :

১. আল্লাহর অস্তিত্ব।
২. আল্লাহর একত্ববাদ।
৩. আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস।
৪. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।
৫. ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস।
৬. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস।
৭. তাকদীরের ওপর বিশ্বাস। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় মৌলিক আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোর ব্যাপারে যদি কেউ মতানৈক্য করে, তবে যে সঠিক অবস্থানে থাকবে, সে মু'মিন আর যে ভুল অবস্থানে থাকবে, সে কাফের।

অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত শাখাগত বিষয়

দ্বীনের শাখাগত যে সমস্ত বিষয় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত, এ সমস্ত বিষয়ে কেউ যদি মতানৈক্য করে, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে।

উদাহরণ :

১. নামায, রোযা, হজ, যাকাত এগুলো ফরয হওয়া।
২. যেনা হারাম হওয়া।
৩. মদ হারাম হওয়া ইত্যাদি।

শাখাগত মাসআলা - মাসায়েলে মতপার্থক্য

দলিল অস্পষ্ট থাকার কারণে শাখাগত মাসআলা- মাসায়েলে মতপার্থক্য সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা উম্মতের জন্য রহমত ও প্রশস্ততার কারণ।

এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যামানায় বনী কুরায়যার ঘটনা সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়া সাহাবীরা এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, তাদের মধ্যে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের বিষয়ে যে মতানৈক্য রয়েছে, যেমন, ইবাদাত, বিবাহ, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন, দান, রাজনীতি ইত্যাদি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক সাহাবী তার ইজতেহাদ অনুযায়ী আমল করবে।

ইসলামে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলে যে মতানৈক্য রয়েছে, এটি মূলত মুসলিম উম্মাহের জন্য রহমত ও প্রশস্ততার কারণ।

শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ

হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِهِ لا عُذْرَ لأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنِّي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ،

-"তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং তার ওপর আমল করা আবশ্যক। সেটি ত্যাগ করার ব্যাপারে কারও কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বিষয়টি আল্লাহর কিতাবে না থাকে, তবে আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে। যদি আমার পক্ষ থেকে কোনো সুন্নাত না থাকে, তবে আমার সাহাবীরা যা বলে তার ওপর আমল করবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকাতুল্য। তাদের মধ্য থেকে যাকেই অনুসরণ করবে, হেদায়াত পেয়ে যাবে। <u>আমার সাহাবীদের মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত।</u>"[২৯৪]

---

২৯৪. ইমাম বায়হাকী : আল মাদখাল : ১/১৬২পৃ. হাদিস : ১৫২, সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ৪৬ পৃ. হাদিস নং : ৩৯, মানাবী : ফয়জুল কদীর : ১/২১২পৃ. হাদিস ঃ ২২৮, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৭৫পৃ. হাদিস : ১৫৩ ও ১/১৫০পৃ. হাদিস ঃ ৩৮১, আল্লামা ইমাম দায়লামী : মুসনাদিল ফিরদাউস,১/২২৫পৃ., সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/১৮পৃ. হাদিস ঃ ২৮৮, আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী,কানযুল উম্মাল, ১/১৯৯পৃ. হাদিস ঃ ১০০৩, ইবনে হাজার আসকালানী, তালখিসুল হবির, ৪/৪৬২পৃ. ক্রমিক.২০৯৮, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ২২/৭৫পৃ, হাদিস ঃ ২৪৩৫৫, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/১৬০পৃ. হাদিস ঃ ৬৪৯৭, ইবনে আসাকীর,তারীখে দামেস্ক, ২২/৩৫৯পৃ. হাদিস ঃ ২৬৯৫, যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ৭/৪৬৯পৃ., আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ, ১/১৩৬পৃ. হাদিস ঃ ৫৯, ইমাম যুবাইহিদী : ইত্তাহাফুস-সাদাতুল মুত্তাকীন : ১/২০৪ পৃ.

১. আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রাহিমাহুল্লাহ) "জামিউল বয়ানিল ইলমি ওয়াফাদ্বলিহি" নামক কিতাবে লিখেছেন,

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْمَالِهِمْ، لَا يَعْمَلُ الْعَالِمُ بِعَمَلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَأَى أَنَّهُ فِي سَعَةٍ

-"তাবেঈ ইমাম কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবি বকর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর **সাহাবীগণের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে,** আল্লাহ তা'য়ালা তার মাঝে মানুষের উপকার নিহিত রেখেছেন। সাহাবীদের কোনো একজনের আমল অনুযায়ী কেউ যদি আমল করে, তবে সে ব্যাপক প্রশস্ততা দেখতে পাবে।"[২৯৫]

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «مَا أُحِبُّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ فِي ضِيقٍ وَإِنَّهُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِهِمْ وَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ كَانَ فِي سَعَةٍ-

-"ইসলামের ৫ম খলিফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম মতপার্থক্য না করুক, এটি আমি পছন্দ করি না। কেননা যদি একটি মত থাকত, তবে মানুষ সংকীর্ণতায় নিপতিত হতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ হলেন, হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমাম; যাঁরা আমাদের অনুসরণীয়। কেউ যদি তাদের কোনো একজনের কোনো বক্তব্যের ওপর আমল করে, তবে সে ব্যাপক প্রশস্ততার মাঝে থাকবে।"[২৯৬] অন্য বর্ণনায় ইমাম সাখাবীও ইমাম আজলূনী এবং ইমাম সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ) রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণনা করেছেন-

عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله،

২৯৫ . জামেউল বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী লি ইবনে আব্দিল বার, ২/৯০০পৃ. হা. ১৬৮৬, দারু ইবনে যওজী, মক্কাতুল মুকাররামা, সৌদিআরব, প্রথম প্রকাশ.১৪১৪হি., ইমাম সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ৭০পৃ. হাদিস ঃ ৩৯, ইরাকী, তাখরিজে ইহইয়াউল উলূম, ১/১০৭পৃ.

২৯৬ . জামেউল বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী লি ইবনে আব্দিল বার, ২/৯০১পৃ. হা. ১৬৮৯, দারু ইবনে যওজী, মক্কাতুল মুকাররামা, সৌদিআরব, প্রথম প্রকাশ.১৪১৪হি., ইমাম সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ৭০পৃ. হাদিস ঃ ৩৯, সুয়ূতী, আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ, ১/৪৪পৃ. হাদিস ঃ ৬, ইরাকী, তাখরিজে ইহইয়াউল উলূম, ১/১০৭পৃ.

-"হযরত আফলাহ ইবনে হুমায়দ (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি তাবেয়ী কাসেম বিন মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর সাহাবীদের মতপার্থক্য রহমত স্বরূপ।"[২৯৭]

حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل توسعة. وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا،

-"বিখ্যাত ফকিহ হযরত লাইস বিন সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) তিনি হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বর্ণনা করেন তিনি বলেন, **"উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য প্রশস্ততার কারণ। যুগে যুগে মুফতীগণ (দলিলের ভিত্তিতে) মতানৈক্য করেছেন।** সুতরাং কারও নিকট একটি বিষয় জায়েয, অপরের নিকট তা হারাম; অথচ তারা একে অপরকে এ কারণে দোষারোপ করেন না।"[২৯৮]

وقال ابن عابدين : الاختلاف بين المجتهدين فى الفروع-لامطلق الاختلاف- من اثار الرحمة فان اختلافهم توسعة للناس- قال : فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر-

-"ইমাম ইবনু আবিদীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে দুজন মুজতাহিদের মধ্যকার মতপার্থক্য রহমতস্বরূপ। অন্যান্য বিষয়ের মতানৈক্য এর ব্যতিক্রম। কেননা শাখাগত মাস'আলায় মতানৈক্য হওয়াটা মূলত মানুষের জন্য প্রশস্ততার দ্বার উন্মোচন।" (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন ১/৪৬, রাদ্দুল মুহতার ১/১৬৮)

তিনি আরও বলেন, সুতরাং মাস'আলা-মাসায়েলে মতপার্থক্য যত বেশি হবে, রহমতের ধারা তত ব্যাপক হবে।"

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, হাফেযে হাদীস আল্লামা জালালুদ্দিন সূয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন-

اعلم أن اختلاف المذاهب فى الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة وله سر لطيف أدركه العالمون وعمى عنه الجاهلون حتى سمعت بعض الجهال يقول : النبى صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد فمن أين مذاهب أربعة!

২৯৭ . ইমাম সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ৭০পৃ. হাদিস ঃ ৩৯, ইরাকী, তাখরিজে ইহইয়াউল উলূম, ১/১০৭পৃ.

২৯৮ . ইমাম সাখাবী, মাকাসিদুল হাসানা, ৭০পৃ. হাদিস ঃ ৩৯, আজলূনী, কাশফুল খাফা ১/৭৩ হা. ১৫৩, সুয়ূতী, আদ্দুররুল মুনতাসিরাহ, ১/৪৪পৃ. হাদিস ঃ ৬, ইরাকী, তাখরিজে ইহইয়াউল উলূম, ১/১০৭পৃ.

"মুসলিম উম্মাহের মাঝে বিভিন্ন মাযহাব থাকা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত এবং এর তাৎপর্য ও মর্যাদাও ব্যাপক। বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টির মাঝে সূক্ষ্ম রহস্য নিহিত আছে, যা আলেমগণ অনুধাবন করে থাকেন এবং অজ্ঞ লোকেরা এ ব্যাপারে অন্ধ থেকে যায়। এমনকি আমরা কোনো কোনো মূর্খ লোকের মুখে শুনে থাকি, হুজুর (সা.) এক শরীয়ত নিয়ে এসেছেন। সুতরাং চার মাযহাব কোত্থেকে উদয় হলো?" (জাযিলুল মাওয়াহিব ফি ইখতিলাফিল মাযাহিব, পৃষ্ঠা-২৫)

তিনি আরও বলেন,

وقد وقع الاختلاف فى الفروع بين الصحابة (رضى الله عنهم و ارضاهم) وهم خير الأمة فما خاصم أحد منهم أحد أحدا ولانسب أحد أحدا الى خطا ولا قصور-

-"সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে; অথচ তারা উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানব। তারা একে অপরের সাথে এ বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হতেন না এবং কেউ কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেন না এবং এক সাহাবী আরেক সাহাবীকে ভ্রান্ত কিংবা ত্রুটিযুক্ত মনে করতেন না।" (প্রাগুক্ত)

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতানৈক্য রয়েছে, সেটি উম্মতে মুসলিমার জন্য রহমতস্বরূপ। **অথচ ডা. জাকির নায়েক দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্য এবং শাখাগত বিষয়ে মতানৈক্যকে একই পাল্লায় মেপেছেন এবং উভয়টিকে হারাম মনে করেছেন।** ফলশ্রুতিতে তিনি মাযহাবী মতানৈক্যকেও হারাম মতানৈক্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন, যা একটি চরম ভ্রান্তি। ইসলামী শরিয়তে হালালকে কোন বিধান কে হারাম বলা কুফুরী; কিন্তু ডা. জাকির নায়েকে এখন শরিয়তের কষ্টি পাথরে কী হবেন?

শাখাগত বিষয়ে সাহাবীদের মাঝে মতভেদ

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে শাখাগত বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলে মতপার্থক্য ছিল। এখানে এ ধরনের মতপার্থক্যের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

২. তাকবীরে তাশরীকের ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝে মতভেদ ছিল। (আল-ফাতাওয়া আল- হিন্দিয়্যা (ফতোয়ায়ে আলমগীর, খ-৩, পৃষ্ঠা-১৮৫)

৩. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিবাহ করা যাবে কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ ছিল।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাশাহুদ ভিন্ন।

৫. আমীন আস্তে বলা, জোরে বলা নিয়ে মতভেদ ছিল।

৬. হাত উঠানো, না উঠানোর বিষয়ে মতভেদ ছিল।

৭. কোনো কোনো সাহাবী নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন, কোনো কোনো সাহাবী নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তেন না। [ইবনে তাইমিয়া, মাযমাউল ফাতাওয়া]

৮. কোনো কোনো সাহাবী নামাযে জোরে আওয়ায করে "বিসমিল্লাহ" পড়তেন, কোনো কোনো সাহাবী আস্তে আওয়ায করে বিসমিল্লাহ পড়তেন। কেউ কেউ ফজরের নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়তেন, কেউ কেউ তা পড়তেন না। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৪০৩)

৯. কোনো কোনো সাহাবী সিঙ্গা, বমি ইত্যাদিতে ওযু করতেন, কোনো কোনো সাহাবী ওযু করতেন না। [মাজমুউল ফাতাওয়া, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫]

১০. কোনো কোনো সাহাবী পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে এবং কামোত্তেজনাসহ মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে ওযু করতেন, কোনো কোনো সাহাবী ওযু করতেন না। [মাজমাউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৫২৪]

১১. কোনো কোনো সাহাবী আগুনে জ্বালানো খাবার খেলে ওযু করতেন কোনো কোনো সাহাবী করতেন না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০১, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, পবিত্রতা অধ্যায়)

১২. কোনো কোনো সাহাবী উটের গোশত খেলে ওযু করতেন, কোনো কোনো সাহাবী করতেন না। [মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৭৫]

শাখাগত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে মতভেদ দূর করা অসম্ভব

ডা. জাকির নায়েকসহ অপরাপর লা-মাযহাবীরা মনে করে থাকেন, মাযহাবের অনুসরণ পরিত্যাগ করে সরাসরি কোরআন ও হাদীস মানলে হয়তো কোনো মতপার্থক্য থাকবে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা বাস্তবতার বিপরীত। চার ইমাম যেমন স্বেচ্ছায় কোনো মাসআলায় মতপার্থক্য করেননি বরং দলিলের দাবি অনুযায়ী তাদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে, তেমনি হক্বপন্থী কোনো আলেমই স্বেচ্ছায় মতপার্থক্য করেন না। সুতরাং এ ধারণা পোষণ করা অমূলক যে, আধুনিক টেকনোলজির যুগে সমস্ত কিতাবাদি আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে, সুতরাং বর্তমানে কোনো মতানৈক্য হবে না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো- লা-মাযহাবীর দাবিদার, যারা সব মাযহাব ভেঙে নিজেদের বানানো আধুনিক মাযহাবের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে তাদের বিখ্যাত তিন আলেম শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়েখ সালেহ আল-উছাইমিন এবং শায়েখ নাসীরুদ্দিন আলবানী এর মাঝে অসংখ্য মাসআলায় মতপার্থক্য। নিম্নের এ ধরণের কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো–

মাসআলা	ইবনে বায	ইবনে উছাইমিন	আলবানী
দাড়ি এক মুষ্টির বেশি হলে তা কাটার হুকুম	কোনো অবস্থাতেই দাড়ি কাটা জায়েয নয়, যদিও তা এক মুষ্টির বেশি হয়।	কোনো অবস্থাতেই দাড়ি কাটা জায়েয নয়।	সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগ থেকে প্রচলিত সুন্নাত হলো, দাড়ি এক মুষ্টির বেশি হলে, তা কেটে ফেলা।
মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার হুকুম	যে সমস্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা হয়, তাদের চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে। অন্যথায় তা পবিত্র হবে না।	যে সমস্ত প্রাণী জবাই করার দ্বারা হালাল হয়, সে সমস্ত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে। অন্যথায় তা পবিত্র হবে না।	যেকোনো চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হবে, যদিও তা শূকরের চামড়া হোক।
ওযুতে বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম।	উচ্চারণসহ ওযুতে বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব।	বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত।	বিসমিল্লাহ পড়া ওয়াজিব।
ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষার হুকুম	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়।
নাপাকি অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করার হুকুম।	নাপাকি ছোট হোক কিংবা বড়, কোনো অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়।	কোনো অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়।	যেকোনো নাপাকি অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা জায়েয।
অবজ্ঞা কিংবা অলসতাবশত নামায তরক কারীর হুকুম।	সুনিশ্চিতভাবে কাফের হয়ে যাবে।	সাধারণভাবে নামায তরককারী মুরতাদ হয়ে যাবে।	অলসতাবশত নামায তরককারী কাফের নয়।
মুক্তাদীর জন্য আমীন বলার হুকুম		ইমাম আমীন বললে মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।	ইমাম আমীন বললে মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা ওয়াজিব।
জোরে আওয়াযবিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম।	যেকোনো নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।	যেকোনো নামাযে মুক্তাদির জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।	মুক্তাদি শুধু আস্তে আওয়াযবিশিষ্ট নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে। জোরে আওয়াযবিশিষ্ট নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না। (কেননা এ হুকুমটি তাঁর নিকট রহিত)
পানাহার ব্যতীত অন্য কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের হুকুম।	পানাহারসহ কোনো কাজেইস্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয নয়।	পানাহার ব্যতীত অন্যান্য কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয।	স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা হারাম। তবে পানাহার ব্যতীত অন্যান্য কাজে রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার জায়েয।

৪. চার মাযহাবে মূলত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে সাহাবীদের উক্তি, সাহাবীদের আমল, তাবেঈ ও তবেতাবেঈগণের উক্তি ও আমলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে বিষয়ে একমত (ইজমা) হয়েছেন, চার মাযহাব সেটিকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। একইভাবে সাহাবা, তাবেঈ ও তবেতাবেঈগণের মাঝে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে চার মাযহাবেও দেখা যায় সেক্ষেত্রে মতপার্থক্য বিদ্যমান। মূলত যে সমস্ত বিষয়ে চার মাযহাবে মতানৈক্য হয়েছে, তার অধিকাংশ মতভেদ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে ছিল। এখন যে সমস্ত তথাকথিত আহলে হাদীস বা সালাফীগণ মাযহাবীদেরকে গালি দিয়ে থাকেন, তাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, এই গালিটা মূলত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে দেওয়া হলো না, এটি স্বয়ং রাসূল (ﷺ) কে অথবা কোনো সাহাবী (রা.) কিংবা কোনো তাবেঈকে দেয়া হলো। কেননা চার ইমামের কোনো ইমামই প্রমাণ ছাড়া কোনো মাস'আলা প্রণয়ন করতেন না। সেই প্রমাণটি যদি রাসূল (সা.)-এর কোনো হাদীস হয়ে থাকে, তাহলে ইমামকে গালি দেয়ার অর্থ হলো, স্বয়ং রাসূল (সা.) কে গালি দেওয়া। আর যদি প্রমাণটি কোনো সাহাবী কিংবা কোনো তাবেঈর বক্তব্য হয়, তাহলে ইমামকে গালি দেওয়ার অর্থ হলো, সাহাবী কিংবা তাবেঈকে গালি দেওয়া।

৫. চার মাযহাব অনুসরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, "আমলে মুতাওয়ারিছা" তথা রাসূল (ﷺ)-এর যুগ, তার পরবর্তী যুগ ও তার পরবর্তী যুগ থেকে যে বিধানটি মানুষের মাঝে গৃহীত ও সমাদৃত হয়ে এসেছে, যার ওপর মানুষ আমল করে আসছে, চার ইমাম কুরআন ও সুন্নাহের পাশাপাশি এ আমলে মুতাওয়ারিছার প্রতি দৃষ্টি রেখেই মাস'আলা প্রণয়ন করেছেন। ইসলামে আমলে মুতাওয়ারিছার গুরুত্ব অপরিসীম।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) বলেছেন-

قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.

-"পূর্ববর্তীদের মতের অনুরূপ মত তোমরা গ্রহণ করো, কেননা তারা তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।" (ইবনে রযব হাম্বলী, ফাযলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪) ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) (ওফাত.৭৯৫হি.) বলেছেন,

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به

-"ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোনো একটি হাদীস সহীহ হলে তার ওপর তখনই আমল করেন, যখন কোনো সাহাবী, তাবেঈ, অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোনো একটি দল তার ওপর আমল করে। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে হাদীসের ওপর আমল না করার ওপর একমত হয়েছেন, তার ওপর আমল করা জায়েয নেই, কেননা তার ওপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তারা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন।"(ফাযলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ, পৃষ্ঠা-৪)

আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব "জামেউল বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহি" তে ইমাম মালেক (রহ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন-

"ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, খলিফা আবু জা'ফর মানসুর যখন হজ সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, আমি সেগুলোর উত্তর প্রদান করলাম। খলিফা আবু জা'ফর মানসুর বললেন-

فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَزَمْتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبِكَ هَذِهِ الَّتِي وَضَعْتَهَا – يَعْنِي الْمُوَطَّأَ – فَتُنْسَخُ نُسَخًا ثُمَّ أَبْعَثُ إِلَى كُلِّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا نُسْخَةً وَآمُرُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فِيهَا لَا يَتَعَدَّوْنَ إِلَى غَيْرِهِ , وَيَدَعُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ الْمُحْدَثِ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْلَ الْعِلْمِ رِوَايَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعِلْمَهُمْ

"আমি সংকল্প করেছি, আপনার লিখিত এই কিতাব অর্থাৎ মুয়াত্তার অনেকগুলো অনুলিপি তৈরি করার নির্দেশ দেব, তারপর মুসলমানদের প্রতিটি শহরে একটি করে অনুলিপি পাঠিয়ে দেব। আমি তাদেরকে আদেশ করব যে, তারা যেন এ কিতাবে যা সংকলন করা হয়েছে, শুধু তার ওপরই আমল করে এবং অন্য কোনো কিছু গ্রহণ না করে। এবং এ কিতাবের ইলম ব্যতীত অন্য কোনো ইলম গ্রহণ না করে। কেননা আমি দেখেছি, ইলমের মূল হলো, মদীনাবাসীর বর্ণনা ও তাদের ইলম।"

খলিফা আবু জা'ফর মানসুরের এ কথা শুনে ইমাম মালেক (রহ.) তাঁকে বললেন,

فَقُلْتُ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيلُ وَسَمِعُوا أَحَادِيثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ وَعَمِلُوا بِهِ وَدَانُوا بِهِ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ أَصْحَابَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرَهُمْ، وَإِنْ رَدَدْتَهُمْ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدٌ، فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَمَا اخْتَارَ كُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ لِأَنْفُسِهِمْ، فَقَالَ: لَعَمْرِي لَوْ طَاوَعْتَنِي عَلَى ذَلِكَ لَأَمَرْتُ بِهِ

-"আমিরুল মুমিনীন! আপনি এটি করবেন না! কেননা মানুষের নিকট পূর্বেই অনেক মতামত পৌঁছেছে, তারা অসংখ্য হাদীস শ্রবণ করেছে, অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট যে ইলম পৌঁছেছে, তারা তা গ্রহণ করেছে এবং তার ওপর আমল করে এসেছে। সাহাবা (রা.) ও অন্যদের মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোকে তারা তাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে বিরত রাখা কঠিন। অতএব মানুষকে আপনি তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিন এবং প্রত্যেক শহরের অধিবাসীরা যা গ্রহণ করেছে তার ওপর তাদেরকে থাকতে দিন।"

খলিফা বললেন, "আমার জীবনের শপথ! তুমি যদি আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে তবে আমি অবশ্যই তার নির্দেশ দিতাম।" (অর্থাৎ "মুয়াত্তা" নামক কিতাবের ওপর আমল করতে বাধ্য করতাম)।" (জামিউল বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদ্বলিহী, ১/৫৩২পৃ. হাদিস, ৮৭০)

"আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহী" নামক গ্রন্থে রয়েছে–একদা ঈসা ইবনে হারুন (রহিমাহুল্লাহ) আব্বাসীয় খলিফা মামুনের নিকট একটি কিতাব নিয়ে এলো, যাতে বেশ কিছু হাদীস লেখা ছিল। তিনি এসে বললেন,

هَذِهِ احاديث سَمِعتهَا مَعَك من المَشَايخ الَّذين كَانَ الرشيد يختارهم لك فقد صَارَت غاشية مجلسك الَّذين يخالفون هَذِه الْأَحَادِيث- يرِيد أَصْحَاب أبي حنيفَة فَإِن كَانَ مَا هَؤُلَاء عَلَيْهِ هُوَ الحق فقد كَانَ الرشيد فِيمَا كَانَ يخْتَار لك على خطأ- وَإِن كَانَ الرشيد على صَوَاب فَينْبَغِي لك أَن تَنْفِي عَنْك أَصْحَاب الخَطَأ

-"এই হাদীসগুলো আমি আপনার সাথে সে সমস্ত মুহাদ্দিসের নিকট থেকে শুনেছি, যাদেরকে হারুনুর রশিদ আপনার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। অথচ আপনার সভাসদবর্গ এ সমস্ত হাদীসের বিরোধিতা করে। (এর দ্বারা তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন) এখন এরা যদি সঠিক হয়, তবে খলিফা হারুনুর রশিদ আপনার জন্য যে সমস্ত মুহাদ্দিস নির্বাচিত করেছিলেন, তারা ভুল সাব্যস্ত হবে। আর যদি খলিফা হারুনুর রশিদ কর্তৃক নির্বাচিত মুহাদ্দিসগণ সত্যের ওপর থাকে, তবে এদেরকে আপনার দরবার থেকে বের করে দেয়া উচিত।" (যাহাবী, আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহী, ১/১৪৮পৃ.)

অতঃপর বাদশাহ মামুন কিতাবটি তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করে বললেন,

لَعَلَّ لِلْقَوْمِ حُجَّةً وَأَنَا سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

"হয়তো তাদের নিকট কোনো শক্তিশালী দলিল রয়েছে, এ সম্পর্কে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব।" অতঃপর তিনি ঈসা ইবনে হারুন (রহিমাহুল্লাহ) প্রদত্ত কিতাবটি একের পর এক তিন ব্যক্তিকে দিলেন। কেউ তাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। সংবাদটি ঈসা ইবনে আবান (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি ইতিপূর্বে খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারে আসতেন না।[২৯৯] এ ঘটনা শুনে তিনি "আল-হুজ্জাতুস সগির" নামে একটি কিতাব রচনা করেন, যাতে তিনি হাদীসের প্রকারভেদ, হাদীস কিভাবে বর্ণিত হয় এবং কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য এবং কোন হাদীস পরিত্যাজ্য, পারস্পরিক বিরোধী হাদীসের মুখোমুখি হলে আমাদের করণীয় কী এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তিনি উল্লেখ করেন, অতঃপর প্রত্যেক হাদীসের জন্য একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ তৈরি করেন এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব, তার দলিল, এতদসম্পর্কিত হাদীস ও কিয়াস উল্লেখ করেন।
কিতাবটি খলিফা মামুনের হাতে পৌঁছলে তিনি কিতাবটি পাঠ করে বললেন,

هَذَا جَوَابُ الْقَوْمِ اللَّازِمُ لَهُمْ

"এটা তাদের পক্ষ থেকে সমুচিত জওয়াব।" অতঃপর তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন–

حسدوا الفتى إذا لم ينالوا سعيه

فاناس أعداء لها وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لزوجها

حسدا وبغيا: إنه لذميم

-"লোকেরা সেই যুবকের মর্যাদা ও উচ্চাসন লাভ করতে না পেরে তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে যেমন নারীরা হিংসা ও বিদ্বেষবশত তাদের সুন্দরী সতিনের মন্দচারিতা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে থাকে।"[৩০০]

এ চার মাযহাব সেই তিন যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেই তিন যুগ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

-"সর্বোত্তম মানুষ হলো, আমার যুগের মানুষ। অতঃপর পরবর্তীগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ।" (সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৩৪৫১, ৬০৬৫, ২৫০৯, ৬২৮২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৩)

---

২৯৯. যাহাবী, আখবারে আবি হানিফা ওয়া আসহাবি, ১/১৪৭পৃ. (শামিলা)
৩০০. যাহাবী, আখবারে আবি হানিফা ওয়া আসহাবি, ১/১৪৮পৃ. (শামিলা)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডাক্তার জাকির নায়েক তাঁর "ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ" শিরোনামের লেকচারে বলেছেন,

There is a Hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, Hadith number 2652, the prophet said: the best of the people are those of my time, means the companions, the Sahabas. After that the next generation. After that the next generation. The prophet said: the best people are those of my generation, the Sahabas. After that the next generation, the Tabieen, after that the next generation, Tabe-tabeen. Finish.

If you have to take anything, you have to take from the generation of the prophet, the companion, then the next generation Tabieen, and Tabe- tabieen. That's it. Three generation. These we call as the Salafe-Saleheen.

-"সহীহ বোখারী ২৬৫২ নং হাদীসে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ হলো, আমার যুগের মানুষ অর্থাৎ রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীগণ। অতঃপর পরবর্তীগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সর্বোত্তম মানুষ হলো, আমার যুগের মানুষ। অতঃপর তাদের পরবর্তী অর্থাৎ তাবেঈনগণ। অতঃপর তাদের পরবর্তী তবেতাবেঈগণ। ব্যস! যদি তোমার কিছু গ্রহণ করতে হয়, তবে তোমাকে রাসূলের (ﷺ)-এর সাহাবীদের থেকে কিংবা তাদের পরবর্তী তাবেঈনদের থেকে কিংবা তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেঈনদের থেকে গ্রহণ করতে হবে। এ তিন যুগের মানুষকে আমরা সালফে-সালেহীন (সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বুযুর্গ) বলে থাকি।"

ইউনিটি ইন দ্যা মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/va rious-public-lectures-by- dr-zak ir-naik/

ডাক্তার জাকির নায়েক বলেছেন, যদি তোমাকে কিছু গ্রহণ করতে হয়, তবে এ তিন যুগ থেকে গ্রহণ করতে হবে। আর এটা কারও অজানা নয় যে, চার মাযহাবই এ তিন যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের সামনে যে সমস্ত মাযহাব বা মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন সালাফী মাযহাব কিংবা যাহেরী মাযহাব এদের কোনোটিই চার মাযহাবের কোনো একটি মাযহাবের সমপর্যায়ের হওয়া তো দূরে থাক, তাদের সাথে কোনো দিক থেকে তুলনীয় হওয়ারও যোগ্য নয়। সুতরাং যে তিন যুগ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা রয়েছে, যাদের কথা গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ)-এর সুস্পষ্ট

হাদীস রয়েছে, বর্তমানের অযোগ্য কারও অনুসরণের চেয়ে তাদের কোনো একজনকে অনুসরণ করাটাই যুক্তিযুক্ত এবং আবশ্যক।

৭০. জাকির নায়েকের ভুয়া দাবি শুধু চার মাযহাব মানব কেন?

ডা. জাকির নায়েক বলেছেন- The Islamic world has produced several learned Islamic scholars (Imams), but out of these, four became more famous and their teachings spread in different parts of the world.

It is a misconception that a Muslim should follow any one of these four schools of thoughts i.e. Hanafi, Shafi, Hanbali or Maliki. There is no proof whatsoever in the Qur'an or any authentic Hadith that a Muslim should only follow one of these four Imams.

"বিশ্ব অনেক বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার বা ইমামদের জন্ম দিয়েছে এবং তাঁদের মাঝে চারজন বিখ্যাত হয়েছেন এবং তাঁদের শিক্ষা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন মুসলমানের জন্য এ চার মাযহাব অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, এগুলোর কোনো একটিকে অনুসরণ করতে হবে। অথচ কুরআন ও 'সহীহ' হাদীসের কোথাও নেই যে, চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করা উচিত।" http://www.irf.net/index.php? option= com_content&view=article&id=459%3 Awhich-school-of-thought-should-amuslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011& Itemid =199

এটি সর্বজনবিদিত যে, সাহাবী, তাবেয়ী, এবং তাবে তাবেঈর যুগে মুসলিম বিশ্বে অনেক বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিসীন ছিলেন। যাদের এক একজনই পৃথক পৃথক মাযহাবের ইমাম হওয়ার যোগ্য ছিলেন। মূলত ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে, এ তিন যুগে ইসলামের বিজয় ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে চরম উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অতুলনীয় উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ইসলামী আইন শাস্ত্র তথা ফিকহ শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সার কথা হলো, মুসলিম বিশ্বে যেমন চার ইমাম প্রসিদ্ধ, তেমনিভাবে অনেক ইমাম তাদের যুগে কিংবা তাদের পরবর্তী যুগে বর্তমান ছিলেন। তাহলে মুসলিম উম্মাহ কেন এ চার ইমামের কথাগুলোই গ্রহণ করল এবং অন্যান্য ইমামদের কথা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকল? অর্থাৎ আমরা শুধু চার ইমামকেই মানব কেন?"

আল্লামা কুরাফী (রহিমাহুল্লাহ) {ওফাত. ৯৫৪হি.} বলেন-

أَنْ التَّقْلِيدَ يَتَعَيَّنُ لِهَذِهِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ انْتَشَرَتْ وَانْبَسَطَتْ حَتَّى ظَهَرَ فِيهَا تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيصُ عَامِّهَا وَشُرُوطُ فُرُوعِهَا فَإِذَا أَطْلَقُوا حُكْمًا فِي مَوْضِعٍ وُجِدَ مُكَمِّلًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَتُنْقَلُ عَنْهُ الْفَتَاوَى مُجَرَّدَةً فَلَعَلَّ لَهَا مُكَمِّلًا أَوْ مُقَيِّدًا أَوْ مُخَصِّصًا لَوْ انْضَبَطَ كَلَامُ قَائِلِهِ لَظَهَرَ فَيَصِيرُ فِي تَقْلِيدِهِ عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ

-"কেবল চার মাযহাবের কোনো একটির মাঝেই তাকলীদ সীমাবদ্ধ থাকবে। চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ বৈধ নয়। কেননা, চার মাযহাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং এগুলো এত ব্যাপক হয়েছে যে, এর সাধারণ বিষয়সমূহকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, আম (ব্যাপক) বিষয়সমূহকে খাস (সুনির্দিষ্ট) করা হয়েছে। এবং এর শাখাগত মাসআলা-মাসাইলকেও সুনির্ধারিত করা হয়েছে। কোনো স্থানে যদি কোনো একটি মাসআলা সাধারণ থাকে, তবে অন্য স্থানে বিষয়টির পরিপূরক বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে কেবল তাদের ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থেকে যায়, হয়তো ফতোয়াটির কোনো পরিপূরক, নির্দিষ্টকারক অথবা কোনো নির্ধারক রয়েছে, যদি তার অন্যান্য বক্তব্যসমূহকে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হতো, তবে তা স্পষ্ট হতো। অতএব, এ ধরনের তাকলীদ বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থেকে যায়; কিন্তু চার মাযহাব এর ব্যতিক্রম। [মাওয়াহিবুল জালিল, ১/৩০পৃ.]

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন-

قد نبهنا على علة المنع من ذلك- أى من تقليد غير الأئمة الأربعة- وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط فرب ما نسب اليهم مالم يقولوه أو فهم عنهم مالم يريدوه وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة-

-"চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব অনুসরণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তার কারণ হলো, চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অনেক সময় তাদের দিকে এমন বিষয় সম্পৃক্ত করা হয়, যা তারা বলেনি, তাদের পক্ষ থেকে এমন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়, যা তারা উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি। আর তাদের মাযহাবসমূহ সংরক্ষণ এবং তাতে কোনো ভুল-ত্রুটি হলে, তা সংশোধন করার কেউ অবশিষ্ট নেই; কিন্তু চার মাযহাব এর ব্যতিক্রম। [আর রাদ্দু আলা মান ইত্তাবা গাইরাল মাযাহিবিল আরবা', পৃষ্ঠা-৩৪]

ইমাম আমিরুল হাজ্জ (রহিমাহুল্লাহ) (ওফাত.৮৭৯হি.) বলেন-

(مَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) وَهُوَ ابْنُ الصَّلَاحِ (مَنَعَ تَقْلِيدَ غَيْرِ) الْأَئِمَّةِ (الْأَرْبَعَةِ) أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -

-"মুতায়াখখিরীনগণ বলেন যেমন ইমাম ইবনে সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন চার মাযহাবের চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ)-এর ব্যতীত কারও মাযহাব অনুসরণ করা নিষেধ।" (আমিরুল হাজ্ব, তাক্বরীর ওয়াল তাহবীর, ৩/৩৫৪পৃ.) শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১৭৬হি.) বলেন-

قول ابن الصلاح لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة- الكتاب: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد

-"ইমাম ইবনে সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোনো পথ ও মত অনুসরণ বৈধ নয়।" (শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, আক্বদুল যিয়াদ ফি আহকামুল জিহাদ ওয়াল তাক্বলীদ, ১/৩০পৃ.) ইমাম আবু মুযাফ্ফার যাহলী শায়বানী (ওফাত.৫৬০ হি) বলেন-

وَقع إِجْمَاع الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة عَلَيْهَا،

-"চার মাযহাবের উপরে সবার ইজমা সংঘটিত হয়েছে।" (ইখতাফুল আইম্মাতুল উলামা, ১/১০৪পৃ.) আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন-

انه يشترط فى تقليد الغير أن يكون مذهبه مدونا محفوظا الشروط و مخالف الأربعة كمخالف الاجماع محمول على مالم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التى انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثورى و الأوزاعى و ابن أبى ليلى و غيرهم-

-"চার মাযহাব ব্যতীত অন্যদের মাযহাব অনুসরণের জন্য শর্ত হলো, তাদের মাযহাবসমূহ লিপিবদ্ধ থাকা এবং মাযহাবের শর্তসমূহ ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা সংরক্ষিত থাকা। আল্লামা সুবকি (রহিমাহুল্লাহ) যে বলেছেন, "চার মাযহাবের বিরোধিতার অর্থ হলো, ইজমার বিরোধিতা করা" এ বক্তব্য সে সমস্ত মাযহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো সংরক্ষিত নয়, যার শর্তসমূহ এবং অন্যান্য নীতিমালা অজানা। এ সমস্ত মাযহাবের কোনো অনুসারী বর্তমানে অবশিষ্ট নেই এবং তাদের মাযহাবের ওপর লিখিত কোনো কিতাবও পাওয়া যায় না। যেমন সুফিয়ান সাওরী (রহিমাহুল্লাহ), ইমাম আওযায়ী (রহিমাহুল্লাহ) ও ইবনে আবী লাইলা (রহিমাহুল্লাহ) সহ অন্যদের মাযহাব।" [বুলুগুল মুরাম, পৃষ্ঠা-১৮]

সুন্নি তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হলো, পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম জামা'আত। আর চার মাযহাব হলো, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন-

مَذْهَبَ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة

-"চার মাযহাব এবং অন্য ইমামগণের মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।" [আইনী, উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৮] আল্লামা শায়খ আব্দুল গণী নাবলুসী (রহ.) লিখেছেন,

واما تقليد مذهب من مذاهب الان غير المذاهب الأربعة فلا يجوز لا لنقصان فى مذاهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم لأن فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأئمة بل لعدم تدوين مذاهبهم وعدم معرفتنا الان بشروطها وقيودها وعدم وصول ذلك الينا بطريق التواتر حتى لو وصول الينا شيء من ذلك كذلك جازلنا تقليده لكنه لم يصل كذلك-

-"চার মাযহাব ব্যতীত বর্তমানে অন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ বৈধ নয়; অন্য কোনো মাযহাবে ত্রুটি থাকা কিংবা চার মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে নয়। কেননা অন্যদের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত খলিফাগণ রয়েছেন, যারা সমস্ত ইমামের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বরং অন্য কোনো মাযহাব আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার মূল কারণ হলো, তাদের মাযহাব আমাদের নিকট সুবিন্যস্ত অবস্থায় পৌছেনি। তারা কোন কোন্ মূলনীতি (উসূল) এবং কোন্ কোন্ শর্তের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস থেকে মাস'আলা বের করেছেন, তা আমাদের অজানা। এবং তা আমাদের নিকট "তাওয়াতুরের" পদ্ধতিতে পৌছেনি। আমাদের নিকট যদি এভাবে তাদের কোনো মাস'আলা পৌছে, তাহলে অবশ্যই তাদের অনুসরণ আমাদের জন্য বৈধ। কিন্তু মূলনীতিসহ আমাদের নিকট তাদের মাসআলা পৌছেনি। [খোলাসাতুত তাহকীক ফি বায়ানি হুকমিত তাকলীদ ওয়াত তালফীক, পৃষ্ঠা, ৬৮-৬৯]

আব্দুল গণী নাবলুসী (রহ.)-এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, চার মাযহাব অনুসরণের অন্যতম কারণ হলো, চার মাযহাবের মূলনীতিসমূহ ও শাখাগত মাসআলা-মাসাইলগুলো সুবিন্যস্ত অবস্থায় বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের নিকট পৌছেছে। কিন্তু অন্য কোনো মাযহাবের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এ ছাড়া চার মাযহাব অনুসরণের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো-

১. প্রত্যেক মাযহাবের জন্য মূলনীতি থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ ফিকহের কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হলো, মাসআলাটি কোন্ উসূলের আলোকে রচিত। কোনো মত বা মাযহাবের সঠিকতার মাপকাঠি ওই মাযহাবের মূলনীতি বা উসুলে ফিকহ। যে মাযহাবের উসুলে ফিকহ যত শক্তিশালী সে মাযহাবের অনুসরণ ততটা গ্রহণযোগ্য।

২. চার মাযহাবে একজন মুমিনের জন্ম থেকে কবরের দাফন-কাফনসহ পরবর্তী যত মাসআলা আছে, সংশ্লিষ্ট সকল মাস'আলার সমাধান রয়েছে। প্রত্যেকটি মাসআলা

আলাদা অধ্যায়ে, সুনির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো রয়েছে। একজন মুমিনের জীবন পরিচালনায় ইবাদাত, মু'আমালাত, মুআ'শারাত ও আখলাকিয়াত এক কথায় সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা এ চার মাযহাবের প্রত্যেকটিতে রয়েছে। অন্য কোনো মাযহাবে যা পাওয়া সম্ভব নয়।

৬৯. অধিকাংশ মুসলমান কী গোমরাহী বা ভুল পথে রয়েছেন?

মাযহাব মানার প্রমাণ স্বরূপ বিস্তারিত ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছি। বুঝা গেল বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান চার মাযহাব হতে কোনো না কোনো মাযহাব মানা তাদের জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে সকল আলেমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তাই অধিকাংশ মুসলমান কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী। ডা. জাকির নায়েক এক লেকচারে বলেন-"ভারতের বেশিরভাগ মুসলিম নিজেদেরকে হানাফী বলে পরিচয় দেয় আর কিছু শাফেয়ী বলে পরিচয় দেয়।"[৩০১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাহলে শত শত বছর ধরে বেশিরভাগ মানুষ মাযহাব মেনে কী ভুল পথে রয়েছেন? অথচ বিগত হাজার-বারোশত বছর যাবৎ প্রত্যেক স্বীকৃত বুযর্গানে দ্বীন সে নিজে মুজ্তাহিদ ছিলেন; না হয় কোনো না কোনো মুজতাহিদ ফকীহ এর মাযহাব বা মতের অনুসারী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيحٌ-

-" (অধিকাংশ) মুসলমানগণ যা ভাল মনে করেন তা আল্লাহর নিকটও ভাল, আর যা মন্দ মনে করেন তা আল্লাহর নিকটও মন্দ।"[৩০২] রাসূল (ﷺ) ও তার সাহাবীর এ

---

৩০১. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৬৭পৃ.

৩০২. ইমাম আবু দাউদ তায়লসী : আল-মুসনাদ : ১/১৩০পৃ. হাদিস : ২৪৬, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ : ১/৩৭৯ : হাদিস : ৩৬০০ এবং ১৭০২, ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৭৫পৃ. ইমাম তাবরানী, মুজামুল আওসাত, ৪/৫৮পৃ. হাদিস, ৩৬০২, দারুল হারামাঈন, কাহেরা, মিশর, আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ১/১৭৭-১৭৮ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আল্লামা ইবনে কাসীর : বেদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/৩২৭ : হাদিস : ৪০২, আল্লামা আযলূনী : কাশফুল খাফা : ২/২৪৫ পৃ. : হাদিস : ২২১৪, ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : ৫/২১২ পৃ. : হাদিস : ১৮১৬, ইমাম বায়হাকী : আল-ই'তিক্বাদ : ১/৩২২ পৃ., খতিব বাগদাদী : তারীখে বাগদাদ : /৪৪৬ পৃ., ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ১/১০৫ পৃ., ইমাম আহমদ : মুসনাদ : ১/৩৬৭ পৃ. : হাদিস : ৫৪১, আল্লামা হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক : ৩/৮৩পৃ. হাদিস : ৪৪৬৫, তিনি বলেন হাদিসের সনদটি সহিহ, আর তাঁর সাথে যাহাবী একমত পোষন করেছেন,ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর :৭/১১২-১১৫ হাদিস নং ৮৫৮২ ও ৮৫৯৩, ইমাম ইবনে রযব : জামিউল উলূম : ১/২৫৪পৃ. ইমাম সাখাভী : আল মাকাসিদুল হাসানা : ৪২২ পৃ. : হাদিস : ৯৫৭

বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো, অধিকাংশ মুসলমান যেহেতু মাযহাব কে অন্তরে ভাল ধারণা রেখেই অনুসরণ করে বা মানে সেহেতু সেটাও আল্লাহর নিকট ভাল হিসেবেই গণ্য। বর্তমানে কিছু লোক গোটা সহিহ হাদিসের অনুসারী দাবী করে উম্মতের মাঝে বিভ্রান্তির পাঁয়তারা করছে। তাই এই মুহূর্ত আমাদের করণীয় কী, তা জানতে হবে। এর সমাধান কল্পে হযরত রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الِاخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّهُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ-

-"হযরত আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, আমি রাসুলে পাক ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখবে, তখন বড় দলের অনুসরণ করবে। কেননা, আমার উম্মত গোমরাহীর উপর ঐকমত্য হবে না।"[৩০৩] তাই ডা. সাহেবের বক্তব্যে মুসলমানদের বড় জামাত/দল যেহেতু মাযহাব মানে আর নবিজীর যেহেতু বড় জামাতকে অনুসরণ করতে বলেছেন সেহেতু আমরা মাযহাব মানলেই নবির হাদিস মোতাবেক আমল হবে।

৭০. ডাক্তার সাহবের দেয়া স্বীকৃত আহলে হাদিসের অনুসারীরা অনেক দলে বিভক্ত ঃ

আমি ইতোপূর্বে তার পরিচয় পর্বে উল্লেখ করেছি যে তার কাছে বর্তমানের আহলে হাদিসরাই কুরআন সুন্নাহের সবচেয়ে কাছাকাছি। তার দৃষ্টিতে দল একটিই হবে চার মাযহাব হবে কেন। এ জন্য মাযহাবকে সে ভ্রান্ত ফিরকা তৈরী করার সাথে তুলনা করেছেন তার লেকচারের অনেক স্থানে। আর এ (মাযহাব মানা) ফিরকা মতভেদ তৈরী করাকে সে হারাম ঘোষণা করেন। যেমন সে এক স্থানে বলেন-"তার মানে ইসলাম ধর্মে নানা মত ও পথের প্রচলন করা ও তৈরী করা নিষিদ্ধ, এটা হারাম।"[৩০৪] ডা. সাহেব এ বক্তব্যগুলো সব মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন। তিনি আরও বলেন-"*তাহলে ইসলাম ধর্মে মতভেদ সৃষ্টি করা হারাম। এটা নিষিদ্ধ।*"[৩০৫] সে চার মাযহাবের চার ইমামমের ফতোয়া এক নয় বলে এ কথা বলেছেন। অথচ ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে সালাফি এক শাইখের ফাতওয়ার সাথে

৩০৩ .সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৩০৩; ইবনে আছেম, আস-সুন্নাহ, হাদিস নং ৮০; বায়হাকী, আসমা ওয়া সিফাত, হাদিস নং ৭০১; মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, হাদিস নং ১৩৬২৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৭০১

৩০৪ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং ৫, পৃ.৭৯

৩০৫ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার, ভলিয়ম নং ৫/৮০পৃ.

আরেক শাইখের ফাতওয়ার মিল নেই তাহলে জাকির নায়েকের সে শাইখরা কী হারামের কাজের কাতারে পরে না? জাকির নায়েক নিজেই বলছেন, "তবে এখন সালাফীদের মধ্যে অনেক গ্রুপ আছে। আপনি যদি ইংল্যান্ডে যান দেখবেন, অনেকগুলো গ্রুপ আছে; আর সেখানে প্রত্যেকটা গ্রুপ অন্য গ্রুপের সাথে লড়াই করছে আর বলছে অন্য সালাফী গ্রুপগুলো কাফির।"[৩০৬] তাহলে জাকির নায়েককে বলবো যে আপনি কখনো দেখেছেন যে হানাফি মাযহাবের কোনো লোক শাফেয়ী মাযহাবের লোককে কাফের বলতে? কাফির তো দূরের কথা কোনো দিন অন্য মাযহাবের দিকে আঙ্গুলও তুলেন নি। কখনই দেখাতে পারবেন না। তাহলে ডা. জাকিরের ফাতওয়ায়ই নামধারী সালাফী তথা আহলে হাদিসরা হারাম কাজে লিপ্ত ও একজনের ফতোয়ায় অপরজন কাফের; এখন প্রশ্ন হলো তাদের মধ্যে মুসলমান কোন দল?

সালাফী ও আহলে হাদিস কী অভিন্ন?

বর্তমান শতাব্দীর ভয়ংকর ফিতনা সালাফী তথা আহলে হাদিস একটিই ফিরকা। অনেকে আলাদা মনে করতে পারেন তাই জাকির নায়েকের ভাষ্য তুলে ধরলাম। ডা. সাহেব বলেন,"তবে সালাফী আর আহলে হাদিস দুটো একই রকম শুধু নামটা আলাদা"[৩০৭] বুঝা গেল তার নিজের স্পষ্ট বক্তব্যে।

৭১. জাকির নায়েকের এ জ্ঞান যোগ্যতা নিয়েই বড়াই ঃ

ইতোপূর্বে জাকির নায়েকের ইসলামী জ্ঞান যোগ্যতার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি। জাকির নায়েক কোন মুফাস্সির, মুহাদ্দিস কিংবা মুফতী নন। তারপরও কোনো ক্ষেত্রে অহংকার করে সে বলে-"আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যথেষ্ট যুক্তিবুদ্ধি আমাকে দিয়েছেন।"[৩০৮] ডা. জাকির নায়েক বলতে চাচ্ছেন তার জ্ঞান যথেষ্ট হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইসলামী শরয়িতে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কী নিজের জ্ঞান নিয়ে এত বড়াই করতে পারে?

৭২. এক মিলিয়ন হাদীস এক ডিস্কে পাওয়া যায়

ডা. জাকির নায়েক মাযহাব না মানার পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি যুক্তি হলো, বর্তমান সময় বিজ্ঞান ও টেকনোলজির যুগ।

৩০৬ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/১০২পৃ.

৩০৭ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/১০৩পৃ.

৩০৮ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/১০০পৃ.

যেকোনো তথ্য খুব সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'বর্তমান যুগ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। ইমামদের সময় একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য শত শত, হাজার হাজার কিলোমিটার সফর করতে হতো। কেননা তখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ততটা উন্নত ছিল না। বর্তমান যুগ হলো, ই- মেইলের যুগ, ফ্যাক্সের যুগ। সেকেন্ডের মধ্যে এখান থেকে আমেরিকায় যেকোনো তথ্য পাঠানো সম্ভব।'

ডা. জাকির নায়েক পরবর্তীতে বলেছেন,

Today if you want to have all the Sahih Hadith, you can have on a disk, the complete bukhary we c a n ha ve on a di sk, Bukhary,Muslim, in IRF on million Hadith on one disk. Classified, Sahih, Zaif, Mauzu.

'বর্তমান সময়ে তুমি যদি সমস্ত সহীহ হাদীস সংগ্রহ করতে চাও, তবে তা একটি ডিস্কে পাওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ বুখারী এক ডিস্কে পাওয়া যায়। একই ভাবে, বুখারী, মুসলিম। আইআরএফে একটি ডিস্কে এক মিলিয়ন হাদীস রয়েছে। যেগুলোর শ্রেণী বিভাগ করা রয়েছে–সহীহ, যয়ীফ, মওযু।"

সুতরাং ইমামদের যুগের তুলনায় বর্তমান সময়ে হাদীস সংগ্রহ করা খুবই সহজ। (ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-bydr-zakir-naik/)

ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্যটি যুক্তিসঙ্গত যে, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে খুব সহজে অবগত হওয়া সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিষয়ের জ্ঞানের জন্য কি ওই বিষয়ের সব পুস্তক তার নিকট থাকাটাই যথেষ্ট? ডা. জাকির নায়েক নিজে একজন ডাক্তার, তিনি কি কখনও এ বিষয়কে যথেষ্ট মনে করবেন যে, এক লোক বাজার থেকে কয়েক শ' বিখ্যাত মেডিক্যালের বই কিনে পড়লে সে ডাক্তার হয়ে যাবে? অন্যকে প্রেসক্রিপশন দিতে পারবে? আর এ ধরনের ডাক্তারের মাধ্যমে রোগীর রোগ নিরাময় হবে, নাকি মৃত্যুর কারণ হবে? পৃথিবীর কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দু-একটি বই পড়া যথেষ্ট না হয়, তবে ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞানের জন্য শুধু হাদীসের কিতাবকেই যথেষ্ট মনে করা হয় কেন? এক মিলিয়ন কেন, কারও নিকট যদি দশ মিলিয়ন হাদীসও থাকে, তবুও কি তার জন্য কিতাব পাঠ করে হাদিসের ওপর আমল করা সম্ভব?

এ সম্পর্কে আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন,

لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا, فَلَيْسَ كُلُّ مَا فِي الْكُتُبِ يَعْلَمُهُ الْعَالِمُ, وَلَا يَكَادُ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِأَحَدٍ, بَلْ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّوَاوِينُ الْكَثِيرَةُ وَهُوَ لَا يُحِيطُ بِمَا فِيهَا. بَلْ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ جَمْعِ هَذِهِ الدَّوَاوِينِ كانوا أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِكَثِيرٍ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا بَلَغَهُمْ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لَا يَبْلُغُنَا إلَّا عَنْ مَجْهُولٍ؛ أَوْ بِإِسْنَادِ مُنْقَطِعٍ؛ أَوْ لَا يَبْلُغُنَا بِالْكُلِّيَّةِ, فَكَانَتْ دَوَاوِينُهُمْ صُدُورَهُمْ الَّتِي تَحْوِي أَضْعَافَ مَا فِي الدَّوَاوِينِ, وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ عَلِمَ الْقَضِيَّةَ.

"যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রাসূল (ﷺ)-এর সমস্ত হাদীসের কিতাবসমূহে সংকলন করা হয়েছে এবং রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস এর মাঝেই সীমাবদ্ধ, তবে কোনো আলেম হাদীসের কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, এটি সম্ভব নয়। আর কারও পক্ষে এটি ঘটেও না। বরং কারও নিকট সংকলিত অনেক হাদীসের কিতাব থাকতে পারে, কিন্তু সে এ সমস্ত কিতাবের সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কিতাব সংকলনের পূর্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাঁদের কিতাব ছিল, তাঁদের অন্তর, যাতে সংরক্ষিত ছিল এ সমস্ত সংকলিত কিতাব থেকে কয়েক গুণ বেশি হাদীস। আর এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে, এমন কেউই বিষয়টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না।"[৩০৯]

শায়খ ইবনে তাইমিয়া এর বক্তব্য থেকে এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ থাকে না যে, হাদীসের বিষয়ে কিতাবসমূহ সংকলিত হওয়ার পূর্বে একেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ সংকলিত হাদীসের কিতাবসমূহের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হাদীস জানতেন। যেমন–

১. আল্লামা ইবনুস সালাহ (রহ.) (ওফাত. ৬৪৩হি.) থেকে বর্ণিত,

وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: " أَحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَمِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحِيحٍ

-ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস জানি এবং সহীহ নয়, এমন দুই লক্ষ হাদীস জানি।"[৩১০]

২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সাড়ে সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন।

৩. ইমাম মুসলিম (রহ.) তিন লক্ষ হাদীস থেকে মুসলিম শরীফ লিপিবদ্ধ করেছেন।

---

৩০৯. ইবনে তাইমিয়া, রফউল মালাম আনিল আইয়্যামাতুল আ'লাম, ১/১৭পৃ.

৩১০. মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা-২০, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আদি, আল-কামিল, মুকাদ্দামা, ১/১২৬পৃ. খতিবে বাগদাদী, তারিখে বাগদাদী, ২/২৫পৃ.

৪. ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে আবু দাউদ শরীফ রচনা করেছেন।

৫. ইমাম আবু যুরআ' (রহিমাহুল্লাহ) সাত লক্ষ হাদীসের হাফেয ছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য হাফেযে হাদীসের জন্ম হয়েছে। আমরা জানি হাফেযে হাদীস বলা হয় সেই মুহাদ্দিসকে, যিনি ন্যূনতম এক লক্ষ হাদীস সনদ ও মতনসহ হিফয করেছেন এবং সেটি আয়ত্তে রেখেছেন। 'তাযকিরাতুল হুফফায' নামক কিতাবে হাফেযে হাদীসদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত মুহাদ্দিস লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবি করেননি, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান সময়ে যারা বিশুদ্ধভাবে একটি হাদীস পাঠ করার যোগ্যতা রাখে না, তারাও মুজতাহিদ ইমাম হওয়ার দাবি করে ফাতওয়া প্রদান করে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন!

এ প্রসঙ্গে খতীবে বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' নামক কিতাবে লিখেছেন,

قِيلَ لِبَعْض الحُكَمَاء : إن فلانا جمع كتبا كثيرة ! فقال : هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل: لا قال فما صنع شيئا ما تصنع البهيمة بالعلم

-"কোনো এক বিজ্ঞজনকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে। তিনি তাঁকে বললেন, তার বুঝ কি তার সংগৃহীত কিতাবের সমান? ওই লোক উত্তর দিলেন, না। তখন তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই করেনি। চতুষ্পদ জন্তু ইলম দিয়ে কী করবে! অর্থাৎ বুঝ অর্জন না করে কিতাব সংগ্রহ করা; আর একটি জন্তুর নিকট অনেক কিতাব থাকা সমান।

সুতরাং কিতাব সংগ্রহের নাম ইলম নয়। কারও নিকট অধিক হাদীস থাকার কারণে সে যদি বড় আলেম হয়ে যেত, তবে যার নিকট এক ডিস্কের মধ্যে সমস্ত হাদীসের কিতাব রয়েছে, সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম হয়ে যেত। চল্লিশ টাকার একটা ডিস্ক সংগ্রহ করা, আর ইলমের পিছে চল্লিশ বছর সাধনা করা এক জিনিস নয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে এ কথা বলা যথেষ্ট নয় যে আমার নিকট এক মিলিয়ন হাদীসের একটি ডিস্ক আছে; সুতরাং কাউকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষয়টি যদি এমনই হতো, তবে পৃথিবীর যে কেউ ডিস্ক সংগ্রহ করবে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেম হয়ে যাবে।

খতীবে বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) ইয়াহইয়া ইবনে মুইন (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ যদি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে কি সে

ফাতওয়া দিতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে কি ফাতওয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, যদি তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, না। চার লক্ষ তিনি বললেন, না'। যদি পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, আশা করা যায়।

খতীবে বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) এ উক্তি বর্ণনা করে বলেছেন, পাঁচ লক্ষ হাদীস শুধু মুখস্থ করাটাই উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রতিটি হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং সে সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যক। তিনি লিখেছেন,

وَلَيْسَ يَكْفِيهِ إِذَا نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْفُتْيَا أَنْ يَجْمَعَ فِي الْكُتُبِ مَا ذَكَرَهُ يَحْيَى دُونَ مَعْرِفَتِهِ بِهِ وَنَظَرِهِ فِيهِ وَإِتْقَانِهِ لَهُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْفَهْمُ وَالدِّرَايَةُ وَلَيْسَ بِالْإِكْثَارِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الرِّوَايَةِ

-"কারও পক্ষে নিজেকে ফাতওয়ার আসনে সমাসীন করার জন্য ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (রহিমাহুল্লাহ) যে পরিমাণ হাদীসের কথা বলেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত তা সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ঠ নয়। কেননা ইলম হলো, প্রকৃত বুঝ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের নাম। অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার নাম ইলম নয়।"[৩১১]

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে শুধু হাদীস সংগ্রহ করাটা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। আর কেউ যদি অনেক হাদীস সংগ্রহ করেও, তবুও কি সে সরাসরি কোরআন ও হাদীসের ওপর আমল করতে সক্ষম হবে? ইজতেহাদের অন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সেগুলো অর্জন করা আবশ্যক নয় কি?

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবি করিম (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا-

-'আল্লাহ্ তা'আলা ইলমকে তার বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠানোর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি একসময় কোনো আলেমই অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষ তখন অন্ধ-মূর্খ লোকদের নিকট প্রশ্ন করবে, তারা ইলম ব্যতীত ফাতওয়া দেবে। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" [বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৮৭৭, ১০০, মুসলিম হাদিস নং ২৬৭৩]

৩১১. খতিবে বাগদাদী, আল-জামেউল লি আখলাকুল রাবী, ২/১৭৪পৃ. ক্রমিক. ১৫২৫

এ হাদীসে রাসূল (ﷺ) সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ইলমের অস্তিত্ব? নির্ভর করে উলামাদের অস্তিত্বের ওপর। আলেম এবং ইলম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ইলমকে টেকনোলজির অনুগামী মনে করা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

'ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

يظنالغمر ان الكتب تهدى ....اخا جهل لادراك العلوم لا يدرى الجهول بان فيها
....غوامض حيرت عقل الفهيم اذا رمت العلوم بغير شيخ....ضللت عن الصراط المستقيم

'মূর্খ, অনভিজ্ঞ লোক মনে করে থাকে যে, কিতাব তাকে ইলম অর্জনে পথ প্রদর্শন করবে। কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না যে, তাতে এমন দুর্বোধ্য বিষয় থাকে যে, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যদি তুমি উস্তাদ ব্যতীত ইলম অর্জন করো, তুমি সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে? হাফেযে হাদীস আবু বকর খতীবে বাগদাদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لا يُؤْخَذُ العِلمُ إلّا من افواه العلماء ...فلا بد من تعلم امور الدين من عارف ثقة اخذ عن ثقة وهكذا الى الصحابة فالذى ياخذ الحديث من الكتب يسمى صحافيا. والذى ياخذ القرآن من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئ-

-"আলেমদের থেকে শ্রবণ ব্যতীত ইলম শিক্ষা করা যায় না। সুতরাং ইলম অর্জনের পথে এমন একজন বিশ্বস্ত আলেম থেকে ইলম অর্জন করতে হবে, যিনি আরেকজন সিকা (বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য) আলেম থেকে ইলম অর্জন করেছেন, এভাবে সাহাবীদের পর্যন্ত ইলমের ধারা পৌঁছে যাবে। যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে, হাদীস গ্রহণ করে তাকে 'সাহাফী' বলা হয়। (তাকে মুহাদ্দিস বলা হয় না)। আর যে ব্যক্তি মাসহাফ থেকে কোরআন গ্রহণ করে তাকে 'মাসহাফী' বলা হয়, তাকে কারী বলা হয় না।" (আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ) তিনি আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন-

قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالطَّلَبِ-

-"ইমাম ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কামিল শিক্ষকের সোহবতে উপস্থিত হওয়া ছাড়া ইলম শিক্ষা লাভ করা যায় না।" (খতিবে বাগদাদ, কাইফিয়াত ফি উলূমুল রেওয়ায়েত, ১/৮৭পৃ.)

কামালুদ্দিন শামানীর বিখ্যাত কবিতা-

من يُاخَذُ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيف والتصحيف فى حرم ومن يكن اخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم

-"যে ব্যক্তি তাঁর শায়েখের নিকট থেকে সরাসরি ইলম শিক্ষা করে, সে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র থাকে। আর যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ইলম অর্জন করে, আলেমদের নিকট তার ইলম কোনো ইলমই নয়।"

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন,

إن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كل فن عن أهله كائنا ما كان

'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে।"[আদাবুত তলাব ও মুনতাহাল আরাব, পৃষ্ঠা-৭৬]

আহলে হাদিসদের ইমাম শাওকানী আরও বলেছেন,

وأما إذا أخذ العلم عن غير أهله ورجح ما يجده من الكلام لأهل العلم فى فنون ليسوا من أهلها فإنه يخبط ويخلط

-"আলেম যদি অযোগ্য লোকের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখায় পারদর্শী নয়, এমন লোকের বক্তব্যকে সে প্রাধান্য দেয়, তবে সে অনুমান নির্ভর এবং অবিমৃষ্যকারী।" [আদাবুত তলাব ও মুনতাহাল আরাব, পৃষ্ঠা-৭৬]

আল্লামা সাখাবী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত 'আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার' নামক কিতাবে রয়েছে,

من دخل فى العلم وحده خرج وحده

'যে ব্যক্তি একাকী ইলমের পথে প্রবেশ করল, সে একাকী সেখান থেকে বের হয়ে গেল।' [আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮]

সালফে সালেহীনের বিখ্যাত উক্তি হলো–

من أعظم البلية تشيخ الصحيفة

'কিতাবকে নিজের উস্তাদ বানানো বড় বড় মুসীবতের অন্যতম।' [আল্লামা ইবনে জামাআ (রাহিমাহুল্লাহ) তাযকিরাতুস সামে, পৃষ্ঠা-৮৭] ইমাম আবু যুরআ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَا يُفْتِي النَّاسَ صَحَفِيٌّ , وَلَا يُقْرِئُهُمْ مُصْحَفِيٌّ

'বই পড়ে কেউ ফাতওয়া দেবে না এবং কোরআন পড়ে কেউ কারী হবে না।' [আল - ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/পৃষ্ঠা-১৯৩]

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام

-"যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ফকীহ হলো, সে শরীয়তের হুকুমকে জলাঞ্জলি দিল।"[তাযকিরাতুস সামে, ওয়াল মুতাকাল্লিম, পৃষ্ঠা-৮৩]

৭১. আমাদের নবী কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন প্রশ্ন করে মুসলিমদের বিভ্রান্তি

ডা. জাকির নায়েক সর্ব-সাধারণ মানুষদেরকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়েন এভাবে যে-"আমাদের প্রিয়নবী কি ছিলেন? তিনি কি 'হানাফী' ছিলেন না-কি

'শাফেয়ী' না-কি 'মালেকী' না-কি 'হাম্বলী'-এর উত্তর হলো-'না, ।''(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৬০পৃ.) তিনি তার আরেক লেকচারে বলেন-''আমাদের নবী করীম (ﷺ) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? তিনি কি হাম্বলী, শাফেয়ী, মালেকী না হানাফী ছিলেন? একেবারেই না ।'' (ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ১/১৯৫পৃ.)

রাসূল (ﷺ) কি হানাফী, শাফেয়ী... ছিলেন?

ডা. জাকির নায়েক আরেক লেকচারে কথাগুলো এভাবে বলেছেন,

When we ask the muslim what are you? Some says I am hanafi, some says I am shafi, some say I am hanboli, some say I am a salafi. "What was the prophet (sallallahu alihi wasallam)? Was the prophet hanafi? Was he Shafa'i? was he Maleki? was he Hanboli? What was he?

-''কিন্তু আমরা যখন কোনো মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি তুমি কে· কেউ উত্তর দেয়, আমি হানাফী, কেউ বলে শাফেয়ী, কেউ বলে মালেকী আবার কেউ বলে হাম্বলী। কেউ বলে সালাফী। তাহলে নবীজি কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী ছিলেন, তিনি কি শাফেয়ী ছিলেন, নাকি তিনি মালেকী বা হাম্বলী ছিলেন? আসলে তিনি কী ছিলেন?''

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought=-should-a-muslim -follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-ma y-2011&Itemid=199)

এক. দুঃখজনক ব্যাপার হলো, ডাক্তার জাকির নায়েক চার মাযহাবকে কোরআনে নিষিদ্ধ ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, রাসূল কী ছিলেন? হানাফী? শাফেয়ী?... আমাদের প্রশ্ন হলো, ডাক্তার জাকির নায়েক যদি কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোনো মাসআলার সমাধান প্রদান করেন, কেউ যদি তাঁর কথা অনুযায়ী আমল করে, তবে এ কথা বলা কি ন্যায়সঙ্গত হবে যে, রাসূল (ﷺ) কী ছিলেন? রাসূল কি জাকির নায়েকপন্থী ছিলেন? সামান্য বুদ্ধি আছে, এমন কেউ এ ধরনের হাস্যকর প্রশ্ন করবে না। অথচ ডাক্তার জাকির নায়েকের মতো তথাকথিত একজন বিদ্বান ব্যক্তি এ ধরনের একটি প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তার জাকির নায়েক কি রাসূল (ﷺ)-এর অনুসারী, না রাসূল (ﷺ) ডাক্তার জাকির নায়েকের অনুসারী? ইমাম আবু হানীফা কি রাসূলের অনুসারী হবেন নাকি রাসূল (ﷺ) ইমাম আবু হানীফার অনুসারী হবেন? কোনটি হবেন? উম্মত নবীর অনুসারী হয়, নাকি নবী উম্মতের অনুসারী হন? ডাক্তার জাকির নায়েক কি এই সাধারণ কথাটা বোঝেন না?

ইমামগণ রাসূল (ﷺ)-এর অনুসারী ছিলেন কি না? এটি যথার্থ প্রশ্ন হতে পারে, কি? রাসূল (সা.) ইমামদের অনুসারী ছিলেন কি না, এটি কোন স্তরের প্রশ্ন? কেউ কি এ কথা বলতে পারবে যে, রাসূল (ﷺ) ওমরের অনুসারী ছিলেন, নাকি আবু বকরের? প্রশ্ন হতে পারে, আবু বকর ও ওমর কি রাসূল (ﷺ)-এর অনুসারী ছিলেন কি না। ডাক্তার জাকির নায়েকের মতো একজন কথিত বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ ধরনের যৌক্তিক-হাস্যকর প্রশ্ন দুঃখজনক।

ডাক্তার জাকির নায়েক যদি প্রশ্ন করতে চান যে, ইমামগণ রাসূল (ﷺ)-এর অনুসারী ছিলেন কি না? তবে আমরা বলব, ইমামগণ শত ভাগ রাসূল (ﷺ)-এর অনুসারী ছিলেন। রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসরণের প্রতি তাঁরা কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা তাঁদের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে ইমামগণের কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হলো–

ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

لم تزل الناس فى صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث. فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا

-''মানুষ তত দিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে অবস্থান করবে, যত দিন তাদের মাঝে এমন লোক থাকবে, যারা হাদীস অন্বেষণ করবে। আর যখন তারা হাদীস ব্যতীত ইলম অন্বেষণ করবে, তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে? [মিযানুল কুবরা, আল্লামা শা'রানী (রাহিমাহুল্লাহ), ১/১৫] ইমাম আযম আরও বলেছেন-

إياكم والقول فى دين الله بالرأى وعليكم بإتباع السنة فمن خرج عنها ضل

-''আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মনগড়া কথা থেকে বেঁচে থাকো! তোমাদের জন্য সুন্নাহের অনুসরণ আবশ্যক। যে ব্যক্তি সুন্নাহের অনুসরণ থেকে বের হলো, সে ভ্রষ্ট হয়ে গেল।''

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

السنن سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

-''সুন্নাহ হলো নূহ (আ.)-এর জাহাজের মতো। যে তাতে আরোহণ করল, সে নাজাত পেল, আর যে তা থেকে পিছিয়ে থাকল, সে ডুবে গেল।''

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেছেন,

ليس احد بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبى صلى الله عليه وسلم

-"রাসূল (সা.)-এর পরে তাঁর কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথা যেমন গ্রহণও করা যায়, আবার তা পরিত্যাগও করা যায়।"

ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন,

فَمَهْمَا قُلْت مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصَّلْت مِنْ أَصْلٍ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – خِلَافَ مَا قُلْت فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، وَهُوَ قَوْلِي

-"আমি যদি এমন কোনো কথা বা এমন কোনো মূলনীতি প্রদান করি, যেটি রাসূলের হাদীসের বিপরীত হয়, তখন রাসূল (ﷺ) যা বলবেন, সেটিই আমার বক্তব্য।" (ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ২/২০৪পৃ.)

ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন,

إذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَدَعُوا مَا قُلْت

-"আমার কিতাবে যদি রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ কোনো কথা পাও, তবে তোমরা সুন্নাহের ওপর আমল করো এবং আমি যা বলেছি, সেটি ত্যাগ করো।" (ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ২/২০৩পৃ.)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন,

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه

-যে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করল, সে ধ্বংসের মুখে নিপতিত? (ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ২/২৫২পৃ.)

রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে যারা এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যকে ভ্রান্ত ও ইসলাম বহির্ভূত প্রমাণের চেষ্টা করা, কতটা গর্হিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং চার ইমামও যে রাসূল (ﷺ)-এর শতভাগ অনুসারী ছিলেন, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বরং সর্বযুগের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, চার ইমামই শতভাগ ইসলামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

তুমি কে? প্রশ্নের উত্তর ডা. জাকির নায়েক বলেছেন–

When one asks a Muslim, "who are you?" the common answer is either 'I am a Hanafi or Shafi or Maliki or Hanbali. Some call themselves 'Ahle-Hadith'.

যখন কোনো মুসলমানকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি কে? সাধারণ উত্তর হলো, আমি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী অথবা হাম্বলী। কেউ কেউ নিজেকে আহলে হাদীস বলে।

(http://www.irf.net/index.php?option=com_content&view=article&id=459%3Awhich-school-of-thought-should-a-muslim-follow&catid=76%3Aqueries-on-islam-may-2011&Itemid=199)

আমরা এখানে ডা. জাকিরের এ বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করব। বাস্তব জীবনে আমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তাহলে এর উত্তর আমরা কী দিয়ে থাকি? এ বিষয়ে মৌলিক কথা হলো, এ প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভর করে।

কোনো অমুসলিম যদি কোনো মুসলিমকে প্রশ্ন করে, তুমি কে? তখন এর উত্তর হবে, 'আমি মুসলিম'। আবার অপরিচিত কোনো মুসলিম যদি অপর মুসলিমকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তার উত্তর হবে 'আমি অমুকের ছেলে অমুক'।

এক দেশের লোক যদি কোনো বিদেশিকে প্রশ্ন করে, 'তুমি কে?' তখন উত্তর হবে, আমি বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দুই ব্যক্তি যদি একে অপরকে প্রশ্ন করে তুমি কে? তখন এর উত্তর হবে, আমি গুজরাটি, আমি লাহোরি, আমি পাঞ্জাবি। আবার কোনো ছাত্রকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি কে? তখন সে বলবে সে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রেণীর ছাত্র।

এভাবে বাস্তব জীবনে মানুষ তুমি কে প্রশ্নের উত্তর স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী দিয়ে থাকে। অতএব, কোনো অমুসলিমের 'তুমি কে'? এমন প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলিম বলবে, আমি মুসলিম।

এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কখনও আমি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী...ইত্যাদি বলে না। ডা. জাকির নায়েক কিভাবে এ বিষয়টির অবতারণা করলেন আমাদের বোধগম্য নয়। তবে এটুকু তো স্পষ্ট যে, স্থান-কালপাত্র ভেদে এরূপ প্রশ্নের এরূপ উত্তর হয় কোনো অমুসলিম প্রশ্ন করলে। তাহলে ডা. জাকির নায়েক নিজেকে কী ভেবে প্রশ্নটির উত্তর

এভাবে দিয়েছেন তা আমাদের জানা নেই! তবে 'তুমি কে? ' এ প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলিম কখন নিজেকে হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস ইত্যাদি বলে থাকে? স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ধরুন!

দুজন ব্যক্তি পাশাপাশি নামায আদায় করল, একজন নামাযে জোরে জোরে আমীন বলল, আরেকজন আস্তে আমীন বলল । এখন নামায শেষে একে অপরকে যদি প্রশ্ন করে? তুমি কে? তখন এর উত্তর হবে, আমি হানাফী, আরেকজন হয়তো বলবে আমি শাফেয়ী বা আহলে হাদীস... । আবার কেউ যদি স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট করে জিজ্ঞেস করে, what is your madhab (তোমার মাযহাব কী) অথবা what madhab do you follow? (তুমি কোন মাযহাবের অনুসারী) তখন এর উত্তর হতে পারে, আমি হানাফী, শাফেয়ী...আহলে হাদীস ইত্যাদি । কিন্তু সাধারণভাবে কারও 'তুমি কে?' প্রশ্নের উত্তরে হানাফী, শাফেয়ী হিসেবে পরিচয়দানের বিষয়টি একেবারেই অযৌক্তিক। সুতরাং ডা. জাকির নায়েকের পক্ষে এ ধরনের বিষয়ের অবতারণা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয় ।

হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব

প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, 'ইযা সাহ্হাল হাদীস ফাহুয়া মাযহাবী' । অর্থাৎ হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব। এ কথা উল্লেখ করে ডাক্তার জাকির-নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীস ও সালাফীগণ যুক্তি দিয়ে থাকেন, মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে না, কেননা ইমামগণ সহীহ হাদীস অনুসরণের কথা বলেছেন। ডাক্তার জাকির নায়েক একটু আগে বেড়ে বলেছেন,

That's the reason I say I am a hundred percent Hamboli, if Hamboli means the person who follows the teaching of Imam Ahmad Ibn Hambal, I am 100% Hamboli. Other people are 70%, 80%. So in these teachings, if you say, following the teachings of Imam Abu Hanifa, may Allah's Mercy be on him, makes you a Hanafi, I am a 'Pakka' Hanafi, 100% Hanafi, if following the teachings of Imam Malek makes you a Maleki, I am 100% Maleki. If following the teachings of Imam Shafi, makes you a Shafi, I am 100% Shafi. If following the teachings of Imam Ahmad Ibn Hambol makes you a hamboli, I am a 100% 'Saufi Sad' Hamboli. Because all these four great Aimmas said, if you find any of my fatwa that goes against Allah and his Rasul, throw my Fatwa on the wall.

"আমি বলি, আমি শতভাগ হাম্বলী । যদি কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের নাম হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী । অন্যরা সত্তর ভাগ, কেউ আশি ভাগ, আমি একশ ভাগ হাম্বলী । যদি তুমি বলো, ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনুসরণ করলে কেউ হানাফী হয়ে যায়, তবে আমি একশ ভাগ হানাফী । ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনুসরণের কারণে কেউ যদি মালেকী হয়, তবে আমি শতভাগ মালেকী । ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ)-এর অনুসরণের কারণে কেউ যদি শাফেয়ী হয়, তবে আমি একশ ভাগ শাফেয়ী । ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অনুসরণের কারণে কেউ যদি হাম্বলী হয়, তবে আমি শতভাগ হাম্বলী । কেননা চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমার ফাতওয়া যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরোধী হয়, তবে আমার ফাতওয়া দেয়ালে ছুড়ে মার?

(ইউনিটি ইন দ্য মুসলিম উম্মাহ, http://qaazi.wordpress.com/2008/07/28/various-public-lectures-by-dr-zakir-naik/)

এক.

আমরা জানি যে প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব। বিবেচনার বিষয় হলো, ইমামগণ যদি এ কথা নাও বলতেন, তবুও কি সকলের ওপর রাসূল (ﷺ)-এর সহীহ হাদীস অনুসরণ করা জরুরি নয়? কোনো মুমিন কি এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে, আমি রাসূল (ﷺ)-এর সহীহ হাদীস পেলেও সেটা মানব না?

আমরা ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন করব, কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে? কেউ যদি কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ করে, নিঃসন্দেহে সে মুসলমান থাকবে না ।

আমাদের কথা হলো, কোরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কি কোরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করে দেখাতে পারবেন? কারও জন্য কি কোরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করা বৈধ?

সর্বজনস্বীকৃত বিষয় হলো, কোরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের সমস্ত আয়াতের ওপর আমল করা বৈধ নয়। কেউ যদি কোরআনের সমস্ত আয়াতের ওপর আমল করতে চায়, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমরা সকলেই অবগত ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদপান বৈধ ছিল। পবিত্র কোরআনে এ বৈধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

অর্থাৎ তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলুন, এতে মানুষের কল্যাণ ও বড় গোনাহ রয়েছে। আর এর গোনাহ তার কল্যাণের চেয়ে বড়। [সূরা বাকারা, আয়াত নং ২১৯]

তিরমিযী শরীফের ৩০৪৯ নং হাদিসে রয়েছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আয়াতটি হযরত ওমর (ﷺ)-এর সম্মুখে পাঠ করা হলে তিনি দু'আ করলেন,

اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ

-হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করুন? অতঃপর পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না? এ আয়াতে শুধু নামাযের পূর্বে মদ খাওয়া অবৈধ করা হয়েছে। এ আয়াত হযরত ওমরের সামনে তেলাওয়াত করা হলে, তিনি পূর্বের ন্যায় দু'আ করলেন, হে আ ল্লাহ মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বিধান দান করুন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৯০ও ৯১ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ পাক বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

অর্থ : (৯০) হে মুমিনগণ! এই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ কিছুই তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত ওমর (ﷺ) বললেন,

انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا -আমরা এ সমস্ত জিনিস থেকে বিরত হলাম, বিরত হলাম।"[৩১২]

এখন কেউ যদি বলে, সূরা নিসার ৪৩নং আয়াতে মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সুতরাং এ আয়াতে তো মদ হারাম এ কথা বলা হয়নি। মাতাল অবস্থায় নামায না পড়লেই আয়াতের ওপর আমল হয়ে যাবে। সুতরাং নামায ব্যতীত অন্য সময়ে মদ পান করা বৈধ হবে।

সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত, সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত, এগুলো কি সহীহ নয়? এগুলো কি কোরআনের আয়াত নয়? এ দুই আয়াতের আলোকে কি ডাক্তার জাকির নায়েক মদ খাওয়া হালাল বলতে পারবেন? আর তিনি যদি হালাল বলেন, তবে তিনি মুসলমান থাকবেন? অথচ কোরআন সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে কোনো কিছু সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। চাই তা কোরআন হোক কিংবা হাদীস। কোরআনে যেমন নাসেখ-মানসুখ রয়েছে, রাসূল (সা.)-এর হাদীসেও নাসেখ-মানসুখ রয়েছে। আর এটি সর্বজনস্বীকৃত যে মানসুখের (রহিত) ওপর আমল করা নিষিদ্ধ এবং নাসেখের (রহিতকারী বিধান) ওপর আমল করা আবশ্যক। এ ছাড়া হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির ওপর আমল করা হয় না। সুনির্দিষ্ট কারণে হাদীস পরিত্যাগ সত্ত্বেও অনেকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পেরে, নিজের অজ্ঞতাকে ইমামদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ

প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কালজয়ী উক্তি–

وَلْيُعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ –الْمَقْبُولِينَ عِنْدَ الْأُمَّةِ قَبُولًا عَامًّا– يَتَعَمَّدُ مُخَالَفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّتِهِ؛ دَقِيقٍ وَلَا جَلِيلٍ. فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ اتِّفَاقًا يَقِينِيًّا عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَلَى أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ, إِلَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَكِنْ إِذَا وُجِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِ, فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ.

-"প্রত্যেকের অবগত হওয়া জরুরি যে মুসলিম উম্মাহের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত ইমামদের কোনো ইমামই স্বেচ্ছায় রাসূলের কোনো সুন্নাতের বিরোধিতা করেননি। সুন্নাতটি ছোট থেকে ছোট হোক কিংবা বড় থেকে বড়। কেননা তারা সন্দেহাতীত ও নিশ্চিতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ জরুরি এবং

৩১২. তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৪৯, আবু দাউদ হাদিস নং ৩৬৭০

রাসূলের কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথাই যেমন গ্রহণ করা যায় আবার প্রত্যাখ্যানও করা যায়। কিন্তু তাদের কারও কাছ থেকে যদি এমন বক্তব্য পাওয়া যায়, যা কোনো সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, তবে বুঝতে হবে তার কাছে অবশ্যই যথার্থ কোনো প্রমাণ বা ওজর রয়েছে, যার কারণে তিনি সহীহ হাদীসটি গ্রহণ করেননি।"[৩১৩]

কিন্তু বর্তমান যুগের স্বশিক্ষিত তথাকথিত মুজতাহিদগণের অবস্থা কী? তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল গাফফার হিমসি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন–

لأنا نرى فى زماننا كثيرا ممن ينسب إلى العلم مغترا فى نفسه يظن أنه فوق الثريا وهو فى حضيض الأسفل فربما يطالع كتابا من الكتب السنه- مثلا فيرى فيه حديثا مخالفا لمذهب أبى حنيفة فيقول :إضربوا مذهب أبى حنيفة على عرض الحائط وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكن هذا الحديث منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه سندا أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به وهو لا يعلم بذلك فلو فوض لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطالقا : لضلوا فى كثير من المسائل وأضلوا من أتاهم من سائل-

-"বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করে ধোঁকায় পতিত রয়েছে। সে মনে করে যে, সে (ইলমের দিক থেকে) ছুরাইয়্যা তারকার তথা মঙ্গল গ্রহের ওপরে রয়েছে, অথচ বাস্তবতা হলো, তার অবস্থান পাতালের তলদেশে। উদাহরণস্বরূপ, এরা সিহাহ্ সিত্তা থেকে কোনো একটি হাদীসের কিতাব পড়ে এবং সেখানে কোথাও যদি তারা ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মাযহাবের বিপরীত কোনো হাদীস পায়, তবে তারা বলে, 'আবু হানিফার মাযহাব দেয়ালে ছুড়ে মারো, আর রাসূলের হাদীস গ্রহণ করো।' অথচ হাদীসটির বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা উক্ত হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী বর্ণনার অন্য কোন হাদীস রয়েছে, অথবা

এ-জাতীয় সুনিশ্চিত কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির আমল পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ সে এর কোনোটিই জানে না। এ শ্রেণীর লোকদের হাতে যদি সাধারণভাবে হাদীস অনুসরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি তাদের নিকট যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকেও পথচ্যুত করবে?"

ডাক্তার জাকির নায়েক যে দাবি করেছেন, আমি শতভাগ হানাফী, শতভাগ মালেকী, শতভাগ শাফেয়ী, শতভাগ হাম্বলী এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা তাঁর এ বক্তব্য মূলত ইমামদের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মাযহাবসমূহকে খেল-তামাশার বস্তু

৩১৩. ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া, ২০/২৩২পৃ: ও রফউল মালাম আনিল আইয়্যামাতুল আ'লাম, ১/৮পৃ.

বানানোরই নামান্তর। কারণ আমরা সকলেই জানি যে একই সাথে চার মাযহাব অনুসরণ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, একমাত্র তিনিই হয়তো সহীহ হাদীস মানতে আগ্রহী। ইমামগণ কি সহীহ হাদীস মানতেন না? কিংবা তাদের অনুসারী কেউ কি সহীহ হাদীস মানে না? বিষয়টি এমন যেন চৌদ্দ শ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিল না, চৌদ্দ শ' বছর পরে ডাক্তার জাকির নায়েক কিংবা অপরাপর আহলে হাদীসগণ শুধু সহীহ হাদীস পড়ছেন। চৌদ্দশ' বছরে কেউ হয়তো বোখারী পড়েনি, একমাত্র এরাই চৌদ্দ শ' বছর পরে এসে বোখারী পড়ছে। যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, যাঁরা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা সকলেই সত্তর ভাগ মাযহাবী ছিলেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি একশ ভাগ মাযহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন; তাও আবার একই সাথে চার মাযহাবের একশ ভাগ অনুসারী! বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হয়তো সহীহ হাদীস জানতেন না বা সহীহ হাদীস মানতেন না, এ জন্য ডা. জাকির নায়েকের দৃষ্টিতে তাঁরা হলেন সত্তর ভাগ বা আশি ভাগ মাযহাবী। আমরা সকলেই জানি, বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মোফাসসির,উসুলবিদ, ঐতিহাসিক প্রায় সকলেই দীর্ঘ বার-তেরশ বছর যাবৎ কোনো একটা মাযহাব অনুসরণ করেছেন। ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁরা সকলেই সত্তর ভাগ সহীহ হাদীস মানতেন, ইসলামের দীর্ঘ চৌদ্দ শ বছর পরে ডা. জাকির নায়েক দাবি করলেন যে তিনি একশ ভাগ সহীহ হাদীস মানেন!

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন–

ولا تكن حاكمًا عَلى جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علمًا لم يؤتوه، او وصلت إلى مقامٍ لم يصلوه.

-"মুমিনদের সকল বিষয়ে তুমি বিচারক সেজো না! তোমার ভাবখানা এমন যে তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি, তোমার কাছে এমন এলম পৌছেছে, যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌছেনি। (ইবনে রযব হাম্বলী, মাজমাউ রসায়েলে ইবনে রযব, ২/৬৩৫পৃ.)

যাঁরা ইমামদের এ সমস্ত কথার অপব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া -এর নিম্নোক্ত উক্তিটি মনে রাখা দরকার–

وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ مُخَالَفَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيْهِمْ وَتَكَلَّمَ إمَّا بِظَنٍّ وَإِمَّا بِهَوَى

-"যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অথবা মুসলমানদের অন্য কোনো ইমামদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে তারা কিয়াস কিংবা অন্য কোনো কারণে সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তবে সে তাদের ওপর ভ্রান্ত বিষয় আরোপ করল এবং নিজের ধারণা অথবা প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে তাদের ওপর মিথ্যারোপ করল।"[ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৩০৪]

সার কথা হলো, প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এর অর্থ হলো, হাদীসটি আমলযোগ্য হতে হবে। কেননা হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য হয় না। এ বিষয়ে সমস্ত মুহাদ্দিস, সমস্ত মোফাসসির, সমস্ত ফকীহ একমত যে, সকল সহীহ হাদীস আমলযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন,

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث؛ فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السَّلف على تركه، فلا يجور العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا عَلى علم أنَّه لا بعمل به.

-"ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোনো একটি হাদীস সহীহ হলে, তার ওপর তখনই আমল করেন, যখন কোনো সাহাবী, তাবেয়ী, অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোনো একটি দল থেকে হাদীসটির ওপর আমলের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে হাদীসের ওপর আমল না করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তার ওপর আমল করা জায়েয নেই; কেননা তার ওপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তাঁরা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন।" (ইবনে রযব হাম্বলী, মাজমাউ রসায়েলে ইবনে রযব, ৩/১৭পৃ.)

এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা হলো, ইমামগণের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মানুষের মাঝে মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো নিতান্ত-ই দুঃখজনক। প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটি আমার মাযহাব' তাঁদের এ বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,

إذا صلح الحديث للعمل به فهو مذهبى

অর্থাৎ 'হাদীসটি যখন আমলযোগ্য হবে, তখন সেটি আমার মাযহাব হবে।' কিন্তু বর্তমানে লা-মাযহাবী বা কথিত সালাফীরা এ সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ করে, মানুষের মাঝে মাযহাবের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মাযহাবের বক্তব্যের বিরোধী কোনো হাদীস পেলে, সে সম্পর্কে কোনো ইলম হাসিল না করেই, মাযহাব এবং মায হাবের ইমামদের সম্পর্কে বিষোদগার শুরু করে; অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাবে, উক্ত হাদীস পরিত্যাগের যথাযোগ্য কারণ রয়েছে।

র্তমানে যারা সহীহ হাদীস অনুসরণের নামে নতুন নতুন মাযহাবের অবতারণার চেষ্টা রছে, তাদের অধিকাংশ মাস'আলা এমন যে তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের মুসলিম উম্মাহ একমত। যেমন, এরা বলে বীর্য পাক, এদের অনেকে বলে খাওয়া বৈধ, গান-বাদ্য জায়েয, জুমু'আর খুতবা যেকোনো ভাষায় দেওয়া জায়েয, যা নামায বলতে কিছু নেই, অর্থ না বুঝে কোরআন পড়লে কোনো সওয়াব হবে না, রাবী বিশ রাক'আত নয়, আট রাকাত ইত্যাদি। কোরআন অনুসরণ করতে গিয়ে মন মদকে হালাল করা যাবে না, তেমনি সহীহ হাদীসের অনুসরণের কথা বলে হিত হাদীস দিয়ে গান-বাদ্য, বেপর্দা ইত্যাদিকে জায়েয বলা যাবে না। এগুলো লত সহীহ হাদীসের অনুসরণ নয়, হাদীস অনুসরণের ছদ্মাবরণে ইসলামকে বিকৃত রার অপচেষ্টা।

াদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন,

ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف انه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর উক্ত বক্তব্যের ওপর তখনই আমল করা যাবে, যখন এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হবে যে, তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তিনি হাদীসটির ওপর আমল করেননি কিংবা হাদীসটির কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত বক্তব্যের আমল করা যাবে না।' (ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ২/২২৩পৃ.)

১. আল্লামা ইবনে হামদান (রহ.) লিখেছেন,

وليس لكل فقيه أن يعمل بما راه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك ويعرف به وقد ترك الشافعى العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ لما بينه

-"প্রত্যেক ফকীহের জন্য এই অনুমতি নেয়ই যে, বাহ্যিক হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করবে, যতক্ষণ না সে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করবে যে, এ হাদীসটির সাংঘর্ষিক কোনো দলিল আছে কি না, অথবা হাদীসটির বিধান রহিত কি না। এ ব্যাপারে সে যদি জ্ঞান না রাখে, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনেক হাদীসের ওপর ইচ্ছা করেই আমল করেননি, কেননা তাঁর নিকট সে সমস্ত হাদীসের বিধান রহিত ছিল (মানসুখ)।"

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشافعي ليس معناه ان كل أحد رَأَى حَدِيثًا صَحِيحًا قَالَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَمِلَ بِظَاهِرِهِ: وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَنْ لَهُ رُتْبَةُ الاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِفَتِهِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ: وَشَرْطُهُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ: وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُطَالَعَةِ كُتُبِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهَا وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِ الْآخِذِينَ عَنْهُ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهَذَا شَرْطٌ صَعْبٌ قَلَّ من ينصف به: وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَآهَا وَعَلِمَهَا لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى طَعْنٍ فِيهَا أَوْ نَسْخِهَا أَوْ تَخْصِيصِهَا أَوْ تَأْوِيلِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْهَيِّنِ فَلَيْسَ كُلُّ فَقِيهٍ يَسُوغُ لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ بِمَا يَرَاهُ حُجَّةً مِنْ الْحَدِيثِ

-"ইমাম নববী (রহ.) 'শরহুল মুহাজ্জাব'এ লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ সহীহ হাদীস দেখলেই বলবে যে, এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব এবং বাহ্যিক হাদীসের ওপর আমল করবে। বরং এটি তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। এর জন্য শর্ত হলো, তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে, শাফেয়ী (রহ.) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হননি অথবা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সকল কিতাব অধ্যয়ন করা হবে এবং তাঁর নিকট থেকে যারা ইলম শিক্ষা করেছে, তাদের সব কিতাব মুতালা'আ করতে হবে। এটি একটি কঠিন শর্ত, যা অল্পসংখ্যক লোকই অর্জন করতে পারে। ফকীহগণ পূর্বোক্ত শর্তগুলো এ কারণে আরোপ করেছেন যে, কোনো একটি হাদীস ত্রুটিযুক্ত, রহিত, সুনির্দিষ্ট অথবা হাদীসটির ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনেক সহীহ হাদীসের ওপর আমল করেননি অথচ তিনি এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট সুনির্দিষ্ট দলিল ছিল। শায়খ আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যা বলেছেন, তার বাহ্যিকের ওপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকীহ হাদীসকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করতে পারবে না।" (নববী, শরহুল মহাজ্জব, ১/৬৪পৃ.)

মূলত রাসূল (ﷺ) হাদীস বর্ণনার দিক থেকে সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়।

বরং এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য কোনো হাদীস বা কোরআনের কোনো নির্দেশনা আছে কি না। হাদীসটির বিধান রহিত কি না, ইত্যাদি। একজন সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বড় বড় আলেমদের পক্ষেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা কঠিন। যাঁরা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন, তাঁরাই কেবল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

শরীয়তের বিষয়ে যারা কোনো জ্ঞান রাখে না, অথবা জ্ঞান থাকলেও যেটা ইজতেহাদের জন্য যথেষ্ট নয়, তারা সহীহ হাদীস পেলেই সেটা নিয়ে খুব মাতামাতি করে। অনেকে হয়তো এতটুকু জানে না, সহীহ হাদীস কাকে বলে, কখন সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা যায় এবং কখন সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, শায়খ আব্দুল গাফফার (রহ.) 'দাফউল আওহাম আন মাসআলাতিল কিরাতি খালফাল ইমাম' নামক একটি কিতাব রচনা করেন। এ কিতাব রচনার মূল কারণ ছিল, শামের তরাবলুস শহরের এক লোক হোমস শহরে আসে এবং শায়খকে বলে যে, আমাদের ওখানে একজন লোক রয়েছে, যার বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না, সে কাফের। তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে তার কথার যুক্তি দেখাল যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না, আর যার নামায সহীহ হলো না, সে কেমন যেন নামায পড়ল না। আর যে নামায পড়ল না, সে কাফের।' তখন শায়খ আব্দুল গাফফার (রহ.) এক বৈঠকে, দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উক্ত কিতাব রচনা করে তরাবুলুস শহরের ওই লোককে দিয়ে দিলেন।'

এ জন্যই হয়তো ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম লায়স বিন সা'য়াদ (রহ.)-এর ছাত্র, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ওহাব (রহ.) বলেছেন,

قول ابن وهب: الحديث مضلة إلا للعلماء.

-"আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হল গোমরাহীর কারণ।"[৩১৪]

ইমাম আবু যায়েদ কাইরাওয়ানী (রহ.) লিখেছেন,

قال الإمام ابن أبى زيد القيروانى رحمه الله : (قال ابن عيينه : الحديث مضلة إلا للفقهاء) يريد : أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره

৩১৪. ইমাম কাযি আয়ায, তারতিবুল মাদারেক ওয়া তাক্বরিবুল মাসালিক, ১/৯১পৃ.

او دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شئ مما لا يقوم به إلا من استبحر و تفقه)

-"ইমাম সুফিয়ান ইবনে ইবনে উয়াইনা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস হলো ভ্রান্তির কারণ। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা হয়তো হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করবে, অথচ অন্য কোনো হাদীস দ্বারা এর ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথবা অন্যদের নিকট হাদীসের দলিল অস্পষ্ট থাকবে, অথবা হাদীসটি মূলত আমলযোগ্য নয়, যার সুস্পষ্ট কোনো কারণ রয়েছে, যা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।"

আমাদের সমাজে দেখা যায়, শরীয়তের বিষয়ে যাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কোনো এক ইমামের এ ধরনের উক্তি মুখস্থ করে নিজেও যেমন ধোঁকায় পড়ে এবং অন্যকেও ধোঁকায় ফেলে। এ কথা বললে, অনেকেই হয়তো বলবেন, নবীজির হাদীসের ওপর একজন আমল করছে আর তার ব্যাপারে ভ্রান্ত হওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে?

এ প্রসঙ্গে শায়খ আবু মুহাম্মাদ আওয়ামাহ লিখেছেন,

وهنا تثور ثائرة أدعياء الدعوة الى العمل فيقولون: هل يجوز لكم أن تحكموا بالضلالعلى من يعمل بالسنة ويفتى الناس بها؟! فنقول: نعم إذا لم يكن إهل لهذا المقام فحكمنا عليه بالضلال لا لعمله بالسنة معاذ الله بل لتجرئه على ما ليس أهل له-

-"আমাদের সমাজে কিছু দাঈ রয়েছে, যাঁরা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করবেন, আপনারা এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন, যে রাসূলের সুন্নাহের ওপর আমল করার নির্দেশ দিচ্ছে এবং সুন্নাহের আলোকে মানুষকে ফাতওয়া দিচ্ছে।"

আমরা বলব, যেহেতু সে এ কাজের যোগ্য নয়, এ জন্য তাকে আমরা তার ভ্রান্তির ব্যাপারে ফায়সালা দিচ্ছি, সে সুন্নাহের ওপর আমল করছে এ কারণে নয়। বরং সে যে বিষয়ের যোগ্য নয়, সে বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কারণে এই ফায়সালা দেওয়া হচ্ছে।'

৭২. প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন

প্রত্যেক ইমামই তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা আমার অনুসরণ করো না। ডা. জাকির নায়েক মাযহাবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অভিযোগ হলো, প্রত্যেক ইমামই তাঁকে অনুসরণ করতে নিষেধ

করেছেন, সুতরাং আমরা কেন তাদের অনুসরণ করব? এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম ইমামদের বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করব এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য

ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বেশ কিছু উক্তি বর্ণিত আছে, যেখানে তিনি তাঁর কথা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

لايحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه

-"কারও জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে আমরা কোথা থেকে সেটি গ্রহণ করেছি, সে সম্পর্কে অবগত হবে।" তিনি আরো বলেন,

ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لا تكتب كل ما تسمع منى فإنى قد أرى الرأى اليوم وأتركه غدا وأرى الرأى غدا وأتركه بعد غد إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولى

-"হে ইয়াকুব! তোমার ধ্বংস হোক! আমার নিকট থেকে যা শোনো, তাই লিপিবদ্ধ করো না, কেননা আমি আজ যে মতটা পছন্দ করি, কাল তা ত্যাগ করি। কাল এক মত গ্রহণ করি, পরশু সেটিও ত্যাগ করি। আমি যদি কখনও এমন কথা বলি, যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিপরীত হয়, তবে আমার কথা পরিত্যাগ করো।"

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন-

وَقَالَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازَ: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي قَوْلِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ

-"নিশ্চয় আমি একজন মানুষ, আমি ভুলও করি আবার সঠিকও করি। সুতরাং তোমরা আমার মতামতের প্রতি লক্ষ রাখবে! আমার যে মতটি কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, সেটি গ্রহণ করো এবং যেটি কোরআন ও সুন্নাহের বিপরীত, তা পরিত্যাগ করো।" (ইমাম ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াক্কীয়ীন, ১/৬০পৃ.)

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বক্তব্য

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ প্রসঙ্গে বলেন,

إذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَعُوا مَا قُلْت و فى رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد

-"আমার কিতাবে যদি রাসূলের সুন্নাতের খেলাফ কোনো কথা পাও, তবে তোমরা সুন্নাহের ওপর আমল করো এবং আমি যা বলেছি, সেটি ত্যাগ করো।"(ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াকি'য়ীন, ২/২০৩পৃ.)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমামদের তাকলীদ প্রসঙ্গে বলেন,

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا.

-"তোমরা আমার অনুসরণ করো না এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী (রহ.) এদের ও অনুসরণ করো না। তারা যেখান থেকে গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে গ্রহণ করো।" (ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াকি'য়ীন, ২/১৩৯পৃ.)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন,

لَا تُقَلِّدْ دِينَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ، ثُمَّ التَّابِعِيُّ بَعْدَ الرَّجُلِ فِيهِ مُخَيَّرٌ.

-"তোমার দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না, রাসূল (ﷺ) এবং তার সাহাবীগণ যা নিয়ে এসেছেন, সেগুলো গ্রহণ করো। অতঃপর তাবেঈগণের অনুসরণ করো, তবে এ ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীন।" (ইবনুল কায়্যম, ই'লামুল মুয়াকি'য়ীন, ২/১৩৯পৃ.)

যুক্তির দাবি হলো, প্রত্যেক ইমাম যেহেতু তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং তাদেরকে অনুসরণ করা কিভাবে বৈধ হয়? আর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাদের নিষেধ সত্ত্বেও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ কেন তাদের অনুসরণ করে! দীর্ঘ বার-তের শ' বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ কেন ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করল? অথচ স্বয়ং ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন!

প্রথমতঃ লক্ষ করার বিষয় হলো, ইমামগণ যদি তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ নাও করতেন, কিংবা যদি ধরে নেই যে, পৃথিবীতে কোনো মাযহাব নেই, তবে কি কারও পক্ষে ইজতেহাদের যোগ্যতা অর্জন না করে মাসআলা দেওয়া জায়েয হবে? কারও পক্ষে কি কোরআন ও হাদীসের বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন না করে ফাতওয়া দেওয়া বৈধ হবে?

পৃথিবীর সব উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, 'শরীয়তের বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া জায়েয নেই। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম

ই'লামুল মুয়াককি'য়ীনে এ বিষয়ে আলাদা একটা পরিচ্ছদ তৈরি করেছেন এবং এর শিরোনাম দিয়েছেন,

تَحْرِيمِ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ -"আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা হারাম।"[৩১৫]

এ শিরোনামের অধীনে শরীয়তের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে ফাতওয়া বা মাসআলা প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম এ শিরোনামের অধীনে লিখেছেন,

وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فِي الْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ، وَجَعَلَهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمُحَرَّمَاتِ، بَلْ جَعَلَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَا مِنْهَا، فَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}.... وَهُوَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ، وَهَذَا يَعُمُّ الْقَوْلَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِلَا عِلْمٍ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَفِي دِينِهِ وَشَرْعِهِ.

-"আল্লাহ তা'আলা ফাতওয়া ও বিচারের ক্ষেত্রে না জেনে কোনো কথা বলাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন এবং একে বড় বড় কবিরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন বরং একে কবিরা গোনাহের প্রথম স্তরে রেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আপনি বলে দিন : আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।'[৩১৬]

এখন কারও জন্য যদি যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন না করে ফাতওয়া দেওয়া জায়েয না হয়, তবে একজন সাধারণ মানুষ যে সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে পারে না, সে কী করবে?

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেছেন,

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فِيهَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ وَيَتَخَيَّرَ فَيَقْضِيَ بِهِ وَيَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ مَا يُؤْخَذُ بِهِ فَيَكُونُ يَعْمَلُ عَلَى أَمْرٍ صَحِيحٍ.

৩১৫. ইবনুল কায়্যম, ই'লামুল মুয়াকি'য়ীন, ২/১২৬পৃ.
৩১৬. ইবনুল কায়্যম, ই'লামুল মুয়াকি'য়ীন, ১/৩১পৃ.

-"যদি কারও নিকট রাসূল (ﷺ)-এর লিখিত হাদীসের কিতাবসমূহ থাকে এবং সাহাবা, তাবেঈ, তাবেতাবেঈনদের মতপার্থক্য যদি তার জানা থাকে, তবে তার জন্য যেকোন একটাকে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করা কিংবা তার দ্বারা বিচার করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, কোনটি গ্রহণ করবে? অতঃপর সে সঠিকটার ওপর আমল করবে।" [ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াক্কি'য়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ إِلَّا لِرَجُلٍ عَالِمٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

'কোরআন ও সুন্নাহের ইলম ব্যতীত কারও জন্য ফাতওয়া বা মাসআলা দেওয়া জায়েয নেই।' [ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াক্কি'য়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৫]

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَفْتَى أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِقَوْلِ مَنْ تَقَدَّمَ، وَإِلَّا فَلَا يُفْتِي.

-"যে ফাতওয়া দেবে তার জন্য পূর্ববর্তীদের কথা অবগত না হয়ে ফাতওয়া দেওয়া উচিত নয়।"[ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াক্কি'য়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬]

সুতরাং এ সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, প্রত্যেকেই ফাতওয়া বা মাসআলা দিতে পারবে না। বরং এর জন্য যারা যোগ্য, একমাত্র তারাই ফাতওয়া দেবে। সুতরাং ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্য থেকে এ উদ্দেশ্য নেওয়া যে, তারা যোগ্য-অযোগ্য প্রত্যেককে সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাস'আলা বের করতে বলেছেন এবং তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এটি তাদের কথার অপব্যাখ্যার নামান্তর।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) একদিকে বলছেন যে, চার লাখ হাদীস মুখস্থ না করে এবং উলামাদের বক্তব্য ও মতবিরোধ সম্পর্কে অবগত না হয়ে কেউ মাসআলা দিতে পারবে না, অন্যদিকে তিনি কাউকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন, সুতরাং এ বিষয় দুটির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করলেই তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রত্যেক ইমামের নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এ সমস্ত শর্ত কারও মাঝে বিদ্যমান না থাকলে তার জন্য শরীয়তের বিষয়ে মাসআলা দেওয়া বৈধ নয়। অতএব, ইমাম আহমাদ ইবনে (রাহিমাহুল্লাহ) যখন মাসআলা দেওয়ার জন্য ইজতেহাদের যোগ্য হওয়ার শর্ত দিয়েছেন। সুতরাং তিনি কখনও ইজতেহাদের অযোগ্য লোককে এ কথা বলতে পারেন না যে, 'ইমামদের অনুসরণ করো না।'

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইমামগণ এখানে কাদেরকে উদ্দেশ করে বলেছেন এবং তাদেরকে কী নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমামগণ কাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন ঃ

ইমামগণ যে তাঁদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, এ নিষেধাজ্ঞা কাদের জন্য প্রযোজ্য, সেটি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের এমন ছাত্রদেরকে তাঁরা এ নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইজতেহাদের যোগ্য এবং প্রত্যেকেই সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করার যোগ্য ছিলেন। একজন মুজতাহিদ কখনই আরেক মুজতাহিদকে এ কথা বলতে পারেন না যে, 'তুমি আমার অনুসরণ করো'। যেমন একজন সায়েন্টিস্ট আরেকজন সায়েন্টিস্টকে বলতে পারেন না যে, তুমি আমার গবেষণার ওপর নির্ভর করো। বরং প্রত্যেকেই নিজস্ব গবেষণার আলোকে সিদ্ধান্ত দেবেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করতে হবে যে, তিনি কাকে উদ্দেশ করে বলেছেন এবং কী বলেছেন। ইমামগণ তাদের ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছেন, তোমরাও গবেষণা করো। শুধুমাত্র আমার কথার ওপর নির্ভর করো না। সুতরাং যারা সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে পারে না অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করাটা নিতান্তই বোকামি।

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْت لِأَحْمَدَ: الْأَوْزَاعِيُّ هُوَ أَتْبَعُ مِنْ مَالِك؟ قَالَ: لَا تُقَلِّدْ دِينَك أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ،

-"যেমন ইমাম আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি ইমাম মালেককে অনুসরণ করব নাকি ইমাম আওযায়ীকে? ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তর দিলেন,

لَا تُقَلِّدْ دِينَك أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ،

-"দ্বীনের ব্যাপারে এদের কারও অনুসরণ করো না। রাসূল (ﷺ) থেকে যা কিছু এসেছে, সেগুলো গ্রহণ করো।"[ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড -২, পৃষ্ঠা-১৩৯]

এখানে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইমাম আবু দাউদকে বলেছেন, তুমি তাদের অনুসরণ করো না। ইমাম আবু দাউদের মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিসকে নিষেধ করেছেন। এমন নয় যে, যাদের শরীয়তের বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই, কিংবা যাদের জ্ঞান সীমিত, তাদের জন্য এ কথা বলা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম মুযানী (রাহিমাহুল্লাহ) কে বলেছেন,

قال الشافعى للمزنى: يا إبراهيم لا تقلدنى فى كل ما اقول!! وانظر فى ذلك لنفسك فإنه دين

-"হে ইবরাহীম! আমার প্রত্যেকটি কথার ওপর আমল করো না। বরং সে ব্যাপারে তুমিও চিন্তা করো। কেননা এটি দ্বীন।" [আল-মাল মাদখাল লিদিরাসাতিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়া, আহমাদ শাফেয়ী, পৃষ্ঠা-১০৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ)-এর এ বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমামগণ কাদেরকে কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের সময়ে কেউ যদি ইমাম মুযানি (রহিমাহুল্লাহ) যে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, তার তিন ভাগের এক ভাগও অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য হয়তো এ কথা মেনে নেওয়া সম্ভব যে, সে ইমামদের তাকলীদ করবে না। কিন্তু অযোগ্য লোকদের জন্য এ বিষয়টি কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়।

ইমামগণ কী বলেছেন ঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) সহ ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে যে নিষেধ করেছেন, তাদের এ সমস্ত বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ হলো,

وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا.

-"তারা যেমন সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাস'আলা গ্রহণ করেছে, তোমরাও সেখান থেকে মাসআল গ্রহণ করো।"[ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, আল্লামা ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা-১৩৯] এ নির্দেশ তাদেরকেই প্রদান করা

হয়েছে, যারা সরাসরি কোরআন ও হাদীস থেকে মাস'আলা গ্রহণের যোগ্য অর্থাৎ যারা মুজতাহিদ। মূল বিবেচনার বিষয় এটিই। ইমামগণ শুধু তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেননি, সাথে সাথে এও বলেছেন, তোমরা কোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণ করো।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের মুখে এ ধরনের কথা কখনও শোভা পায় না যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফকে নিষেধ করেছেন, যিনি একজন বিখ্যাত মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি আমাদের মতো অন্ধ-মূর্খদেরকে বলেননি যে, আমাদের অনুসরণ করো না। তাদের উদ্দেশ্য যদি সেটিই হতো, তবে তারা জীবনেও কখনও কোনো ফাতওয়া দিতেন না। কেননা, অনুসরণের বিষয় আসে পরে। ইমাম ফাতওয়া না দিলে, মানুষ অনুসরণই করতে পারত না। ইমামগণ সর্বসাধারণকে যদি সরাসরি কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করতে বলতেন তবে তাদের নিকট কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এলে বলে দিতেন, 'কোরআন ও হাদীস দেখে নাও'। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা সাধারণ মানুষের জন্য গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী উলামাদের অনুসরণকে আবশ্যক মনে

করতেন। কেননা এ ব্যাপারে সকল যুগের সকল উলামা একমত যে, শরীয়তের বিষয়ে অনুমান করে কোনো মাস'আলা দেওয়া জায়েয নেই।

সুতরাং যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য এ নির্দেশনা নয়। বরং এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যারা মুজতাহিদ নয়, তাদের জন্য অন্যের অনুসরণ করা জরুরি। কিন্তু আমাদের সমাজে একশ্রেণীর অজ্ঞ লোক রয়েছে, যারা নিজেদেরকে শরীয়তের বিষয়ে অনেক বড় জ্ঞানী মনে করে, তারা নিজেদেরকে মহা জ্ঞানী মনে করলেও তারা যে জানে না কিংবা খুব কম জানে, সেটিও তারা জানে না।

এ বিষয়ে প্রত্যেকের সুস্পষ্ট ধারণা রাখা উচিত যে, ইমামগণ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ সমস্ত কথা বলেননি, যারা ইজতেহাদের যোগ্য নয়। অথচ বর্তমান সময়ে দু-একটি হাদীস পড়ে, হাদীসের দু-একটি কিতাব পড়ে, মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করে বলেন যে, ইমামগণ তাদেরকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমামগণ সে সমস্ত লোককে কিভাবে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দেবেন, যারা কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের কাতারে। কেউ যদি ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যকে অসৎ উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োগ করতে চায়, তবে সে নিঃসন্দেহে ইমামের ওপর মিথ্যারোপ করল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ)-এর নিম্নের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে–

আল্লামা মাইমুনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) আমাকে বলেছেন,

يا أبا الحسن! إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيه إمام

'হে আবুল হাসান! যে মাস'আলায় তোমার কোনো ইমাম নেই , সে মাসআলায় সম্পর্কে কিছু বলা থেকে বিরত থাকো।" আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে–

مَنْ تَكَلَّمَ فِي شئ ليس له فيه إمام أخاف عَلَيْهِ الخَطَا

'যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে কথা বলল, যে বিষয়ে তার কোনো ইমাম নেই, তবে আমি তার ভুল করার ব্যাপারে ভয় করছি? [আল-ফুরু, আল্লামা ইবনে মুফলিহ্ (রহিমাহুল্লাহ), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮০]

إنما هو يعنى العلم ما جاء من فوق

হযরত আছরম (রহ.) বলেন, 'ইমাম মালেক (রহ.) পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত ইলমকেই ইলম বলতেন।' [আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬২]

এ সমস্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর এক ছাত্রকে বলছেন, কারও অনুসরণ করো না, সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো, আরেকজনকে বলছেন, কোনো ইমামের অনুসরণ ব্যতীত কোনো মাসআলা প্রদান করো না। তবে কি তিনি স্ববিরোধিতার আশ্রায় নিয়েছেন? কখনও নয়। বরং তিনি যে ইজতেহাদের যোগ্য, যে সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করতে সক্ষম তাকে বলেছেন, তুমি কাউকে অনুসরণ করো না, সরাসরি কোরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করো। অথচ বর্তমান সময়ে মাস'আলা বের করা তো দূরে থাক, শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে যার অবস্থান পাতালে, সে নিজেকে মনে করে যে, সে ছুরাইয়্যা তারকার ওপর রয়েছে।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিচের উক্তিটি লক্ষ করুন!

عَنْ خَلَفِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: مَا أَجَبْتُ فِي الْفُتْيَا حَتَّى سَأَلْتُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي: هَلْ يَرَانِي مَوْضِعًا لِذَلِكَ؟ سَأَلْتُ رَبِيعَةَ وَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ فَأَمَرَانِي بِذَلِكَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَلَوْ نَهَوْكَ، قَالَ: كُنْتُ أَنْتَهِي لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَرَى نَفْسَهُ أَهْلًا لِشَيْءٍ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ

-"খালাফ ইবনে উমর (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.) কে বলতে শুনেছি'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফাতওয়া দেইনি, যতক্ষণ না আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তারা আমার অবস্থানকে সঠিক বলেন কি না। আমি রবীয়া (রহ.) এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করতাম। তারা আমাকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিতেন। খালাফ ইবনে আমর (রহ.) বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ .) কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি তারা আপনাকে নিষেধ করতেন? ইমাম মালেক (রহ.) উত্তর দিলেন, 'তবে আমি ফাতওয়া থেকে বিরত থাকতাম।' কারও জন্য কোনো বিষয়ে নিজেকে যোগ্য মনে করা উচিত নয়, যতক্ষণ না সে তার চেয়ে যোগ্য কাউকে জিজ্ঞেস করে।' [আল-হুলিয়াতুল আউলিয়া, আল্লামা আবু নুয়াইম (রহ.), খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৬] এ বিষয়ে আমাদেরকে লক্ষ করতে হবে যে, ইমামগণ যাদেরকে বলেছেন, 'তোমরা অনুসরণ করো না', তারা ইমামগণের এ সমস্ত নির্দেশ থেকে কী বুঝেছেন?

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.) কে বলেছেন–

لا تكتب كل ما تسمع مني

'তুমি আমার নিকট থেকে যা শ্রবণ করো, যাচাই-বাছাই না করে তা লিপিবদ্ধ করো না।'

ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.) এ নির্দেশের কারণে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাসআলা লেখা বাদ দিয়েছেন? ইমাম আবু দাউদকে (রহ.) কে ইমাম আহমাদ (রহ.) কারও অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, ইমাম আবু দাউদ কি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব ছেড়ে দিয়েছেন?

এভাবে ইমামগণ যাদেরকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কেউ যদি সংশ্লিষ্ট ইমামের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, তবে আমরা কেন ইমামদের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে থাকি? এবং কেন মানুষকে মাযহাববিদ্বেষী করতে এ ধরনের উক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকি? এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নিকট মুজতাহিদ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে, সেগুলো উল্লেখ করে লেখেছেন–

فإن أنت قبلت هذه النصيحة، وسلكت الطريقة الصحيحة، فلتكن همتك؛ حفظ ألفاظ الكتاب والسنة، ثم الوقوف عَلى معانيها بما قال سلف الأمة وأئمتها، ثم حفظ كلام الصحابة والتابعين وفتاويهم وكلام أئمة الأمصار، ومعرفة كلام الإمام أحمد وضبطه بحروفه ومعانيه، والاجتهاد عَلى فهمه ومعرفته.

وأنت إذا بلغت من هذه الغاية: فلا تظن في نفسك أنك بلغت النهاية، وإنما أنت طالبٌ متعلم من جملة الطلبة المتعلمين. ولو كُنتَ بعد معرفتك ما عرفتَ موجودًا في زمن الإمام أحمد، ما كنت حينئذٍ معدودًا من جملة الطالبين. فإن حدثتك نفسك بعد ذلك أنك قد انتهيت أو وصلت إلى ما وصل إِلَيْهِ السَّلفُ، فبئس ما رأيت.

-"তুমি যদি আমার নসীহত গ্রহণ করে থাকো এবং সঠিক পথের অনুসন্ধানী হয়ে থাকো, তবে তোমার লক্ষ্য থাকবে– তুমি কোরআন ও সুন্নাহর সমস্ত বিষয় মুখস্থ ও আয়ত্ত করবে, অতঃপর পূর্ববর্তীগণ ও ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অবগত হবে, অতঃপর তুমি সাহাবী, তাবেঈনদের বক্তব্য ও তাদের ফাতওয়াসমূহ মুখস্থ করবে এবং বিভিন্ন শহরের উলামায়ে কেরামের যে সমস্ত বক্তব্য রয়েছে, সেগুলোও মুখস্থ করবে। সাথে সাথে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য মুখস্থ করবে, তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করবে এবং তার মর্ম উদ্‌ঘাটনে তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তুমি এ সমস্ত কিছু করার পরে মনে করো না যে, তুমি শেষ স্তরে পৌঁছে গেছ, বরং তুমি তখনও

অন্য শিক্ষার্থীদের মতো একজন সাধারণ শিক্ষার্থী। তুমি এসব কিছু অর্জনের পরও যদি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)-এর যুগে থাকতে, তবে তুমি তাঁর ছাত্র হওয়ার যোগ্য হতে না। উপরোক্ত বিষয়ের ইলম অর্জনের পরে যদি তোমার অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি হয়, তুমি ইলমের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেছ, কিংবা পূর্ববর্তীগণ যে স্তরে পৌঁছেছিলেন, সে স্তরে পৌঁছে গেছ, তবে তুমি বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা পোষণকারী।'(মাজমাউ রসায়েলে ইবনে রযব হাম্বলী, ২/৬৩৪পৃ.)

'ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর নিজের সময়ের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখেছেন,

كما هو حال أهل هذا الزمان. بل هو حالُ أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغايات، والانتهاء إلى النهايات، وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات.

-"বর্তমান সময় কিংবা পূর্বের কয়েক যুগ থেকে কিছু লোক দাবি করে থাকে যে, তারা শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত স্তরে উন্নীত হয়েছে, অথচ বাস্তবতা হলো, তাদের অধিকাংশ এখনও প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতে পারেনি।'(মাজমাউ রসায়েলে ইবনে রযব হাম্বলী, ২/৬২৯পৃ.) তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছেন-

وإيّاك ثم إيّاك أن تترك حفظ هذه العلوم المشار إليها، وضبط النصوص والآثار المعول عليها، ثم تشتغل بكثرةِ الخصام والجدال، وكثرة القيل والقال، وترجيح بعض الأقوال عَلى بعض الأقوال مما استحسنه عقلك،... ولا تكن حاكمًا عَلى جميع فرق المؤمنين، كأنك قد أوتيت علمًا لم يؤتوه، أو وصلت إلى مقامٍ لم يصلوه.

'সাবধান! সাবধান! পূর্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোরআন ও সুন্নাহের নস ও আমলে মুতাওয়ারিছা (শ্রেষ্ঠ তিন যুগ থেকে প্রচলিত আমল) সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে (অর্থাৎ মুজতাহিদ না হয়ে) তুমি তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকো। আর বেঁচে থাকো দ্বীনের ব্যাপারে অমূলক প্রশ্ন ও মন্তব্য থেকে এবং তোমার পছন্দ অনুযায়ী এক ইমামের বক্তব্যকে আরেক ইমামের বক্তব্যের ওপর প্রাধান্য দেওয়া থেকে। মুমিনদের সকল দলের ব্যাপারে তুমি বিচারক সেজো না! তোমার ভাবখানা এমন যে, তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি, তোমার কাছে এমন এলম পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তীদের কাছে পৌঁছেনি। (মাজমাউ রসায়েলে ইবনে রযব হাম্বলী, ২/৬৩৪-৬৩৫পৃ.)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর এ উপদেশ সকলের হৃদয়ে গেঁথে নেওয়া উচিত। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর জন্ম ৭৩৬ হি. এবং মৃত্যু ৭৯৫ হি. অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সাত শ' বছর পূর্বে তিনি এ কথাটি বলেছেন। অতএব, আমাদের সময়ের এ সমস্ত স্বশিক্ষিত এবং তথাকথিত মুজতাহিদ ইমামদের সম্পর্কে তাদের মন্তব্য কী হতো?

আহলে হাদিসদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন,

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: أَكْثَرُ مَا يُفْسِدُ الدُّنْيَا: نِصْفٌ مُتَكَلِّمٌ وَنِصْفٌ مُتَفَقِّهٌ وَنِصْفٌ مُتَطَبِّبٌ وَنِصْفٌ نَحْوِيٌّ هَذَا يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْبُلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللِّسَانَ.

-"দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে, আধা বক্তা, আধা ফকীহ, আধা ডাক্তার এবং আধা ভাষাবিদ। এদের একজন (আধা বক্তা) দ্বীনকে ধ্বংস করে, অপরজন (আধা ফকীহ) দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে। আধা ডাক্তার মানুষের শরীরকে নিঃশেষ করে। আর আধা ভাষাবিদ ভাষাকে বিনষ্ট করে।" [মাজমাউল ফাতাওয়া, খণ্ড - ৫, পৃষ্ঠা-১১৮-১১৯]

আমাদের সমাজে শরীয়তের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ শিশু। অনেকেই এখনও ক্লাস ওয়ানে ওঠারও যোগ্যতা অর্জন করেনি। অথচ ভাবখানা এমন যে উক্ত বিষয়ে ডক্টরেট করেছেন। তাঁরা ডক্টরেট করেন এক বিষয়ে আর সিদ্ধান্ত দেন আরেক বিষয়ে। সারা জীবন ইঞ্জিনিয়ার থেকে প্রেসক্রিপশন দিতে গেলে যা হয় আর কী! এ জন্যই হয়তো রবীয়া ইবনে আবু আব্দুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

الناس فى حجور علمائهم كالصبيان فى حجور أمّهاتهم

-"মায়ের কোলে যেমন শিশু, তেমনি আলেমদের কোলে সাধারণ মানুষ।"[৩১৭] বিখ্যাত তাবেয়ী এবং সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ছাত্র ইমাম মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

عَن مُجَاهِد قَالَ: " ذهب الْعلمَاء فَلم يبْق إِلَّا المتعلمون، مَا للمجتهد فِيكُم الْيَوْم إِلَّا كاللاعب فِيمَن كَانَ قبلكُمْ.

-"আলেমগণ গত হয়েছেন, এখন শুধু বক্তারা রয়ে গেছে, আর তোমাদের মাঝে যারা 'মুজতাহিদ' রয়েছে, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তারা তামাশাকারী।" (ইমাম বুখারী, তারিখুল কাবীর, ১/২৯৩পৃ. ক্রমিক. ১০৩৭, ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ৫৭/৩৭পৃ. আবু নুয়াইম, ইস্পাহানী, ৩/২৮০পৃ.)

৩১৭. শরহু ইবনু আবি লঈয, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৫

৭২. নামাযের সঠিক পদ্ধতী সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক নামাযের সঠিক পদ্ধতি এবং চার মাযহাবের নামায ভিন্ন হওয়া প্রসঙ্গে লিখেন-"সালাতের বিভিন্ন নিয়ম এখানে বিস্তারিতভাবে পাবেন, লিখেছেন শেখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী। বইটিতে সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি পাবেন। এ বইটি পড়ে দেখতে পারেন। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো যে সালাত আদায়ের সময় এ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিয়মমাত্র একটাই।"[৩১৮] ডা. জাকির নায়েক তার এ বক্তব্যে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আলবানীর নামাযের পদ্ধতি বইটি সহিহ হাদিসের আলোকে লেখা এবং নামাযের সঠিক পদ্ধতি একটাই হবে। ডা. জাকির নায়েকের এ কথার দ্বারা অনেক হাদিসকে অস্বীকার করা হয়-যেগুলোতে নামাযের একাধিক নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাইতো সাহাবা-তাবেয়ীন ও সালফে সালিহীনের সময় থেকেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্নতার সাথে নামায আদায়ের নিয়ম চলে আসছে। সেই ভিত্তিতেই চার মাযহাব নামাযের নিয়মে বিভিন্নতা দেখা যায়। যার যার মাযহাবের আমল হিসেবে এগুলো সবই হক। (প্রমাণে দেখুন, সহিহ বুখারী, হাদিস নং. ৪১১৯, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং. ১৭৭০, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং. ৩৩৪, শাতেবী, আল-ই'তিসাম, ২/২৬৪পৃ. ইবনুল কাইয়্যম, ই'লামুল মুয়াক্কীন, ৩/৩৮৩পৃ. ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/১৯৮পৃ.)

কিন্তু বিভিন্ন সময় কুচক্রী মহলের দ্বারা কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী আইম্মায়ে উম্মতের মাধ্যমে গৃহীত উক্ত নামায়ের বিভিন্ন নিয়মকে অস্বীকার করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটানোর ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হয়েছে। ডাক্তার জাকির নায়েকের উক্ত মতবাদ সেই চক্রান্তের সূত্রেই গাঁথা। বলা বাহুল্য, এটা কথিত আহলে হাদিস লা-মাযহাবীদের হাল যমানার এক ভয়াবহ ফিতনা বৈকি।

৭৩. নামাযে শয়তানের উপস্থিতির হাদিসকে অপব্যাখ্যা করে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন হাদিস শরিফে বলা হয়েছে যে-"তোমরা নামাযের কাতারের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করো এবং শয়তানকে বুঝানো হয়নি। বরং শয়তান বলে মানুষের বিভেদকে বুঝানো হয়েছে-উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, ধনী-গরীব-এর বিভেদ।"[৩১৯] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ডা. জাকির নায়েক হাদিসটিতে বর্ণিত কাতারের মধ্যে শয়তানের প্রত্যক্ষ অবস্থানকে অস্বীকার করে ভিন্ন ব্যাখ্যা করলেন! অথচ হযরত আনাস ইবনে মালিক (ﷺ) হতে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাতারের মাঝে শয়তানের উপস্থিতি সম্পর্কে কসম খেয়ে স্পষ্ট করে বলেন-

৩১৮ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৪৫পৃ.
৩১৯ .ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/১৫পৃ.

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

"তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলেমিশে দাঁড়াও, কাতারগুলো কাছাকাছি কর এবং কাঁধসমূহে বরাবর হয়ে দাঁড়াও। যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয় আমি শয়তানকে নামাযের কাতারের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছি-তার আকৃতি হলো সে কালো বকরীর বাচ্চা।[৩২০] এ হাদিসটিকে ডা. জাকির নায়েকের ইমাম আলবানী পর্যন্ত সহিহ বলেছেন।[৩২১] এ হাদিসটি অন্য সাহাবী হযরত আবু উমামা (ﷺ) এর সূত্রে বর্ণিত আছে।[৩২২] সুতরাং এটা বাস্তব বিষয়-তার অন্য কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক তাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে প্রকারান্তরে হাদিসটি অস্বীকার করেছেন। যা মারাত্মক পথভ্রষ্টতা ও ঈমানবিধ্বংসী কাজ।

৭৪. বাইবেল, গীতা, রামায়ণ, বেদ ইত্যাদি পড়া কি মুস্তাহাব ?

ডা. জাকির নায়েকের কাছে একজন জানতে চান যে বাইবেল রামায়ন গীতা ইত্যাদি পড়াতে কী উপকারিতা আছে? তিনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেন-"এটা আসলে ইসলামে ঠিক ফরয না। এটা হল মোস্তাহাব।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৪৫৭পৃ.) তিনি আরও একটু অগ্রসর হয়ে আবারও উপদেশ দিচ্ছেন যে, "এজন্য অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত। তবে ফরয না। আমি বলব এটা মুস্তাহাব।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৪৫৭পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এ সমস্ত কাল্পনিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করা দাঈ ছাড়া এমনিতেই সাধারণ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। অপরদিকে মুস্তাহাব বলা তো কুফুরী পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন ছাড়া কিছুই নয়।

৭৫. জাকির নায়েক বাইবেল, গীতা, রামায়ন, বেদ ইত্যাদি পড়ার উপদেশ ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন, "এজন্য অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৪৫৭পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এটি মনগড়া বক্তব্য। এ বক্তব্য দিয়ে তিনি মুসলমানদেরকে বিশৃঙ্খলায় ফেলে দিতে চাচ্ছেন। দাঈ ছাড়া সাধারণ কোন লোকদের জন্য এ সমস্ত জাল ও

৩২০ .সুনানে আবু দাউদ, ১/১৭৯পৃ. হাদিস নং. ৬৬৭, সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং. ৮১৬, সহিহ ইবনে হিব্বান,৫/৫৩৯পৃ. হাদিস নং. ২১৬৬
৩২১ .আলবানী, সহিহুল সুনানে আবু দাউদ, ১/১৭৯পৃ. হাদিস নং. ৬৬৭, আলবানী, সহিহুল সুনানে নাসায়ী, হাদিস নং. ৮১৬
৩২২ .তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/৪০৪পৃ. হাদিস নং.১৫৮৭,

বিকৃত গ্রন্থ পড়া নিষিদ্ধ। কেননা, এগুলো বিকৃত সাধন হয়েছে অপরদিকে সাধারণ কোন জ্ঞানী লোক সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে অক্ষম তাই।

৭৬. মুসলমান কি শুধু 'হাদিসে সহিহ' হাদিসই অনুসরণ করবে?

ডা. জাকির নায়েক বলেন, "আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, হাদীসের কিছু প্রকারভেদ আছে। কিছু হাদীস আছে যেগুলোকে বলা হয় 'সহীহ হাদিস', আবার কিছু হাদীস আছে যেগুলো 'দ্বয়ীফ বা দুর্বল হাদীস' আবার এমনও কিছু হাদীস আছে যেগুলো মাওযু তথা জাল হাদীস বা বানানো হাদীস নামে অভিহিত। মুসলিমরা কোন হাদিসগুলো মান্য করবে? ঐ হাদীসগুলো মুসলিমরা মেনে চলবে যেগুলো সহীহ তথা নির্ভুল হাদীস।"[৩২৩] তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বলে, "এ হাদীসগুলোর মধ্যে যেটিকে আমি মানবো তা হলো- সহীহ হাদীস।"[৩২৪] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! জাকির নায়েক এ নীতি আহলে হাদিসদের থেকে নেয়া। তার এ বক্তব্যে মুহাদ্দিসদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি নীতিমালা হাদিসে 'হাসান' এর আমল অস্বীকার এবং দ্বঈফ সনদের হাদিস সহিহ হাদিসের মুখালিফ বা বিরোধী না হলে তার উপর আমল করা বৈধ কে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন।

'হাসান' হাদিসের হুকুম ঃ

সকল মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদিসে 'হাসান; এর মর্যাদা 'হাদিসে সহিহ' এর মতই। আবার অনেক সর্বজন সমাদৃত মুহাদ্দিস এও বলেছেন যে হাদিসে 'হাসান' সহিহ হাদিসেরই প্রকার; যদিও বা গুণাবলীর দিক থেকে হাদিসে সহিহ এর মত নয়। যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

وهذا القِسمُ مِنَ الْحَسَنِ مشاركٌ للصحيح في الاحتجاج به، وإنْ كان دُونَهُ، -

-"ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, হাদিসে 'হাসান' সহিহ হাদিসেরই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং শরিয়তের দলিল রূপে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সহিহ হাদীসের সাদৃশ্য, যদিও মরতবায় (কিছুটা) কম।"[৩২৫] এখানে অনেক মুহাদ্দিসের দলিল দেয়া যেতে পারে কিন্তু আমি এখানে শুধু এমন একজন মুহাদ্দিসের দলিল দিলাম যার বুলুগুল মারাম, বুখারীর শরাহ ফতহুল বারী কিতাবসহ উনার সকল বক্তব্য

৩২৩ . জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৬৬পৃ.

৩২৪ . জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৬৬পৃ.

৩২৫ ইবনে হাজার আসকালানী : নুখবাতিল ফিকির, প্রথম খন্ড,পৃ ৭৮,মাতবাআতে সাফির বিল রিয়াদ, সৌদি আরব।

জাকির নায়েক ও আহলে হাদিসরা মানেন। বুঝতে পারলাম জাকির নায়েক হাজার হাজার 'হাসান' হাদিসের আমল থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চেয়ে কুফুরী করেছেন।

দ্বঈফ সনদের হাদিসের হুকুম ঃ

জাকির নায়েক দ্বঈফ সনদের হাদিসের উপর আমল করাকে নিষেধ করলেন। অথচ সমস্ত পূর্বসূরী ইমাম, উলামাগণ একমত যে দ্বঈফ সনদের হাদিস যদি সহিহ হাদিসের মুখালিফ বা বিরোধী না হয় তাহলে এর উপর আমল করতে পারবে এবং অবহেলা ইনকার করতে পারবে না। বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়াবিদ এবং মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) ফতোয়ায়ে শামীর ১ম খণ্ড باب الاذان এ লিখেন,

وَالْعَارِفِ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ كُلٍّ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، عَلَى أَنَّهُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ،-

-"আরিফকুল সম্রাট ইমাম শা'রানী (রহ.) বলেন, নিশ্চয় চার মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন সহিহ হাদিস হলো আমাদের মাযহাব। কিন্তু ফাযায়েল আমলের জন্য দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিস আমল করা যায়েজ। যা আমি কিতাবুত ত্বাহারাত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।"[৩২৬] বুঝা গেল নায়েকের কথা চার মাযহাবের ইমামের বিরোধী। বিশ্ববিখ্যাত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকিহ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) "তাফসীরে রুহুল বায়ানে" বলেন,

لكن المحدثين اتفقوا على ان الحديث الضعيف يجوز العمل به فى الترغيب والترهيب—

-"তবে মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আকর্ষণ সৃষ্টি ও ভীতি সঞ্চারের বেলায় দ্বঈফ হাদিস অনুযায়ী আমল করা যায়েয।"[৩২৭] ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال:مقدمة المؤلف

-"ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন দুর্বল হাদিস ফাযায়েলে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য।"[৩২৮] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহ.) বলেন,

৩২৬ .ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : ফতোয়ায়ে শামী, পৃ-১/৩৮৫ পৃ, কিতাবুল আযান, দারুল ফিকর, ইলমিয়্যাহ, বয়রুত,লেবানন।

৩২৭ . আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : রুহুল বায়ান, ২/৪১০ পৃ.

৩২৮ . আল্লামা ইমাম নাওয়াবী : আরবাঈন : ১/৪২ পৃষ্ঠা

(وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ) الضَّعِيفَةِ (وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وغيرها (مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ)وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالُوا: إِذَا رُوِّينَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا، وَإِذَا رُوِّينَا فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا.-

-"মুহাদ্দিস ও অন্যান্য ওলামাদের বক্তব্য হলো দুর্বল সনদ সম্পর্কে অথবা কিছু ছাড় দেওয়া এভাবে যে মওদু বা বানোয়াট না হয়, তা ফাযায়েল আমল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমল করা বৈধ আছে। যদি তা আহকাম ও আকায়েদের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। যে ইমামগণ এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইবনে মাহদী ও ইমাম ইবনুল মোবারক রয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, আমরা হালাল হারামের মধ্যে হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে কঠিনতা অবলম্বন করেছি এবং ফাযায়েল বর্ণনার ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করেছি।"[৩২৯] আল্লামা ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً–مقدمة المؤلف:فصل فى الامر بالاخلاق

-"মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরাম এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ফাযায়েল বা উৎসাহিত করা ও ভয়ভীতি প্রদান বা গ্রহণ করা হাদীসে দ্বঈফ দ্বারা যায়েজ আছে যদি তা জাল বর্ণনা বা জাল হাদিস না হয়।"[৩৩০] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন,

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ-

-"দ্বঈফ হাদিস ফাযায়েলে আমলের মধ্যে আমল করার ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য হয়েছে। এই জন্য আমাদের ইমামগণ বলেছেন গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব অথবা সুন্নাত প্রমাণিত হয়েছে।"[৩৩১] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) আরও বলেন-

৩২৯ .আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সূয়ুতী : তাদরীবুর রাবী, ১/৩৫১ পৃ.

৩৩০. আল্লামা ইমাম নাওয়াবী : কিতাবুল আযকার, ১/৮ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩৩১ .আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মওদুআতুল কবীর : ১/৩১৫ .পৃ.৪৩৩

أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ-

-"সমস্ত ইমাম মুহাদ্দিস ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ফাযায়েলে আমলের জন্য দ্বঈফ বা দুর্বল হাদিস দ্বারা আমল করা বৈধ।"[৩৩২] বুঝা গেল চার মাযহাবের ইমামসহ, সকল ইমাম, মুহাদ্দিস ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে দ্বঈফ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ। সকল ফুকাহা এ বিষয়ে একমত যে যখন কোন মাসয়ালায় ইজমা সংঘটিত হবে তা অস্বীকার করা কুফুরী। তাই আপনারই বলুন তাদের ফতোয়ায় নায়েক সাহব এখন কী হবেন? এটি পাঠকের বিবেকের আদালতেই রইল।

৭৭. রাসূল (ﷺ) কে মানা কী আমাদের জন্য হারাম ?

ডা. জাকির নায়েক খাজা গরীবে নেওয়াজ (রহ.) এর দরবার ছাড়তে বলছেন ও তাঁর কাছে কিছু চাওয়া এমনকি ছাড়ার কথা বলতে গিয়ে একপর্যায়ে সর্বশেষে রাসূল (ﷺ) কে মানা আমাদের জন্য হারাম। তার এ বক্তব্যটি সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

ডা. সাহেবের বক্তব্যটির ইউটিউব লিংক দেয়া হলো আপনারা যারা চান ডাউনলোড করে নিতে পারেন (Dr. Zakir Naik Gustakh e Rasool (S.A.W_low) এ শিরোনামে। তিনি তার এ বক্তব্যে বলেছেন-"আজ কে দিন মেঁ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কো ভি মাননা হামারে লিয়ে হারাম হ্যায়" (অর্থ-আজকের দিনে মুহাম্মদ (ﷺ) কেও মান্য করা আমাদের জন্য হারাম।"

এর কারণে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে তোলপাড় হয় এবং এ কারণে অনেকে তাকে কাফির ফাতওয়া দেন। এ নিয়ে তখন ভারতে মুসলমানগণ ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে জনসভা ও মিছিল করেন। আর এরই সূত্রে ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। তখন হাইকোর্টের পক্ষ থেকে ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোওয়ানা জারী করা হয় এবং মুম্বাইতে তার কনফারেন্সের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। পরিশেষে ডা. জাকির নায়েক ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে তার অনভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতঃ সেই উক্তিটি সব্কতে লেসানী (মুখ ফসকে বের হওয়া ভুল) বলে প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং ভবিষ্যতে এ রকম কথা না বলার অঙ্গীকার করে মুচলেকা দিয়ে হাইকোর্টে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক জামিন লাভ করেন।

৩৩২ .আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : মেরকাত : ৩/৪৯ কিতাবুস সালাত : হাদিস : ১১৭৩

এ সম্পর্কে তথ্য জানতে নিম্নের লিঙ্কে লগইন করুন-

http://www.youtube.com/watch?v=7NIiNV1s3To

৭৮. দাড়ি রাখা কী ফিকহী সুন্নাত?

ডা. জাকির নায়েক বলেন,"আমার ধারণা হলো এটি ফিকহী সুন্নাত ।"[৩৩৩]

পর্যালোচনা ঃ আমাদের নবির আগেও অসংখ্য নবি-রাসূল দাড়ি রাখতেন; কুরআনে মূসা (ﷺ) তার ভাই হারুন (ﷺ)-এর দাড়ি মোবারকে ধরেছিলেন বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই দাড়িকে শুধু ফিকহী সুন্নাত বলা সত্যকে অস্বীকার এবং জাহেল ছাড়া ছাড়া কিছুই প্রমাণিত হয় না। দাড়ি রাখার বিষয়টি কোন ফকিহগণের দেওয়া বিধান নয়; বরং রাসূল (ﷺ) এ বিষয়ে আদেশ করেছেন-

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، واحفوا الشوارب

-"হযরত ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, দাড়িগুলো বৃদ্ধি কর এবং গোঁফগুলো কেটে ফেল।"[৩৩৪] অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে পাক রয়েছে।[৩৩৫]

৭৯. ডা. জাকির নায়েকের হায়াতুন্নবী (ﷺ) সংক্রান্ত আক্বিদা অস্বীকার ঃ

কোরআন হাদিসের অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূল (ﷺ) তার রওজা মোবারকে জীবিত রয়েছেন। আর এটি একটি অকাট্যভাবে প্রমাণসিদ্ধ আকীদা। সুতরাং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ বলে গণ্য হবে। তাই কোন মুসলমান এ আকীদাকে অস্বীকার করতে পারে না। আর যে জাকির নায়েকের মত যারা এ বিষয়টি অবিশ্বাস করবে বুঝতে হবে নিঃসন্দেহে তার কলব থেকে ঈমান বেরিয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর নিম্নের দলিলগুলো হল তার প্রমাণ।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে, ইসলামের এ অকাট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ডা. জাকির নায়েক অস্বীকার করে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বর্ণনাকে অবাস্তব বলে গণ্য করেছেন।

---

৩৩৩. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৩০৪পৃ.

৩৩৪. বুখারী, আস্-সহিহ, ৭/১৬০পৃ. হাদিস নং.৫৮৯২, সহিহ মুসলিম, ১/২২২পৃ. হাদিস নং. ২৫৯

৩৩৫. সহিহ মুসলিম, ১/২২২পৃ. হাদিস নং. ২৬০

কুরআনের বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রদান ঃ

তিনি শহীদগণের জীবিত থাকা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৫৪ নং আয়াত

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

-"আল্লাহর পথে যারা নিহত (শহীদগণ) হয়, তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত" উদ্ধৃত করে জাকির নায়েক বলেছে-

"এখানে অনেকে বলতে পারেন তাহলে তারা (শহীদগন) তো বেঁচে আছেন।"[৩৩৬] নাউযুবিল্লাহ

দেখুন কুরআনে আল্লাহ তাদেরকে জীবিত আছেন বলতেছেন অথচ সে কুরআনের বিরুদ্ধে সে যুক্তি উপস্থাপন করছেন। একজন ব্যক্তি কত বড় জালিম হলে এ সাহসিকতা দেখাতে পারেন?

নব্য কৌশলে হায়াতুন্নবী (ﷺ) অস্বীকার ঃ

ডা. জাকির নায়েক রাসূল (ﷺ) হায়াতুন্নবী (ﷺ) অস্বীকার করেছে তো করেছেই বরং সে ভুয়া যুক্তি উপস্থাপন করেছে এভাবে "এখানে অনেকে বলতে পারেন তাহলে তারা (শহিদগণ) তো বেঁচে আছেন। এখন যদি এই শহীদগণ জীবিত হন, তাহলে তো আমাদের নবীজীও বেঁচে আছেন। খুব সুন্দর যুক্তি। কিন্তু সাহাবীগণ এটাকে কিভাবে বুঝেছিলেন ? তারা কি ধরে নিয়েছিলেন যে, নবীজী বেঁচে আছেন ? তারা তো নবীজী (ﷺ) এর জানাযার নামায পড়েছেন, তাকে কবরস্থ করেছেন। এ ছাড়া সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে সাথীদেরকে কবর দিয়েছেন, তাদের জানাযা পড়েছেন। জীবিত কারো কি জানাযা পড়া যায় ? উত্তরে হবে-না, জীবিত কারো জানাযা পড়া যায় না।" এখানে কুরআন বলেছে-"শত্রুরা যখন উল্লাস করে বলে, তোমাদের লোকদের মেরেছি; তবে তাদের সাথে পরকালে দেখা হবে। আর তারাই হবেন লাভবান। এখানে শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার কথা বলা হচ্ছে না। যদি শারীরিকভাবে বেঁচে থাকবেন, তাহলে সাহাবীগণ তাদের কবর দেবেন কেন ?....।"[৩৩৭] নাউযুবিল্লাহ!!

---

৩৩৬ দ্রষ্টব্য : ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ৯৫ ॥ প্রকাশনায় : পিস পাবলিকেশন- ঢাকা.

৩৩৭ দ্রষ্টব্য : ডা. জাকির নায়েক, লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ৯৫ ॥ প্রকাশনায় : পিস পাবলিকেশন- ঢাকা

এ সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েকের লাইভ লেকচার ইন্টারনেটে পাওয়া যায় ইউটিউবের নিম্নোক্ত স্ক্রীপ্টে-

http://Zakir Naik – Questions andAnswers (Urdu (22_26)

http://Dr. Zakir Naik (Gustaakhe Rasool)

এভাবে কুরআন ও হাদিসের বহু স্থানে মনগড়া উক্তি করে ডা. জাকির নায়েক মারাত্মক গোমরাহীর সৃষ্টি করেছেন। তার সেসব গোমরাহী থেকে দূরে থাকা সকল মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য।

রাসূল (ﷺ) হায়াতুন্নবী হওয়ার কিছু গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ঃ

আমাদের নবিসহ সমস্ত নবি (عليهم السلام) তাদের স্ব-স্ব রওজা মোবারকে জীবিত এ প্রসঙ্গে এখানে সংক্ষিপ্ত বিষয়ের আলোকপাত করেছি। কেননা, দীর্ঘ আলোকপাত করতে গেলে কিতাব দীর্ঘয়িত হওয়ার সম্ভবনা বেশী।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ-

-"হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : নিশ্চয় আম্বিয়ায়ে কিরাম (عليهم السلام) তাঁদের নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং তারা সেখানে নামায আদায় করেন।"[৩৩৮] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (رحمه الله) বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। আর ডা. জাকির নায়েকের মাযহাবের ইমাম আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী তার দুটি গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে আল্লামা নুরুদ্দীন হাইসামী (رحمه الله) উক্ত হাদিসটির সনদ সর্ম্পকে বলেন,

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ.—

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু ই'য়ালা ও ইমাম বায্যার (رحمه الله) তাঁদের মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম আবু ই'য়ালার বর্ণনার বর্ণনাকারী সকল রাবি সিকাহ বা

৩৩৮ ক. ইমাম আবু ই'য়ালা : আল মুসনাদ : ৬/১৪৭ পৃ: হাদিস ঃ ৩৪২৫, ইমাম বায়হাকী : হায়াতুল আম্বিয়া : ৬৯-৭০পৃ. ইমাম হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/২১১পৃ. হাদিস ঃ ১৩৮১২, ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী : তবকাতে ইস্পাহানী : ২/৪৪ পৃ., ইমাম আদী : আল কামিল : ২/৭৩৯ পৃ:,ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী : আল-জামেউস সগীর : ১/২৩০ পৃ: হাদিস- ৩০৮৯, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী : শরহুস সুদূর: পৃ. ২৩৭, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : সিলসিলাতুস সহীহা : হাদিস নং- ৬২২, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : সহিহুল জামে : হাদিস নং- ২৭৯০, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ১/১১৯পৃ. হাদিস ঃ ৪০৩

বিশ্বস্ত।"[৩৩৯] এ প্রসঙ্গে সহিহ মুসলিম শরীফে আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যেখানে বর্ণিত আছে মি'রাজে মুসা (عليه السلام)এর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূল (ﷺ) দেখেন مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ -"তিনি মুসা (عليه السلام) তাঁর কবরের মাঝে দাড়িয়ে নামায পড়ছেন।"[৩৪০] হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) এর সূত্রে কিছু শব্দ বৃদ্ধি করে আরো হাদিস আছে এভাবে-

مَرَرْتُ – عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

-"রাসূল (ﷺ) বলেন, আমি মি'রাজের রাতে মুসা (عليه السلام) এর কবরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি তিনি রক্তিম লাল বালুর স্তূপের নিকট কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।"[৩৪১] অনুরূপ হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আরও সহিহ হাদিস রয়েছে, তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টি-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ – يَعْنِي نَفْسَهُ – فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ-

৩৩৯ .ক. ইমাম আবু ই'য়ালা, আল মুসনাদ : ৬/১৪৭ পৃ: হাদিস ঃ ৩৪২৫, ইমাম হাইসামী : মাযমাউদ যাওয়াইদ : ৮/২১১পৃ. হাদিস ঃ ১৩৮১২, মাকতুবাতুল কুদসী, কাহেরা, মিশর।

৩৪০ .ক. ইমাম মুসলিম : আস-সহীহ : ৪/১৮৪৫ : হাদিস : ২৩৭৫, ইমাম নাসায়ী : সুনান : ৩/১৫১ : হাদিস : ১৬৩৭,ইমাম আহমদ : মুসনাদ : ৩/১২০ পৃ:, ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ১৩/৩৫১ : হাদিস : ৩৭৬০, ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ১/২৪১ : হাদিস : ৪৯, ইমাম আবি শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ১৪/৩০৮ : হাদিস : ১৮৩২৪, ইমাম নাসায়ী : সুনানে কোবরা : ১/৪১৯ : হাদিস : ১৩২৯, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল-মুসনাদ : ৭/১২৭ : হাদিস : ৪০৮৫, ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৫/৫১৯ পৃ: হাদিস : ৩০৮৯, আল্লামা মুকরিযি : ইমতাঈল আসমা'আ : ১০/৩০৪ পৃ:

৩৪১ .ক. ইমাম মুসলিম : কিতাবুল ফাযায়েল : ৪/১৮৪৫ : হাদিস : ২৩৭৫, ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৩/১৪৮ পৃ:, ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ২/৩৮৭ পৃ:, ইমাম মানাবী : ফয়যুল কাদীর : ৫/৫১৯ পৃ:, ইমাম সুবকী : সিফাস সিকাম: ১৩৭ পৃ, ইমাম মুকরিযি : ইমতাঈ আসমা : ৮/২৫০পৃ:, ইমাম মুকরিযি : ইমতাঈল আসমা : ১০/৩০৪পৃ:, ইমাম সূয়তী : হাবীলিল-ফাতওয়া : ২/২৬৪ পৃ:,ইমাম সাখাভী : ক্বওলুল বদী : ১৬৮ পৃ, ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ৩/৫৭৭ পৃ. হাদিস : ৬৭২৭

-"রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাত্রে আম্বিয়া (عليهم السلام) এর এক বিরাট জামাতকে দেখেছি, মুসা (عليه السلام) কে তার কবরে নামায পড়তে দেখেছি। তাকে দেখতে মধ্য আকৃতির চুল কোঁকড়ানো সানওয়া দেশের লোকের মত। আমি ঈসা (عليه السلام) কে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি, তিনি দেখতে ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীর মত ..... তার পরে নামাযের সময় আসলো আমি সকল নবী (عليهم السلام)'র ইমামতি করলাম।"[৩৪২]

এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

حَيَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحْدِثُونَ وَيُحْدَثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ .

-"আমার হায়াত বা জীবন তোমাদের জন্য মঙ্গলময়; তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহনকরে কাজ করো, আর তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয় এবং আমার ওফাতও তোমাদের জন্য মঙ্গলময় হবে; কেননা, তোমাদের আমল আমি আমার রওযা শরিফ হতে দেখতে পাবো; তাতে আমি তোমাদের যা ভালো কাজ করতে দেখবো, সে জন্য মহান আল্লাহর শোকর বা তারীফ করবো, আর যখন তোমাদেরকে কোন মন্দ কাজ করতে দেখবো, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো।"[৩৪৩] আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (رحمه الله) সর্বশেষ বলেন-

حَيَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ هُوَ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَنَا عِلْمًا قَطْعِيًّا لِمَا قَامَ عِنْدَنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ فِي ذَلِكَ وَتَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ، وَقَدْ أَلَّفَ الْبَيْهَقِيُّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ، فَمِنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ

-"হায়াতুন্নবী (ﷺ) তথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় রওযা মোবারকে জীবিত এবং সমস্ত নবীগণই জীবিত যা অকাট্য জ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞাত। কেননা, এ ব্যাপারে আমাদের

৩৪২. ক. ইমাম মুসলিম : সহীহ : ফাদ্বায়েলে মূসা (আঃ) : ১/১৫৭ : হাদিস : ১৭৩, খতিব তিবরিজী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ৩/২৮৭ : হাদিস : ৫৮৬৬,ইমাম বায়হাকী : দালায়েলুল নবুয়ত : ২/৩৮৭ পৃ:,ইমাম তকি উদ্দিন সুবকী :শিফাউস-সিকাম : ১৩৫-১৩৮পৃ. ইমাম সূয়ূতী : আল-হাভীলিল ফাতওয়া : ২/২৬৫পৃ:, ইমাম সাখাভী : কওলুল বদী : ১৬৮পৃ., ইমাম মুকরিজী : ইমতাঈল - আসমা: ৮/২৪৯ পৃ:

৩৪৩ . মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং- ১৯২৫, ইবনে সা'দ, তবাকাতে কুবরা, ২য় খণ্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা. দাইলামী, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা.

নিকট দলীল প্রমাণ অকাট্য এবং এ প্রসঙ্গে অনেক মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণিত হয়েছে।" (আনবিয়াউল আযকিয়া)[৩৪৪] এ রাসূল (ﷺ) হায়াতুন্নবী বিষয় সর্ম্পকে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* এর প্রথম খণ্ডের এর ৪০৭-৪১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

৮০. ডা. জাকির নায়েক হায়াতুন্নবী অস্বীকার করে কি হবেন ?

সমস্ত উলামায়ে হক্কানী ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসের বিষয়কে অস্বীকার করা কুফুরী। তাহলে ডা. জাকির নায়েক রাসূল (ﷺ) হায়াতুন্নবী (ﷺ) আক্বীদার বিষয়টি অস্বীকার করে নিঃসন্দেহে কাফির হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৮১. পুরুষদের একাধিক বিবাহ কি মহিলাদের বেশ্যা হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য ?

ডা. জাকির নায়েককে একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন যে ইসলামে বহু বিবাহ কোন দিক থেকে মহিলাদের জন্য উপকারী? তিনি তার জবাবে একটি নোংরা উত্তর দিলেন যে, বেশ্যা হয়ে থাকবে এজন্য। নাউযুবিল্লাহ! (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৩৫৮পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এটি ডা. জাকির নায়েকের মনগড়া ব্যাখ্যা। কোন জাহেল ও চরিত্রগত সমস্যাবান ব্যক্তি ছাড়া এ ধরনের বক্তব্য কেউ দিতে পারেন না। ইসলামে নারীদের সকল ভরণ পোষণের ব্যবস্থা পুরুষ বা স্বামী করে থাকে। তাই কেউ যদি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে থাকলে এবং এক বা একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সকলের পরিপূর্ণ হক আদায় করতে পারেন তাই পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বা বিবাহের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এ সহজ বিষয়টিকে জাকির নায়েক মনগড়া ব্যাখ্যা করেছেন।

৮২. রাসূল (ﷺ) কি অধিক বিবাহ করেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ?

ডা. জাকির নায়েক রাসূল (ﷺ) ১১টি শাদী মোবারক করেছেন আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন,"এগুলো হয় তিনি রাজনৈতিক কারণে, না হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে করেছেন।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৩৫৬পৃ.) শুধু তাই নয় তিনি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে হযরত মা খাদিজা ও মা হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) এর বিবাহের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-"আর বাকি বিয়ে ছিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে-হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে, নয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৩৫৭পৃ.)

৩৪৪ ক. জালালুদ্দীন সূয়ূতী : আল হাভীলিল ফাতাওয়া : ২/১৪৯ পৃ.

পর্যালোচনা ঃ এটি রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি জাকির নায়েকের মিথ্যারোপ করার নামান্তর। তিনি কোন প্রমাণ ছাড়াই এ কথা কিভাবে বলার দুঃসাহস দেখাতে পারলেন? রাসূল (ﷺ) পৃথিবীর এ নোংরা রাজনীতি করেছিলেন? নাউযুবিল্লাহ!

তিনি আল্লাহর ইশারা ব্যতীত কোন কাজই করেননি; তাই কিভাবে জাকির নায়েক এ মনগড়া উক্তি আমাদের মু'মিনদের মাতাগণের বিষয়ে বলতে পারলেন?

৮৩. কুরআন কি উচ্চ মানের আরবী বই?

ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"আর কোরআন হচ্ছে উচ্চমানের আরবি বই।"**[৩৪৫]

পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! জাকির নায়েক মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামদের হেয় করে সমালোচনা করতে করতে এক পর্যায়ে এখন কুরআনকে আরবী বইয়ের সাথে তুলনা করছেন যা সম্পূর্ণ কুফুরী। এটি তার কুরআনের সাথে বিয়াদবীর দৃষ্টান্ত।

৮৪. ফাসিক-জালিম ইয়াযীদের প্রশংসা করে তার নাম নিয়ে "রহমাতুল্লাহি আলাইহি" বলেছেন ডা. জাকির নায়েক ঃ

ইয়াজিদ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে ডা. জাকির নায়েক ইয়াযীদকে 'ভাল মানুষ' বলে অভিহিত করেন। আর এ মর্মে তিনি ইয়াযীদের নাম উচ্চারণ করে বলেন- Yazid May Allah peace be upon on him. "ইয়াযীদ তার উপর আল্লাহর রহমত-শান্তি বর্ষিত হোক।"[৩৪৬] ডা. জাকির নায়েক উক্ত লেকচারে ইয়াযীদ সম্পর্কে মানুষের গাল-মন্দকে অতিরঞ্জিত বলে উল্লেখ করেন এবং ইয়াযীদকে ভাল মানুষরূপে প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি কারবালার যুদ্ধকে "বাতিলের বিরুদ্ধে হকের ঝাণ্ডাবাহী হযরত হোসাইন (ﷺ) এর আপোষহীন লড়াই" বলার পরিবর্তে একে "Political War (রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ)" বলে অভিহিত করেন (নাউযুবিল্লাহ)। **ড. তাহেরুল আল-কাদেরী ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্যের খণ্ডন পেতে আপনারা ইউটিউবে দেখতে পারেন।**[৩৪৭]

---

৩৪৫. ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৫১১পৃ.

৩৪৬. দ্রষ্টব্য : ডা.জাকির নায়েক উক্ত লেকচারে ওয়েবলিঙ্ক নিম্নে দেয়া হলো- http//www.youtube.com/watch?v=lmMQbR-48IU অথবা আপনারা এই শিরোনামেও তার এ বক্তব্যটি পেতে পারেন-" Yazeed The Criminal of Karbala & the Hero of Zakir Naik_low "

৩৪৭. আপনারা এই শিরোনামে তার এ বক্তব্যটি পেতে পারেন-" Reply to zakir naik LA on yazid topic by Dr.Tahir ul Qadri-2"

ইয়াযীদের ভয়াবহ অপরাধের লোমহর্ষক চিত্র

ইয়াযীদ তার তিন বছর আট মাসের অবৈধ শাসনামলে ভয়াবহ তিনটি মহাপাপ ও অন্যায়-অপরাধের জন্য ইসলামের ইতিহাসে কুখ্যাত ও ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। এ তিনটি মহাপাপের মধ্যে প্রথমটি হল- ৬১ হিজরীতে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন (ﷺ) কে নির্মমভাবে দমন করার ব্যবস্থা করা, যার প্রক্রিয়ার হযরত হুসাইন (রা.) কে কারবালায় আটক করে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয় এবং তার ছয় মাসের শিশুপুত্র আলী আসগরসহ নবীজীর (ﷺ) বংশের ১৮ জন আওলাদে রাসূলকে ও হযরত হুসাইন (ﷺ) এর ৭২/১০০ জন সাথীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

সাধারণ কোন মুসলমানের সাথেও লড়াই করে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কুফরী কাজ।[৩৪৮] **সেখানে হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বংশধরগণকে এরূপ অন্যায়ভাবে হত্যা করা কত অপরাধ-তা বলার অপেক্ষা রাখে না।** যারা এ মহা-অপরাধ করেছে, নিঃসন্দেহে তারা জঘন্য পাপী। তারা লা'নতের উপযুক্ত কাজ করেছে।

বস্তুত হযরত মু'য়াবিয়া (ﷺ) এর ওফাতের পর ইসলামী খিলাফতের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে ইয়াযীদ শক্তিদম্ভে দিশেহারা হয়ে যান। তিনি বিভিন্ন এলাকায় জুলুমের খড়গ কায়েম করেন। তার ব্যক্তিগত জীবনেও নানা পাপাচার ও অন্যায় কাজ পরিলক্ষিত হয়। যদ্দরুণ ইসলামের খিলাফতের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব তার দ্বারা আশা করা যাচ্ছিলো না।

তাই তৎকালীন সর্বাধিক যোগ্য ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব হযরত রাসূল (ﷺ) এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন (ﷺ) এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং তার হাতে ন্যায়নীতিপূর্ণ সঠিক ইসলামী খিলাফতের বাই'য়াত গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করে মক্কা ও মদীনায় অবস্থানকারী সাহাবী ও দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও খিলাফতের তৎকালীন কেন্দ্র ইরাকের জনগণ ব্যাপকভাবে আবেদন করতে থাকেন। যদ্দরুণ ইয়াযীদের উক্ত অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এবং ন্যায়নীতিপূর্ণ সঠিক ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হযরত হুসাইন (ﷺ) পরিবার-পরিজন ও ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সাথীবর্গকে নিয়ে ইরাকের কুফায় গমন করেন।[৩৪৯]

কিন্তু জালিম ইয়াযীদ ন্যায়নীতির দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে দমননীতির পথ গ্রহণ করেন। তাই কুফায় সে সময় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী নু'মান ইবনে বশীর

---

৩৪৮. দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৪৮ ও সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৬৪

৩৪৯. ইমাম তবারী, তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪০পৃষ্ঠা.

বিনম্র, সহনশীল ও শান্তিকামী হওয়ায় তাকে অপসারণ করে পাষণ্ড জুলুমবাজ উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হউক) কে সেখানে দায়িত্ব দেন এবং তার প্রতি হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) কে যে কোন মূল্যে দমন করার জন্য ফরমান জারি করেন।

সেই ক্ষমতা পেয়ে পাষণ্ড উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) ও তার সাথীগণের বিরুদ্ধে চরম পর্যায়ের জুলুমের বর্বরতম পন্থা অবলম্বন করেছে। সে হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) এর অগ্রভাবে পাঠানো প্রতিনিধি মুসলিম ইবনে আকীল ও তার সহযোগীগণকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এরপর হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) এর কাফেলাকে কারবালার প্রান্তরে অবরোধ করে তাকে তার সাথীবর্গসহ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে (নাউযুবিল্লাহ)।[৩৫০]

অথচ হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সৈন্যবাহিনীর অশুভ মতলব বুঝতে পেরে ইরাকে ইয়াযীদের নিকট যেতে দিতে অনুরোধ করেন, যেন তিনি ইয়াযীদকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনতে পারেন এবং তারপর তার হাতে বাই'আত হতে পারেন। অথবা তাকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়ার জন্য বলেন। কিংবা তাকে অন্য কোন দেশে চলে যেতে সুযোগ দেয়ার জন্য বলেন- যেখানে তিনি বাকী জীবন কাটিয়ে দিবেন। কিন্তু পাষণ্ড উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নির্দেশে ইয়াযীদের সৈন্যরা হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) এর সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করে এবং তার উপর নির্দয়ভাবে আক্রমণ চালিয়ে ইয়াযীদের সৈন্য বাহিনীর কুখ্যাত শামির ইবনে যুল জাওশান হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) কে এবং ইয়াযিদের পাষণ্ড সৈন্যরা হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) এর পক্ষে লড়াইরত তার পরিবারের লোকজন ও সাথীবর্গ সকলকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।[৩৫১]

বস্তুত এ ঘটনা আকস্মিক সংঘটিত হয়নি। বরং উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নির্দেশে ইয়াযীদের সৈন্যরা হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) কে দীর্ঘসময় অবরুদ্ধ করে রাখে। তিনি এ সময় তাদেরকে বিভিন্নভাবে তার নির্দোষতা বুঝানোর চেষ্টা করেন। এ নিয়ে দেন-দরবারে দীর্ঘ দু'দিনের লম্বা সময় অতিবাহিত হয়। হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) প্রাণহানিকর যুদ্ধ এড়ানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। যার বিস্তারিত তথ্য নিকটস্থ ইরাকের শাহী দরবারে অবস্থানকারী ইয়াযীদের নিকট না পৌঁছা অকল্পনীয়। সুতরাং হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) কে তার সাথীবর্গসহ হত্যা করার ঘটনা তাকে দমনের ফরমানদাতা ইয়াযীদ জানেন না বা তার অগোচরে ঘটেছে এ কথা বলার অবকাশ নেই। সুতরাং ইয়াযীদ

৩৫০. ইমাম তবারী, তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা.
৩৫১. ইবনে কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা.

সাথীবর্গসহ হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) এর হত্যার ঘটনা থেকে কিছুতেই দায়মুক্ত হতে পারেন না।

তদুপরি কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, যেমন- প্রাজ্ঞ মুহাক্কিক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (رحمه الله) স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন- "ইয়াযীদ তার প্রাদেশিক শাসনকর্তা উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাকে হত্যা করার আদেশ দেন"।[৩৫২]

তেমনিভাবে রিওয়ায়াত আছে যে, ইয়াযীদের নিকট যখন হুসাইন (رضي الله عنه) কে হত্যা করার সংবাদ প্রদান করা হয়, তখন প্রথমে তিনি তা শুনে খুশী হয়েছিলেন। পরক্ষণে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি এ ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করেন।[৩৫৩]

এ সকল বর্ণনা দ্বারা হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) কে শহীদ করার ঘটনায় ইয়াযীদের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও হযরত হুসাইন (رضي الله عنه) মদীনায় বসবাস কালে এবং তৎপরবর্তীতে ইয়াযীদের রোষ থেকে আত্মরক্ষা করতে মক্কায় গমন করে সেখানে অবস্থানকালেও তার প্রতি অন্যায়ভাবে দমননীতি চালানোর দায়ে ইয়াযীদ দোষী সাব্যস্ত হন।[৩৫৪]

দ্বিতীয়ত ঃ হাররার ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, ৬৩ হিজরীর ২৮ যিলহজ্ব ইয়াযীদ পবিত্র মদীনায় মুসলিম ইবনে উক্ববাহ নামীয় দুরাচারীকে কমান্ডার বানিয়ে একদল সৈন্য প্রেরণ করে তাদেরকে মদীনার অধিবাসীগণের উপর আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন তার সৈন্যরা সেখানে হামলা চালিয়ে বহু সাহাবী -তাবিয়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে, সেখানকার নারীগণকে লাঞ্ছিত করেছে এবং মালসম্পদ লুট করেছে। এমনকি ইয়াযীদের পক্ষ থেকে তিনদিনের জন্য সেই এলাকায় এসব বর্বরোচিত অপরাধ চালানোর বৈধতাদানের বর্ণনাও পাওয়া যায়।[৩৫৫]

অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পবিত্র মদীনাকে 'হারাম' (সম্মানিত) ঘোষণা করে সেখানে রক্তপাতকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

«اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ،

৩৫২. সুয়ূতি, তারীখুল খুলাফা, ১৯৩ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৩৫৩. ইবনে কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা.
৩৫৪. আদি, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, ৫ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা.
৩৫৫. ইবনে কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা.

-"হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইবরাহীম (ﷺ) মক্কাতে সম্মানিত করেছেন, তাকে 'হারাম' ঘোষণা করেছেন। আর আমি মদীনাকে 'হারাম' রূপে সাব্যস্ত করছি তার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা নিয়ে যে, এর মধ্যে কোনরূপ রক্ত প্রবাহিত করা হবে না, লড়াই করার জন্য এর মধ্যে কোন অস্ত্র বহন করা হবে না, এখানকার কোন গাছপালা কর্তন করা হবে না-তবে পশুদেরকে খাওয়ানোর জন্য হলে ভিন্ন কথা.....।"[৩৫৬]

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনাবাসীগণকে জুলুম- অত্যাচার করে ভীত-সন্ত্রস্ত করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী করেছেন এবং একে লা'নতের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত সায়িব ইবনে খাল্লাদ (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظُلْمًا أَخَافَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا-

-"যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদেরকে জুলুম করে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন এবং তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার কোন নেক আমল কবুল করবেন না।"[৩৫৭]

তৃতীয়ত ঃ পবিত্র মক্কায় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও তার ভক্ত-অনুরক্তগণকে পরাস্ত করার নামে জালিম ইয়াযীদ ৬৪ হিজরীতে পাষণ্ড হুসাইন ইবনে নুমাইরকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে পবিত্র মক্কায় আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। ইয়াযীদের বর্বর বাহিনী পবিত্র মক্কা অবরোধ করে সেখানে হামলা চালায় এবং বহু মানুষকে হতাহত করে। তারা পবিত্র কা'বা শরীফে জ্বলন্ত ন্যাপথালিন অগ্নি-গোলা নিক্ষেপ করে এই পবিত্র ঘরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।[৩৫৮]

অথচ পবিত্র কা'বা ও মক্কা হারাম এলাকারূপে গণ্য-যেখানে কোনরূপে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রক্তপাত জায়িয নয়। এ সম্পর্কে হযরত আবু শুরাইহ (ﷺ) বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

৩৫৬ .মুসলিম, আস্-সহিহ, ২/১০০১পৃ. অধ্যায় নং৮৬, হাদিস ঃ ১৩৭৪, নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ৪/২৫৭পৃ. হাদিস ঃ ৪২৬২, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৫/৩২৯পৃ. হাদিস ঃ ৯৯৮২

৩৫৭ . মুসনাদে আহমাদ, ২৭/৯২পৃ. হাদিস নং- ১৬৫৫৭

৩৫৮ . সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা লিস ১৬৭ পৃষ্ঠা।

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا

-"নিশ্চয় মক্কাকে আল্লাহ তা'আলা 'হারাম' করেছেন এবং কোন মানুষ একে হারাম করেনি, কোন মানুষের জন্য যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে হালাল হবে না যে, এখানে কোন রক্ত বইয়ে দিবে বা কোন গাছ কর্তন করবে।"[৩৫৯]

বস্তুত জুলুমবাজ ইয়াযীদ তার জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী প্রতিবাদী জনগণকে শেষ করে দিয়ে নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার দুরভিসন্ধি করেছিলো। কিন্তু এতে তার শেষ রক্ষা হয়নি। পবিত্র মক্কায় আক্রমণ করে পবিত্র কা'বাকে গোলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেখানে রক্তপাতের ঘটনা সংঘটনের মুহূর্তেই খবর আসে যে, কুখ্যাত ইয়াযীদ মারা গিয়েছেন। তখন তার সকল দম্ভ-দর্প চিরতরে বিচূর্ণ হয়ে যায়।[৩৬০]

ওদিকে ব্যক্তিগত জীবনেও ইয়াযীদ বিভিন্ন গুনাহ-পাপাচারে লিপ্ত থাকতেন বলে জানা যায়। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ১১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : "বিভিন্ন বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, ইয়াযীদ দুনিয়ার নানা কুকর্ম পছন্দ করতো; মদ্যপান করতো, গান-বাজনায় ছিল আসক্ত, দাড়িবিহীন ছেলেদের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হতো, ঢোল বাজাতো, কুকুর পালতো, ব্যাঙের, ভালুকের ও বানরের লড়াই লাগিয়ে দিতো, প্রতিদিন সকালে সে মদ্যপান অবস্থায় বানরকে ঘোড়ার পিঠের সাথে বেঁধে ঘোড়াকে দৌড় দিতে বাধ্য করতো"।[৩৬১]

ইয়াযীদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আলেমগণের অবস্থান

উপরে বর্ণিত সেই গর্হিত ও অন্যায় কাজগুলো এমন ভয়াবহ ও মারাত্মক যে, এগুলো করলে মানুষ কাফির এবং লা'নতের উপযুক্ত হয়ে যাবে। এগুলো যে করবে, সে আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে না। সেই ভিত্তিতে ইয়াযীদের উপর আল্লাহর লা'নত দেয়ার পক্ষে বহু আলেমে দ্বীন মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা মাহমুদ আলূসী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনুল জাওযী, ইবনে হাজর আসকালানী, কাজী আবু ইয়ালা, আল্লামা তাফতাযানী, আল-বারযানজি, আবুল আব্বাস আহমাদ আল-হাইতামী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রমুখ।

৩৫৯ . সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৪২৯৫)।

৩৬০ . ইবনে কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৬১ . ইবনে কাসির, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা.

তবে অনেকে সতর্কতা হিসেবে বলেন যে, ইয়াযীদকে নির্দিষ্ট না করে "হযরত হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের উপর আল্লাহর লা'নত বলা যায়। কারণ, ইয়াযীদ হযরত হুসাইন (রাঃ) এর হত্যায় জড়িত ছিলেন কিনা কিংবা তাওবা না করে আল্লাহর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা-তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি।[৩৬২] এ অভিমত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট বিশুদ্ধ নয়।

১.এর তার জাওয়াবে ইমাম আলূসী (রহঃ) বলেন-

وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين، والظاهر أنه لم يتب، واحتمال توبته أضعف من إيمانه، ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين، وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين،

-"আমার মতে ইয়াযিদের মত লোককে লা'নত দেয়া সঠিক, যদিও তার মতো এতো বড় ফাসিকের কথা কল্পনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়; আর এটাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সে কখনোই তওবা করেনি; (উপরন্তু) তার তওবা করার সম্ভাবনা তার ঈমান পোষণ করার সম্ভবনার চেয়ে ক্ষীণতর। ইয়াযিদের পাশাপাশি ইবনে যিয়াদ, ইবনে সা'আদ ও তার দল-বল এতে জড়িত। অবশ্য কেয়ামত দিবস অবধি এবং ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর জন্যে (মু'মিনদের) চোখের পানি যতদিন ঝরবে ততোদিন পর্যন্ত আল্লাহর লা'নত তাদের সবার উপর পতিত হোক; তাদের বন্ধু-বান্ধব, সমর্থক, দলবল এবং ভক্তদের উপরও পতিত হোক!" [৩৬৩]

অধিকন্তু যারা ইয়াযীদকে কোনরূপ দোষারোপ করতে চান না, তাদের সম্পর্কে আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেন-"**আমি কসম করে বলি, এটা হলো চরম ভ্রষ্টতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে**।"[৩৬৪]

২. তেমনি ইয়াযীদের ওপর লা'নত করা সম্পর্কে আল্লামা তাফতাযানী (রহঃ) স্বীয় শরহে আক্বায়িদে নাসাফী গ্রন্থে বলেন-"যে ব্যক্তি হযরত হুসাইন (রাঃ) কে শহীদ করেছে অথবা এর আদেশ দিয়েছে কিংবা অনুমতি দিয়েছে বা এর উপর সম্মত ছিল, সেই ব্যক্তিকে লা'নত করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর প্রকৃত কথা এই যে, ইয়াযীদ যদি হযরত হুসাইন (রাঃ) কে শহীদ

৩৬২ . আল-ইহতিজাজ, ২য় খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা.

৩৬৩ .ইমাম আলূসী, তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী, সূরা মুহাম্মদ, ১৩/২২৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৫হি.

৩৬৪ . আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ২৬ খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা।

করার ব্যাপারে রাজী থাকে, তাহলে তাকে লা'নত দেয়া বৈধ হবে। আর হযরত হুসাইনের শাহাদাতে ইয়াযীদের আনন্দ করা এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বংশধরগণকে অপদস্ত করার ব্যাপারে এমন অনেক রিওয়ায়াত রয়েছে-যা অর্থের দিকে থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, যদিও পৃথক পৃথকভাবে খবর ওয়াহিদ। সুতরাং আমরা **ইয়াযীদের ব্যাপারে কোন নীরবতা পালন করবো না, এমনকি তার ঈমান সম্পর্কেও না**। আল্লাহ তা'আলা তার উপর তার সাহায্যকারী এবং তার দলের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।"[৩৬৫]

অপরদিকে ইয়াযীদের অপকর্ম শুধু হযরত হুসাইন (রাঃ) ও তার আওলাদ-সাথীবর্গের হত্যার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং পবিত্র মক্কা ও মদীনায় তিনি যে হামলার নির্দেশ দিয়ে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন তাও বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার। এগুলোও লা'নতের কাজ।

৩. তাই ইয়াযীদের প্রতি অতিভক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে এ উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম হযরত আল্লামা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন-

"উলামায়ে আহলে সুন্নাতের কেউ কেউ ইয়াযীদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের পথে গিয়ে ইয়াযীদের শান ও ফজীলত বর্ণনা করতে শুরু করে দেন এবং এটাও বলে বেড়ান যে, অধিকাংশ মুসলমান যেখানে তাকে শাসক নিযুক্ত করেছেন, সেখানে হযরত হুসাইন (রাঃ) এর উপরও আবশ্যক ছিল যে, তার আনুগত্য করা। আল্লাহর নিকট এই বক্তব্য ও আক্বীদা থেকে আমরা পানাহ চাই। যেখানে স্বয়ং হযরত হুসাইন (রাঃ) হক প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াযীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন, সেখানে ইয়াযীদ কি করে সঠিকপন্থী গণ্য হতে পারে ? আর মুসলমানগণের ঐকমত্য এর ওপর কি করে সাব্যস্ত হয়, যেখানে ঐ সময়কার সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাদের আওলাদ যারাই ছিলেন অধিকাংশই ইয়াযীদের আনুগত্যের উপর অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছিলেন? মদীনা শরীফ থেকে সিরিয়াতে কিছু লোককে জোর-যবরদস্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা ইয়াযীদের মন্দ কার্যকালাপ দেখে পুনরায় মদীনাতে ফিরে আসেন এবং তাদের অনিচ্ছাকৃত এ বাই'আতকে ভঙ্গ করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন, আর বলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন, শরাবখোর, নামায ত্যাগকারী, ব্যভিচারী, ফাসিক, এমনকি মুহরিমদেরকেও বিবাহকারী। আবার কারো অভিমত হল যে, ইয়াযীদ হযরত হুসাইন (রাঃ) এর কতলের আদেশ দেয়নি, আর না সে এতে সম্মত ছিল। হযরত হুসাইন (রাঃ) ও আহলে বাইতের (রাঃ) শাহাদাতের কারণে যে কখনো সন্তুষ্ট হয়নি।

৩৬৫ . তাফতাযানী, শরহে আক্বায়িদে নাসাফী, ১৬২পৃষ্ঠা.

আমাদের নিকট এ বক্তব্য অবান্তর ও বাতিল বলে গণ্য হয়। কেননা, আহলে বাইতের প্রতি ইয়াযীদের বিদ্বেষ ও আহলে বাইতকে তার তিরস্কার ও অপমান করার ঘটনা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়ে আসছে, ঐ সকল ঘটনাবলী অস্বীকার করা যায় না। আবার আরেক দলের অভিমত হল. হযরত হুসাইন (ﷺ) কে হত্যা করায় মূলতঃ কবীরা গুনাহ হয়েছে, তাতে কুফরী কাজ হয়নি। কেননা, অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ, কুফুরী নয়। কিন্তু লা'নত তো কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। এ ধরনের মন্তব্যকারীদের প্রতি আফসোস হয় যে, তারা রাসূলে কারীম (ﷺ) এর ওই বাণী থেকে বেখবর -যেখানে হযরত ফাতিমা (ﷺ) ও তার আওলাদগণের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে শত্রুতা পোষণ ও তাকে কষ্ট দেয়ার শামিল বলা হয়েছে। উক্ত হাদিসের আলোকে এ ব্যক্তিরা ইয়াযীদের ব্যাপারে কী ফয়সালা দিবেন ? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে শত্রুতা পোষণ ও তাকে কষ্ট দেয়া কি কুফর ও লা'নতের কারণ নয় ? অথচ স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, নিঃসন্দেহে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নতের উপযুক্ত, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। (সূরাহ আহযাব, আয়াত নং- ৫৭) অপরদিকে কিছুলোকের অভিমত হল এমন যে, ইয়াযীদের শেষ অবস্থা সম্বন্ধে যেহেতু কিছু জানা যায় না, এমনো হতে পারে যে, সে কুফর ও পাপ করার পর তাওবা করে নিয়েছে এবং তার শেষ নিঃশ্বাস তাওবাকারী হিসেবে হয়েছে। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী আলেমগণ এবং উম্মতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের অনেকেই ইয়াযীদের উপর লা'নত করেছেন বা লা'নতের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (ﷺ) এর মত বুযুর্গ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত। তেমনি ইবনুল জাওযী (رحمه الله) যিনি শরীয়ত ও সুন্নাতের নববীর ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন, তিনিও স্বীয় কিতাবে ইয়াযীদের উপর লা'নত করার পক্ষে সালফে সালেহীন আলেমগণের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে কিছুসংখ্যক আলেম লা'নত করতে নিষেধ করেছেন এবং আবার কিছু সংখ্যক আলেম এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। এভাবে আলেমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত দেখা যায়। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হল, ইয়াযীদ অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র। ওই বদবখত যে সকল কাজ করেছে, তা খুবই জঘন্য। (হযরত হুসাইন (ﷺ) এর শাহাদাতের ব্যাপার ছাড়াও) সে মদীনা মুনাওয়ারায় সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে ঐ পবিত্র শহরের বে-ইজ্জতী করেছে এবং মদীনাবাসীদের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে। সে অত্যন্ত বুযুর্গ সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ) ও তাবেয়ীন (رحمهم الله) গণকে খুব কষ্ট দিয়েছে এবং তাদেরকে হতাহত ও অপমান করেছে। মদীনা শরীফের বেইজ্জতী করার পর সে মক্কা মুয়াজ্জমায় হামলা চালিয়েছে সেখানে ধ্বংসাত্মক কার্যকালাপ চালানোর আদেশ দিয়েছে। সে হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (ﷺ) কে শহীদ করার জন্য উদ্যত হয়েছে এবং এ অবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। আর তার তাওবা ও ফিরে আসার ব্যাপারটাতো আল্লাহই অধিক জানেন। তার এ সকল অপরাধ খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের এবং সকল ঈমানদারগণের অন্তরে ইয়াযীদের মুহাব্বত ও তার সহযোগীদের মহব্বত এবং ঐ সকল লোকের সাথে যারা নবীয়ে কারীম (ﷺ) এর আহলে বাইতের সাথে বিদ্বেষ রেখে আসছে এবং তাদের মর্যাদাকে পদদলিত করে আসছে তাদের মহব্বত থেকে মাহফুজ ও নিরাপদ রাখেন। আর দুনিয়া ও আখিরাতে আহলে বাইতের দলভুক্ত এবং তাদের মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (আমীন)।"[৩৬৬]

এ সকল বর্ণনার দ্বারা ইয়াযীদের জঘন্য অন্যায় ও সীমাহীন অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় তার জন্য মুমিনগণের অন্তরে প্রচণ্ড ঘৃণা থাকবে নিঃসন্দেহে। তাই তার প্রতি এ ঘৃণা প্রকাশে এবং তার লা'নতযোগ্য মহা-অপরাধের কারণে তাকে অনেকে লা'নত করেন। আবার অনেকে ইহতিয়াত করে ইয়াযীদকে লা'নত করা থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু তা এ কারণে নয় যে, তিনি তাকে ভাল মানুষ মনে করেন। বরং নিজেদের মুখকে সংযত করার জন্যই তারা তাকে লা'নতের উপযুক্ত বিশ্বাস করেও তাকে লা'নত করা থেকে বিরত থাকেন।

৪.এ ব্যাপারে কাজী আবু ই'য়ালা ফাররা (رحمه الله) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله) এর ছেলে সালিহ ইবনে আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন,

نقل البرزنجي في الإشاعة والهيثمي في الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه فقال عبد الله قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد فقال الإمام إن الله تعالى يقول: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ الآية وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد انتهى.

-"ইমাম বারযুনজী তার 'আসা'আত' গ্রন্থে ও ইমাম হাইতামী তার 'আস-সাওয়ায়েকুল মুহরিকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, "আমি আমার আব্বাকে (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে) বললাম, লোকেরা আমাদেরকে ইয়াযীদের সাথে মহব্বতের সম্বন্ধ করে (তাকে লা'নত না করার কারণে)। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এমন কেউ কি ইয়াযীদের সাথে মহব্বত রাখতে

৩৬৬. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, তাকমীলুল ঈমান, পৃষ্ঠা নং- ১৭৮-১৭৯

পারে ? ওই ব্যক্তিকে কেন লা'নত করা হবে না- যাকে আল্লাহ স্বীয় কিতাবে লা'নত করেছেন? তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা কোথায় ইয়াযীদকে স্বীয় কিতাবে লা'নত করেছেন? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালার এ আয়াতে তা রয়েছে-

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

-"এটাই কি সম্ভব করেছো যে, যদি তোমরা ক্ষমতা লাভ কর, তাহলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে ? এরাই ঐ সকল লোক যাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুগুলোকে অন্ধ করে দিয়েছেন।"[৩৬৭] {ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন} হত্যা করার চেয়ে বড় কোন ফাসাদ হয় কি ? ।"[৩৬৮]

অপর বর্ণনায় রয়েছে, সালেহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, তখন আমি তাকে (ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন সরাসরি ইয়াযীদকে লা'নত করেন না ? তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার বাবাকে কখন কাউকে লা'নত করতে দেখেছো ? (অর্থাৎ তিনি সাধারণত তাঁর স্বভাব বশত কাউকে লা'নত করেন না। এ জন্য ইয়াযীদকে লা'নত করতে তাকে দেখা যায় না। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি ইয়াযীদকে মহব্বত করেন বা ইয়াযীদ লা'নতের উপযুক্ত নয় বলে বিশ্বাস করেন। বরং অবশ্যই তিনি ইয়াযীদের কার্যকলাপের কারণে তাকে লা'নতের উপযুক্ত বলেই বিশ্বাস করেন)।"[৩৬৯] এ বর্ণনাটি যেহেতু ইবনে তাইমিয়া সংকলন করেছেন সেহেতু আমরা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। কেননা, সে ইবনে যিয়াদকেই অনেক কষ্টে স্বীকার করেছেন-

لَعَنَ اللّٰهُ ابْنَ مرجانة – يَعْنِي عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ

-"ইবনে যিয়াদে উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হউক।"[৩৭০]

৫. এ জন্যই তার খণ্ডনে আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানীপথি (রহ.) ইমাম আহমদের রায় বর্ণনা করেন-

قول احمد بن حنبل فی لعن یزید-

-"ইমাম আহমদ (রহ.) ইয়াযিদকে লা'নত দেয়ার মত পোষণ করেছেন।"[৩৭১]

৩৬৭. সূরাহ মুহাম্মদ, আয়াত নং- ২২ ও ২৩.
৩৬৮. তথ্য সূত্র ঃ ইমাম আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৩/২২৭ পৃষ্ঠা, প্রাগুক্ত.
৩৬৯. ইবনে তাইমিয়া, মাযমাউল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা.
৩৭০. ইবনে তাইমিয়া, মাযমাউল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা (শামিলা)

সুতরাং বুঝা গেলো- ইয়াযীদ লা'নতের উপযুক্ত কাজ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে কেউ তার উপর লা'নত করুন বা না করুন। আর যে ব্যক্তি তার ভয়াবহ অপকর্মের দ্বারা লা'নতের উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তার কিছুতেই প্রশংসা করা যায় না এবং তার জন্য কিছুতেই আল্লাহর রহমত কামনা করা বা তার নাম উচ্চারণ করে "রহমতুল্লাহি আলাইহি" বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, কারো নাম উচ্চারণ করে "রহমতুল্লাহি আল্লাইহি" বলার মানে হলো, তার বুযুর্গী ও উত্তম আমলের কারণে তিনি আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত বলে প্রত্যয়ন করা। এ জন্য আল্লাহর ওলী-বুযুর্গ, তাবিয়ীন, তাবে-তাবিয়ীন ও দ্বীনের প্রয়াত মহামানবগণের নামেই শুধু "রহমতুল্লাহি আল্লাইহি" বলা হয়- যেমনিভাবে সাহাবীগণের নাম উচ্চারণের পর "রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু" বলা হয়ে থাকে-যা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।[৩৭২]

তাই ইয়াযীদের প্রশংসা করা কিছুতেই সঙ্গত নয় এবং তার নাম উচ্চারণ করে কোনক্রমেই "রহমতুল্লাহি আল্লাইহি" বলা যায় না।

৬. এরপরও যারা ইয়াযীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং তার প্রশংসা পঞ্চমুখ হন, তাদের সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ.) বলেন-

-"ইয়াযীদের ভক্তি ও প্রশংসা গোমরাহ লোক ছাড়া কেউ করতে পারে না-যার ধর্মবিশ্বাস শূন্যের কোঠায়। কেননা, ইয়াযীদ এমন জঘন্য কাজ করেছে যে, তাকে সমর্থন করলে, তার কুফরীতে পতিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।"[৩৭৩]

৮৫. ডা. জাকির নায়েকের সমাবেশে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার

ডা. জাকির নায়েকের কনফারেন্সে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক আলোচনার ছত্রছায়ায় পরোক্ষভাবে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার চলছে। খৃষ্টান পণ্ডিত ও ফাদারগণ এসে তার সমাবেশে খৃষ্টান ধর্মের তত্ত্ব-তথ্য, উপাসনার যাবতীয় নিয়মাবলী তুলে ধরেন এবং রীতিমতো বাইবেল থেকে ও খৃষ্টান মতবাদের তালীম দেয়া হয়। খৃষ্টান ধর্মের পরিচিতি ও ধর্মমত সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক নিজেই বিস্তর আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা লেকচার সমগ্র ভলিয়াম ১ পৃ: ১২৮ থেকে ১৩২, ভলিয়াম ২ পৃ: ৩৩০ থেকে ৩৬৫ এবং ৫০৯ থেকে ৫১১ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। একই কৌশলে তার কনফারেন্সে খৃষ্টান পণ্ডিত যেমন : ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, প্যাষ্টর রুকনি, ফাদার জিও পায়াপিল্লি প্রমুখের মাধ্যমে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার হচ্ছে। (তাদের বক্তব্য পাবেন, ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ১ পৃ: ৪৬৫ থেকে ৫২২, ভলিয়াম নং ৩ পৃ: ৩৭১ থেকে ৪১১, ভলিয়াম নং ৫ পৃ: ১১৩ থেকে ১১৯, ভলিয়াম ৫ পৃ: ১৫১ থেকে ১৬১ পর্যন্ত।)

৩৭১. পানীপথি, তাফসীরে মাযহারী, ৮/৩৩৬পৃ. (শামিলা)
৩৭২. সূরাহ বাইয়্যিনাহ, আয়াত নং- ৮
৩৭৩. আল-ইমত্বা বিল আরবাঈন, ৯৬ পৃষ্ঠা.

৮৬. মিঃ প্যাষ্টর রুকনি এর ভ্রান্ত বক্তব্যকে মৌন সমর্থন ঃ

খৃষ্টান মতবাদ প্রচারক মিঃ রুকনি বলেন, আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) ইডেনের একটি বাগানে ছিলেন। এ বাগানকে অনেকেই স্বর্গের বাগান বলে থাকেন। আদম হাওয়া এ বাগানে ফুর্তি করতেন। তারপর শয়তান একটা সাপের ছদ্মবেশে আসল এবং তাদেরকে দিয়ে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায়ে পাপ কাজ করাল। তখন ঈশ্বর তাদেরকে এ বাগান থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ঈশ্বর এ বাগানে প্রবেশের দরজায় একজন দেবদূতকে বসালেন। এ দেবদূত স্বর্গের দরজা পাহারা দিতে লাগল। তার হাতে ছিল আগুনের তরবারী। সেই তরবারীর মাথা চারদিকে ছড়ানো। যাতে সেই বাগানে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। কেউ প্রবেশ করতে চাইলে ঐ তরবারী দিয়ে হত্যা করা হবে। আদম সেখানে আসতে পারবে না। যেহেতু স্বর্গের বাগানে যেই প্রবেশ করতে চাইবে ঐ তরবারী তাকে হত্যা করবে। আর আমরা দেখি যে, যীশু স্বেচ্ছায় তার জীবন দিলেন তার মহান পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী। ঐ তরবারীটা তার উপর পড়েছিল। যীশু ঐ তরবারীটা তার উপর পড়তে দিয়েছিলেন। আর এ জন্যে ঐ দিন থেকেই স্বর্গের বাগানের সেই দরজাটা খুলে গেল। স্বর্গের দরজা শুধু খৃষ্টানদের জন্যে নয়; বরং বিশ্ববাসী সকলের জন্যে খুলে গেল। এরপর রুকনি বলেন; **"এখানে পরোক্ষভাবে ক্রুশের কথা বলা হয়েছে"**।[৩৭৪]

ইসলামী আক্বীদা ঃ হযরত আদম (ﷺ) ও হযরত হাওয়া (ﷺ) জান্নাতে বসবাস করতে ছিলেন। শয়তানের চক্রান্তে আল্লাহ পাকের হুকুমে পৃথিবীতে আসলেন। আল্লাহ পাক নিজেই বললেন فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ -"শয়তান আদম ও হাওয়াকে পা পিছলিয়ে দিয়েছে। (সুরা বাক্বারা আয়াত-৩৬) পা পিছলিয়ে যাওয়া কোন অপরাধ নয়। বেহেশতের দরজায় তরবারী নিয়ে দাঁড়ানো। যীশু তার নিজ জীবন দেয়া এ সব মিথ্যা কল্প-কাহিনী বাইবেলের মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে ডা. জাকির নায়েকের অনুষ্ঠানে মুসলমানদের মাঝে কত স্পষ্ট ভাষায় খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করলেন। ডা. জাকির শুধু শুনলেন, দেখলেন কিন্তু কোন প্রতিবাদ বা উত্তর কিছুই দিলেন না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ বা উত্তর না দেয়া সেটার প্রতি মৌন সমর্থন বুঝায়। প্রকাশ্যে জনসমাবেশে বিনা বাঁধায় প্রচার হল আবার তার কোন উত্তর দেওয়া হল না। তাহলে হাজার হাজার মুসলমানদের আক্বীদা বিশ্বাস কি জন্ম নিবে? এর জন্যে ডা. জাকির নায়েক কি দায়ী নয় ?

৩৭৪ . ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৩ পৃঃ ৩৭৫-৩৭৭

প্যাস্টর রুকনি তথ্য বিকৃত করে ইব্রাহীম (ﷺ) এর ঘটনা ঃ অতঃপর প্যাস্টর রুকনি তথ্য বিকৃত করে ইব্রাহীম (ﷺ) এর কোরবানীর ঘটনায় বলেন যে, হযরত ইব্রাহীম (ﷺ) মুসলমানদের পূর্বপুরুষ ইসমাইল (ﷺ) কে কুরবানী করতে নিয়ে যাননি ; বরং ইহুদী খৃষ্টানদের পূর্ব পুরুষ ইসহাক (ﷺ) কে কুরবানী করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর ইব্রাহীমকে পরীক্ষা করেছিলেন স্বীয় পুত্রের মাধ্যমে। তিনি আইজ্যাক (তথা ইসহাক) কে খুব ভালবাসতেন। ঈশ্বর তাকে বললেন, ইব্রাহীম! তুমি ইসহাককে নাও যাকে তুমি খুব ভালবাস। অতঃপর তাকে নিয়ে মোরাইয়া অঞ্চলে যাও। সেখানে তাকে উৎসর্গ করবে। ইব্রাহীম ইসহাককে উৎসর্গ করার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিলেন, (যেমন ছুরি, দড়ি ইত্যাদি)। তারপর ইসহাককে নিয়ে মোরাইয়া পাহাড়ে উঠলেন। যখন ইব্রাহীম হাত বাড়িয়ে ঐ ছুরিটা নিয়ে প্রস্তুতি নিলেন, তখন একজন দেবদূত তার কানে এসে বলল, ইব্রাহীম! শুন তোমার পুত্রের শরীর স্পর্শ করবে না। তখন সে চোখ মেলে দেখলেন যে, তার পিছনেই একটা ভেড়া ঝোপের মধ্যে তার শিং আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ইব্রাহিম সেই ভেড়াটিকে নিয়ে তার ছেলের পরিবর্তে তার ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করলেন। অতঃপর 'রুকনি বলেন, যারা যীশু খৃষ্টকে বিশ্বাস করে, তারা ইসহাককে ও মান্য করে। তারপর রুকনি বলেন, পাপের শাস্তি মৃত্যু। তাই ঈশ্বর এখানে আমার পাপের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে আমাকে পাপের মৃত্যুদণ্ড থেকে বাচিয়েছেন। যীশু খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে উৎসর্গ হয়েছেন।[৩৭৫]

ইসলামের আক্বীদা ঃ মূলত : হযরত ইবরাহিম (ﷺ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (ﷺ) জান্নাতে বসবাস করতে ছিলেন। তিনি খৃষ্টনদের পূর্ব পুরুষ ইসহাক (ﷺ) নন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ডা. জাকির নায়েক এর কোন উত্তর দেননি, প্রতিবাদও করেননি। বরং তার অনুষ্ঠানে মুসলিম জনসমাবেশে এভাবে বাইবেল থেকে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, যার দ্বারা মুসলমানদের ঈমান থাকবে না। অতঃপর "ক্রশ নেই তো খৃষ্টান ধর্ম নেই" এ কথার উপর যুক্তি দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু একবার ও তিনি উল্লেখিত ভ্রান্ত আক্বীদাগুলোর প্রতিবাদ বা রদ করেননি। তিনি ইসলামের মুখপাত্র হলে ইসলামী আক্বীদা প্রমাণ করে তাদের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন ছিল যাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।

৮৭. মিঃ প্যাস্টর রুকনি বনী ইসরাঈলের কাহিনী বলেন

তারা মিসরে দাস ছিল, অতঃপর ঈশ্বর সেখানে থেকে মুক্ত করার জন্যে একটি নিখুঁত ভেড়া উৎসর্গ করতে বললেন। প্রকৃত পক্ষে এটা আসলে ভেড়া ছিল না। যীশু পরে

৩৭৫ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ৩ পৃঃ ৩৭৭-৩৮১.

আসবেন এ উৎসর্গ তারই রূপক। কিন্তু ইয়াহুদীরা ঈশ্বরকে অমান্য করল। তখন সাপ এসে তাদেরকে কামড়ালো। তারপর ঈশ্বর মুসা (ﷺ) কে এসবের প্রতিকার করতে বললেন। তিনি ব্রোঞ্জের ব্রাচ দিয়ে একটি সাপ বানাতে বললেন আর সে সাপটা ঝুলিয়ে রাখলেন। ইয়াহুদিরা সবাই যখন ঐ সাপের দিকে তাকালো তখন তাদের শরীর থেকে সাপের বিষ নেমে গেল। এখানে সাপটা হচ্ছে শয়তানের একটা প্রতিক। তারপর কী ঘটল ? যীশুকে ক্রুশে ঝুলানো হয়েছিল। মুসার সেই সাপের মত। যদিও তিনি ছিলেন নিষ্পাপ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সকলের পাপের বোঝা বহন করেছেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে।[৩৭৬]

ইসলামের আক্বীদা ঃ বনী ইসরাঈল মূলত দাস ছিলেন না; বরং বংশধর হওয়ার কারণে ফেরাউন তাদের দ্বারা সব করানোর চেষ্টা করতে দাসের মত। আল্লাহ পাক মুসা (ﷺ) এর মাধ্যমে কুদরতীভাবে নীল নদের মধ্যে ১২ গোত্রের জন্যে ১২ টি রাস্তা করে দিয়ে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে সেই নদীতে ডুবিয়ে মারলেন। যা বিস্তারিত তাফসীরের কিতাব সমূহে আছে।[৩৭৭]

ডা. জাকির নায়েক কী উদ্দেশ্যে বাইবেলের এ ভ্রান্ত মতবাদগুলি মুসলমানদের মধ্যে প্রচারের সুযোগ করে গোমরাহী ছড়ানোর বীজ বপন করতেছেন, তা বুঝে আসতেছে না। তাদের বক্তব্যের পরে ডা. সাহেব বক্তব্য দিতে উঠে ও কেন এর রদ বা প্রতিবাদ করে না ? তিনি কি মূলত ইসলামের প্রচারের নামে খৃষ্টান ধর্মের বীজ মুসলমানদের অন্তরে বপন করে চলেছেন ? তা পাঠক মহলের বিবেচনায় ছেড়ে দেয়া হল। প্যাস্টর রুকনি সে সব বৃত্তান্ত আলোচনার পর সেই সমাবেশেই মুসলমানদেরকে খৃষ্ট মতবাদের দিকে আহবান করে বলেন, আপনারা যীশুকে দেখুন, হৃদয়ে ধারণা করুন। আজকেই আপনার সব পর্দা মুছে যাবে। আজকেই আপনি পাপমুক্ত হয়ে যাবেন। কোন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, বরং যীশুকে বিশ্বাস করলে আজই পাপমুক্ত হয়ে যাবেন। আজকে মানুষ বিশ্বাস করবে যে, যীশু ক্রুশে মারা গেছেন। সমাধিতে তিনদিন থাকার পর তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করে পুনরায় ইশ্বর হিসেবে তার দায়িত্ব বুঝে নিলেন। যে মানুষ এ কথাগুলো বিশ্বাস করবেন, তিনি পাপমুক্ত হয়ে যাবেন। নরকে না গিয়ে তিনি স্বর্গে যাবেন। আর এতদ্ব্যতীয় অনেক উপকার পাবেন।[৩৭৮] আবার কোন কোন অনুষ্ঠানে 'রুকনি'

৩৭৬. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র,ভলিয়াম ৩ পৃষ্ঠা ৩৮২-৩৮৩
৩৭৭. সূরা বাক্বারা- ৪৯, ত্বহা- ৭৭
৩৭৮. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৩, পৃ: ৩৮৩

মুসলমানদেরকে তার চার্চে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, **"এখন সময় নেই, তবে অন্যকোণ সময় আমাদের সভায় আসতে পারেন। সভাটি হয় দামোদর হল ক্লাস রুমে সকাল নয় ঘঠিকায়। আগামী রোববার একবার চলে আসুন। সবার জন্যে আমরা সেদিন প্রার্থনা করব। চার্চের সবাই আপনাদের জন্যে প্রার্থনা করবেন"।**[৩৭৯] আবার ক্রুশ সম্পর্কে জানতে বাইবেল পড়ার জন্যে আহবান জানিয়ে বলেন, "পুরো বাইবেলেই ক্রুশের কথা আছে। আপনাদের ইচ্ছা করলে পড়ে দেখতে পারেন। বাইবেলের দাম খুবই কম। বোম্বেতে অনেক দোকানে বাইবেল পাওয়া যায়।"[৩৮০] এ সব ভাষণের লাইভ ডকুমেন্ট বাংলা ভার্সনে ইন্টারনেটে রয়েছে।

ডা. জাকির নায়েকের কনফারেন্সে আরেক খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক হচ্ছেন ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। অন্য একজন হচ্ছেন খৃষ্টান পণ্ডিত জিও পায়াপিল্লি। তিনি বাইবেলকে চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ আখ্যা দিয়ে পবিত্র কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করে এক সমাবেশে বলেন "খৃষ্টান ধর্মে আমরা জানি ঈশ্বরের চূড়ান্ত বাণী এসেছে যীশু খৃষ্টের মাধ্যমে। আর যীশু খৃষ্টের এই বানীর পরে নতুন কোন বানী আসবে না। মুসলমানরা যে কোরআনের কথা বলে, আমরা সেটা জানি, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যীশু খৃষ্ট ঈশ্বররূপে এসেছিলেন এবং তারপর তিনি তার বাণীগুলো প্রচার করেছেন। আর এটাই হলো ঈশ্বররূপে চূড়ান্ত বানী। আমরা নতুন করে কোন বাণী চাই না"।[৩৮১]

খৃষ্টানদের মূল টার্গেট জনসমাবেশে জয় বা পরাজয় নয়; বরং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে খৃষ্টধর্মের প্রচার। এ নিগুঢ় রহস্য ফুটে উঠেছে প্যাষ্টর রুকনির ভাষ্যে। তিনি ডা. জাকির নায়েকের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শুরুতেই বলেন; এখানে আমার উদ্দেশ্য কোন বিতর্ক করা না। এখানে আমার উদ্দেশ্য হলো আপনাদের জীবন মুক্তির পথ দেখানো পাপ থেকে যীশু খৃষ্টের মাধ্যমে। সেটাই আমার উদ্দেশ্য। বিতর্কে হারলে ও কোন ক্ষতি নেই। ঠিক আছে ? এখানে সেটাই আমার উদ্দেশ্য। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৩, পৃ: ৪০৫)

৮৮. খৃষ্টানদের সূক্ষ ষড়যন্ত্র

তারা যেভাবেই হোক মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করতে চান। তাই ডা. জাকির নায়েককে জয়ী হতে দিয়ে প্রলুব্ধ করে এ রকম আরো সমাবেশ করায়ে খৃষ্টানধর্ম প্রচারের সুযোগ চায়। এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে হাজার বার ডা. জাকির নায়েকে জয়ী করতে এবং নিজেরা পরাজিত হতে আগ্রহী। এরা ঐ জাতী যারা তাদের উদ্দেশ্য

৩৭৯. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৩, পৃ: ৩৮৬
৩৮০. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৩, পৃ: ৩৮৫
৩৮১. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৫, পৃ: ১৬৩

হাসিল করতে এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংশ করতে গিয়ে নিজের দেশের সম্পদে বিমান হামলা করে ধ্বংস করতে চিন্তা করে না। (যার জ্বলন্ত প্রমাণ টুইন টাওয়ার হামলা) অন্যথায় খৃষ্টান রা কি এতই বোকা যে, তারা ডা. জাকির নায়েকের সাথে তর্কযুদ্ধে হেরে যাওয়ার গ্লানি নিতে অনর্থক মুসলমানদের মহা সমাবেশে হাজির হবেন ? আবার অযথাই ডা. জাকির নায়েককে আমেরিকার মত খৃষ্টান দেশে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে তার কাছে পরাজয় বরণ করবেন ? এটা কত বড় পরিতাপের বিষয় যে তার কনফারেন্সে অফার দেয়া হচ্ছে। কোন ইবাদত বন্দেগী লাগবে না যীশুকে বিশ্বাস করলেই বেহেশতে চলে যাবে। ডা. সাহেবের উচিত ছিল তাদের যুক্তি খণ্ডন করা এবং উত্তর দেয়া। বাইবেল থেকে যা বলেছে যে বনী ঈসরাঈলের মুক্তির জন্যে ভেড়া উৎসর্গ করা মুসা (ﷺ) সাপ বানিয়ে বিষ নামানো, আর এর সাথে যীশুর ক্রুশের যুগসূত্র তৈরী করা সবই মিথ্যা বানোয়াট কল্পকাহিনী। বাস্তবিক পক্ষে এই ধরনের কোন ঘটনাই হয়নি। ডা. জাকির নায়েকের পক্ষ থেকে কোন উত্তর যেহেতু দেওয়া হয়নি, যত জনগণ উপস্থিত ছিলেন বা সিডি দেখবেন, সবার মন মস্তিষ্কে এই ধারণা অবশ্যই জন্ম নিবে যে, এত দিন যা শুনে এসেছি আলেমদের মুখে, সব মিথ্যা কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, ডা. জাকির নায়েক ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সারগর্ভ লেকচার দেন এবং তিনি খৃষ্টানদের উপর জয়ী ও হন। এর উত্তরে বলতে হয়। যেই বই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লিখা হয়েছে তার মধ্যে যদি কয়েক পৃষ্ঠা বা মাঝে মাঝে খৃষ্ট ধর্মের ভ্রান্ত মতবাদ ঢুকিয়ে দেয়া হয়। সে বই কি মুসলমানদের উপকারে আসবে নাকি ক্যান্সারের মত ভিতরে ঈমান আকীদা ধ্বংস করবে ? তদ্রুপ মুসলমানদের সমাবেশে খৃষ্টধর্মের প্রচার ঈমান-আকিদার জন্যে ক্যান্সার। আবার দেখা যায়, তার অনুষ্ঠানে অনেক অমুসলিম মুসলমান হয়। তা যদি দেখতে ভালও মনে হয় কিন্তু লাভ ক্ষতির হিসাব মিলাতে হবে। ১০ জন যদি মুসলমান হয়, আর ৫০ জন মুসলমান যদি ঈমান-আক্বীদা আমল নষ্ট হয়ে যায়, (যা বাস্তবেও হচ্ছে) তবে লাভের হার কত ? আবার বাস্তবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হল নাকি কোন ফাঁক ফোকর রয়েছে তা তদন্ত করলে বুঝা যাবে। আবার কেউ যদি তর্কে হেরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তা বেশী দিন থাকে না। কারণ যে ইসলাম ধর্মে মুগ্ধ হয়ে কবুল করেনি তার কাছে যখন তার ধর্মের লোকেরা সেই হেরে যাওয়ার বিষয়ে তার সংশয় কাটিয়ে দিবেন, তখন আবার নিজ ধর্মে ফিরে যেতে পারে। সেখানে যখন সব ধর্মের কথাই প্রচার করা হয়েছে। তাতে অন্য ধর্মের প্রচারে ঈমানদারগণ যেমন ঈমানের হুমকীতে পড়ে ঈমান হারা হওয়ার আশঙ্কায় পড়েছেন, তেমনি অন্য ধর্মের লোকেরাও ইসলাম ধর্মের কথা শুনে নিজ ধর্ম ছাড়তে পারেন। তাই লাভক্ষতির পাল্লা দেখতে হবে।

৮৯. ডা. জাকির নায়েকের সমাবেশে হিন্দু ধর্মের প্রচার

তার কনফারেন্সে হিন্দু ধর্মেরও প্রচার চলে কৌশলে। ডা. জাকির নায়েক বলেন, "আমি মুম্বাই, চেন্নাই এবং ভারতের আরো বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়েছি। যেখানে হাজার হাজার মুসলিম অমুসলিম উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার হিন্দুও এসেছিলেন। তাদের অনেকেই আমাকে বলে ছিলেন, জাকির ভাই! আমাদের হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গত ৪০ বছরে যা জানতে পারিনি, সেগুলো এই চার ঘন্টায় জানতে পারলাম।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃ: ২৩২) তার বক্তব্যে হিন্দুরা হিন্দু ধর্মের প্রতি উৎসাহিত হয়েছে। এমনকি হিন্দু ধর্মেও স্রষ্টার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি আল্লাহকে ব্রাহ্ম, বিষ্ণু ইত্যাদি নামে ডাকা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন এবং বেদকে নাযিলকৃত কিতাব বলেছেন এবং হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহকে অবতীর্ণ হওয়া বাণী উল্লেখ করে বলেন, এটা বেদেও সমসাময়িক কালে অথবা বেদের নিকটবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। রাম ও কৃষ্ণ নবী হতে পারেন বলেও মন্তব্য করেছেন। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃ: ২৬৫, ২৭৪, ২৭৬) তিনি আরো বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি একই রকম। বাহ্ ,হিন্দু ধর্মের কত বড় কল্যাণকামী বন্ধু! হিন্দুধর্মের অসারতা যে সব হিন্দুদের অন্তরকে নাড়া দিত তারাও স্বীকৃতি পেয়ে গেল এবং হিন্দুধর্ম ভ্রান্ত হিসেবে এতদিন যেই বিশ্বাস ছিল মুসলমানদের অন্তরে,তা পরিবর্তন হয়ে সত্য বলে বিশ্বাস জন্মালো।

৯০. হিন্দু পণ্ডিত খুশি হয়ে যা বললেন ঃ

ডা. জাকির নায়েকের বক্তব্য খুশি হয়ে হিন্দু পণ্ডিত শ্রী শ্রী রবি শংকর সমাবেশে মুসলমানদেরকে লক্ষ করে বলেন, -"তাহলে এখন আপনারা বেদকে সবাই শ্রদ্ধা করবেন। ডা. জাকির নায়েক নিজেই বলেছেন। সবারই বেদকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ। আর কথা হল, আপনারা ভাববেন না যে, এটা কাফির-মুশরিকদের বই। প্রত্যেক মুসলমানেরই এই গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করা উচিত।" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃ: ৪৭৬-৪৭৭) ডা. জাকির নায়েক ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও হিন্দু গুরুগণ তার কনফারেন্সে হিন্দু ধর্মের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরে হিন্দু ধর্মের স্বাতন্ত্র্যই ফুটিয়ে তুলেছেন এবং খুব সূক্ষভাবে মুসলমানদের মধ্যে তাদের ভ্রান্ত ধর্মাচারের প্রচারণা চালিয়েছে। হিন্দু ধর্মের আরেক গুরু স্বামী গলোকানন্দ প্রশ্নোত্তর পর্বে হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্ম মতবাদ, মোক্ষ, বর্ণপ্রথা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে মুসলমানের মাঝে হিন্দু মতবাদের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। পরে ডা. সাহেব এর সাথে তর্ক বিতর্ক হলেও তা কি বিষ ছড়ানোকে রোধ করতে পারে ?

৯১. ইসলাম প্রচারে ডা. জাকির নায়েকের ভুল তরীকা

ইসলাম ধর্ম প্রচারের তরীকা রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম শিখিয়েছেন। মুসলমানদের কাছে দ্বীনের আহকাম ও তা মানলে পুরস্কার এবং না মানলে কী শাস্তি তা বর্ণনা করে ঈমান ইয়াকীনের মজবুতীর আলোচনা করতে হবে। বিধর্মীদের কাছে ধর্ম প্রচারের নিয়ম হচ্ছে কুরআনে কারীম ও হাদিস শরীফের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে বুঝিয়ে সরাসরী ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর ইসলাম কবুল করার লাভ ও না করার ক্ষতি সম্পকে বর্ণনা করতে হবে। আবার ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিধর্মী রাষ্ট্রের কাছে কিভাবে দাওয়াত পৌছাবে তার কিছু বিস্তারিত আলোচনা আছে। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা ধর্ম প্রচারের সঠিক পদ্ধতী নয় যে, মহা সমাবেশের আয়োজন করে তাতে খৃষ্টান ফাদারকে বা হিন্দু ধর্ম গুরুকে এনে নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে আদ্যোপান্ত বলার সুযোগ দেন। তারাও সুযোগ পেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। ডা. জাকির নায়েক ও ইসলাম সম্পর্কে বলেন, তারপর একে তারা মত বিনিময় করেন এবং অপরের উত্তর দেন। অতঃপর শ্রোতাগণ খৃষ্টান ফাদার, হিন্দু গুরুজী ও ডা. জাকির নায়েককে এমন প্রশ্ন করেন- যার দ্বারা খৃষ্ট ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম প্রচারণার আরো যা বাকী ছিল তাও সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করা হয়। প্রত্যেক বক্তা নিজ ধর্মের দিকে আহবান করেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে অন্য ধর্মের প্রচার হয়, নিজ ধর্মের প্রতি সন্দেহ জাগে। কারণ প্রত্যেক বক্তা তার ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করতে চায়। অথচ অন্য ধর্মের বাতুলতা ও ইসলামের সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ পাক বলেন- إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلَامُ আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। (আলে ইমরান- ১৯) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করবে, তার থেকে সেটা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (আলে ইমরান- ৮৫) সাধারণ তর্ক অনুষ্ঠানে মন্দ দিক বাদ দিয়ে শুধু ভাল দিক গুলোর ব্যাপক আলোচনা হয়। তাই অন্য বাতিল ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের অন্তরে যে বিশ্বাস ছিল তার ভিন্ন ধারণার জন্ম নিতে পারে এবং বিধর্মীরা ডা. জাকির নায়েকের মুখে তাদের ধর্মের সাফাই শুনে নিজের ধর্ম মত নিয়ে আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে দু'দিকেই ক্ষতি। এ সব ক্ষতিগুলি ডা. জাকির নায়েক এর সমাবেশে হয়ে থাকে। তা ছাড়া আরো সমস্যা হচ্ছে তিনি নিজেই মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের বই পড়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, **"হিন্দুদের গ্রন্থসমূহ যেমন গীতা, রমায়ণ পুরাণ ইত্যাদি পড়ুন।?** (ডা. জাকিরের নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ৩, পৃ: ৪৯০) **অন্যত্র তিনি বিধর্মীদের বই পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন নাউযুবিল্লাহ।** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ১, পৃ: ৪৫৭) অথচ সাধারণ ভাবে জনসাধারণের জন্যে বিধর্মীদের

ধর্মগ্রন্থ পড়ার শরীয়ত অনুমতী দেয় না, কারণ যারা নিজের ধর্ম গ্রন্থই বুঝতে সক্ষম নয়, অন্য ধর্মগ্রন্থ কি বুঝবে ? একদিন রাসূল (ﷺ) এর সামনে হযরত ওমর (رضي الله عنه) তাওরাত নিয়ে পড়লে নবীজির চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অথচ ডা. জাকির নায়েক তার ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্কুলে মুসলমান শিশুদেরকে সকল ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন বলে জানান, **"আমাদের স্কুলে আমরা বিভিন্ন ধর্মের উপর শিক্ষা দেই। আমরা স্কুলের ছাত্ররা সাধারণ হিন্দুদের চাইতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বেশী জানে, সাধারণ খৃষ্টানদের চাইতে খৃষ্টধর্ম সম্পকে বেশী জানে।** (ভলিয়াম নং- ৩, পৃ: ৩৫)

ডা. জাকির নায়েকের এ ধরনের সমাবেশের কারণেই অনেক মুসলিম যুবকদের হাতে ও ঘরে এখন বাইবেল দেখা যায়। এই বাইবেল আল্লাহর বাণী বলে কোন মুসলমান বিশ্বাসই করতে পারে না। কেননা এটা মূল ইঞ্জিল নয়। পৃথিবীর কোথাও এখন মূল ইঞ্জিল নেই। ইসা (ﷺ) আসমানে উঠে যাওয়ার অনেক পরে খৃষ্টান ফাদাররা নিজেরাই এ বাইবেল তৈরী করে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করেছে যাতে, তারা ইচ্ছে মত সংযোজন বিয়োজন করে বিকৃত করেছে। আল্লাহ পাক বলেন-

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

-"ধ্বংস তাদের জন্যে যারা নিজেদের হাতে কিতাব লিখে, অতঃপর বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। তারা এটা করে সামান্য বিনিময় অর্জনের জন্যে, সুতরাং ধ্বংস তাদের হাতে যা লিখেছে তার এবং তারা যা কামাই করছে।" (সূরা বাক্বারা- ৭৯) সুতরাং সেখানে কাটছাঁট করা তাদের জন্যে কোন ব্যাপারই না। এ অবস্থায় তাদের ধর্মগ্রন্থের কোন বিষয়ে চ্যালেঞ্জে যাওয়া অনর্থক। এক্ষেত্রে মুসলমানদের করণীয় কর্তব্য হল, কুরআন শরীফের বাণী সমূহকে দলিল হিসেবে ধারণা করা। যা ব্যর্থহীন ঘোষণা করছেন **"ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (ﷺ) কে শুলেবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেনি, বরং মহান আল্লাহ তাকে নিজের কাছে (আসমানে) উঠিয়ে নিয়েছেন"।** (সূরা বাক্বারা- ১৫৭-১৫৮) আমাদের এটাই অকাট্য বিশ্বাস। আমরা তাদের সামনে কুরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরব, তারা যদি মানে, ভাল। অন্যথায় আমাদের কোন ক্ষতি নাই। এটাই সহীহ পদ্ধতি। এভাবে সারা বিশ্বে বিধর্মীরা মুসলমান হতে চলেছে। গলদ তরীকায় বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিই, তারা আরেক যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করে দিবে। এভাবে মুসলমান হয় না এবং সেটা ইসলাম প্রচারের পদ্ধতিও নয়।

৯২. মহিলাদের নামায পুরুষদের নামায থেকে অভিন্ন

নারী পুরুষের নামায একই নিয়ম বলে ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. জাকির নায়েক বলেন, **'তাহলে পুরুষ এবং মহিলারা সালাত আদায় করবে একই রকম নিয়মে এবং একই পদ্ধতিতে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।''**(ভলিয়াম নং-৪, পৃষ্ঠা নং- ২৪৬) অন্য এক লেকচারে ডা. জাকির নায়েক মহিলা পুরুষের নামাযের ভিন্নতার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে বলেন-**"সত্যি বলতে এমন কোন একটি সহীহ্ হাদিসও আপনি খুঁজে পাবে না যেটা বলছে মহিলারা সালাত আদায় করবে পুরুষদের থেকে ভিন্ন নিয়মে। এমন কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।"** (ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৪/২৪৬ পৃষ্ঠা)

ইসলামী দৃষ্টিকোণে তার বক্তব্য ঃ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি ধর্ম, সূরা মায়িদার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সে কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, ইরশাদ হচ্ছে, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নেয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।'

তাই ইসলামের সব বিষয়ে নির্দিষ্ট হুকুম রয়েছে। অন্য বিষয়গুলোর মতো-পুরুষ-মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্যের বিষয়টিও এর ব্যত্যয় নয়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যমনা থেকে সকলে এ পার্থক্য মেনে তদানুযায়ী নামায আদায় করতেন। বরং ঐকমত্যে পার্থক্যের বিপরীতে নতুন পদ্ধতি সামনে আসলে তা নিঃসংকোচ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে মানুষ ধোঁকায় না পড়ে। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) 'তারীখে সগীরে' উম্মে দারদা (রাযি.) এর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, 'তিনি নামাযে পুরুষদের মতো বসতেন, কিন্তু বর্তমান যমানায় ঐকমত্য যে বিষয়টি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত নীতির গবেষকগণ মতানৈক্য দাঁড় করিয়েছে। তাই নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যের বিষয়ে দালিলিক আলোচনা উম্মতের সামনে পেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

মূলকথা হলো, পুরুষ-মহিলার মাঝে মৌলিক যে তিনটি পার্থক্য করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো, অবস্থান ও কর্মস্থলের পার্থক্য। পুরুষের কর্মস্থল বাহিরে আর নারী গোপনীয় জিনিস।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلَّا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا-

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মহিলার জন্য নির্ধারিত হুজরায় নামায অপেক্ষা তার ঘরে নামায পড়া উত্তম, আর ঘরে নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্ত কোঠায় নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্ত কোঠায় নামায পড়া উত্তম।"[৩৮২] আর এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে মূলত মহিলার নামায পুরুষ থেকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যামনা থেকে সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ বিষয়টি খুব সহজভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃকও নির্দেশিত মহিলাদের নামাযের পার্থক্য অকপটে মেনে নিয়েছেন। এমনকি ইমাম চতুষ্টয় এই পার্থক্যের ব্যাপারে একমত। বাইহাকী (রহ.) বিষয়টি সুনানে কুবরায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, নামাযের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার নামাযে পদ্ধতিগত ভিন্নতার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো 'সতর' অর্থাৎ মহিলার জন্য শরীয়তের হুকুম হলো : ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করা, যা তাকে সর্বাধিক পর্দা দান করে। (বায়হাকী, সুনানে কুবরা)

মৌলিকভাবে মহিলার নামাযে পুরুষ থেকে গুরুত্বপুর্ণ ৫ ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে :

মহিলা পুরুষের নিম্নের এ পার্থক্যগুলো ছাড়াও আরও ফুকাহায়ে কেরাম পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। কিন্তু কিতাব দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় গূরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো দেয়া হলো।

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।

২. হাত বাঁধার স্থান।

৩. রুকুতে সামান্য ঝোঁকা।

৪. সিজদা জড়সড় হয়ে করা।

৫. বৈঠকে পার্থক্য।

প্রথম পার্থক্য : তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানো।

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

১."হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসলাম, তিনি আমাকে বললেন : হে

৩৮২. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৫৭০, আলবানীও হাদিসটিকে সহিহ বলে মেনে নিয়েছেন।

ওয়ায়েল ইবনে হুজর ! যখন তুমি নামায পড়বে তখন তুমি তোমার হাত কান পর্যন্ত উঠাবে আর মহিলারা তাদের হাত বুকের উপর বাঁধবে।"[৩৮৩] ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন, 'এই হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য উম্মে ইয়াহইয়া ব্যতীত।' কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিকট উম্মে ইয়াহইয়াও প্রসিদ্ধ।

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا

২.'বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।"[৩৮৪]

দ্বিতীয় পার্থক্য : হাত বাঁধা।

عن الطحاوى : المرأة تضع يديها على صدرها لان ذلك استرلها.

-"ইমাম তহাবী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা তাদের উভয় হাতকে বুকের ওপর রেখে দেবে, আর এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর।" (লাখনৌভী, আস-সিআয়া : ২/১৫৬, ফাতাওয়ায়ে শামী : ১/২৫পৃ.)

তৃতীয় পার্থক্য : রুকুতে কম ঝোঁকা।

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فَخِذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ "

-"যখন মহিলা রুকুতে যাবে তখন হাতদ্বয় পেটের দিকে উঠিয়ে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে, আর যখন সিজদা করবে তখন হাতদ্বয় শরীরের সাথে এবং পেট ও সিনাকে রানের সাথে মিলিয়ে দেবে এবং যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে।"

চতুর্থ পার্থক্য : সিজদা জড়সড় হয়ে করা।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ

-"'বিখ্যাত তাবেঈ ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (রহ.) হলেন, একবার নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন

৩৮৩. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/১৯পৃ. হাদিস নং.২৮ হাইছামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৯/৩৭৪পৃ. হাদিস নং.১৬০০৫

৩৮৪. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২১৬পৃ. হাদিস নং.২৪৫২

তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিশিয়ে দেবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নয়।' (কিতাবুল মারাসীল ইমাম আবু দাউদ, হাদিস নং- ৮০)

আবু দাউদ (রহ.) এর উক্ত হাদিস সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'আউনুল বারী' ১/৫২০ এ লিখেছেন, এই মুরসাল হাদিসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলিল হওয়ার যোগ্য।

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ "

-"হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবর (রহ.) পুরুষদের জন্য মহিলাদের মতো উরুর সাথে পেট লাগিয়ে সিজদা করাকে অপছন্দ করতেন।"[৩৮৫]

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا

-"হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ (রহ.) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যথাসম্ভব জড়সড় হয়ে থাকবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ফাঁকা রেখে সিজদা করবে না, যাতে কোমর উঁচু হয়ে না থাকে।"[৩৮৬]

পঞ্চম পার্থক্য : বৈঠকের ক্ষেত্রে মহিলাগণ উভয় পা বাঁ পাশ দিয়ে বের করে দিয়ে যমীনের ওপর নিতম্ব রেখে উরুর সাথে পেট মিলিয়ে রাখবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الْأُخْرَى، وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِي فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُونُ لَهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন এক উরু (ডান উরু) আরেক উরুর ওপর রাখে, আর যখন সিজদা করবে, তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, যা তার সতরের জন্য অধিক উপযুক্ত হয়।"[৩৮৭]

৩৮৫. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৪২পৃ.হাদিস ঃ ২৭৮০

৩৮৬. আব্দুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১৩৭, হাদিস ঃ ৫০৬৮

৩৮৭. সুনানে কুবরা বাইহাকী : ২/৩১৫পৃ. হাদিস নং.৩১৯৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَجْلِسْنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ، يُتَّقَى ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّيْءُ-

-"হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ (রাঃ) বলেন যে, মহিলাদেরকে আদেশ করা হতো তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের ওপর বসে, পুরুষদের মতো না বসে, আবরণীয় কোনো কিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়।"[৩৮৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِرُ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, মহিলারা কিভাবে নামায আদায় করবে ? তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাতে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে।"[৩৮৯]

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা একটু মনোযোগের সাথে পাঠ করলে একজন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের পাঠক সহজে অনুমান করতে সক্ষম হবে যে, মহিলাদের নামাযের পার্থক্যের বিষয়টি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবীদের যুগ থেকেই চলে আসছে এবং এর পক্ষে অনেক শক্তিশালী দলিল রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ (?) সালাফ থেকে চলে আসা সুপ্রতিষ্ঠিত মত ও পথকে উপেক্ষা করে নিজের গবেষণালব্ধ মত ও পথকে জনগণের মাঝে চালিয়ে দেওয়ার ও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো :

আরবের প্রসিদ্ধ গায়বে মুকাল্লিদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার 'সিফাতুস সালাত' নামক গ্রন্থে দাবি করেন যে, পুরুষ-মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন এবং তিনি তার এ দাবি হাদিসবিরোধী নয় এ কথা প্রমাণ করার জন্য প্রথম পর্যায়ে তিনি আহলে হকের পক্ষের মহিলাদের নামাযের পার্থক্য সম্বলিত মারাসীলে আবু দাউদের হাদিসটিকে এ কথা বলে যয়ীফ আখ্যা দিলেন যে, 'হাদিসটি মুরসাল, অতএব তা যয়ীফ' অথচ অধিকাংশ ইমাম বিশেষ করে স্বর্ণযুগের ইমামদের মতে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকলে মুরসাল হাদীসও মারফূ এবং সহীহ হাদিসের মতো গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। বিশেষ করে আবু দাউদ (রহ.) এর এই হাদিসটির শুদ্ধতার পক্ষে সমস্ত ইমামগণ এমনটি গাইরে মুকাল্লিদ আলেম সিদ্দীক হাসান খান সাহেবও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

[৩৮৮]. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৪২পৃ. হাদিস নং-২৭৮৩
[৩৮৯]. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১/২৪১পৃ. হাদিস নং. ২৭৭৮

তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বীয় মনগড়া উক্তিকে প্রমাণের জন্য ইব্রাহীম নাখয়ী (রহ.) এর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নাকি বলেছেন, 'মহিলাগণ পুরুষদের মতোই নামায আদায় করবে' এই উক্তি উল্লেখ করে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ এই গ্রন্থের কোথাও এই কথাটি নেই। বরং 'মাকতাবায়ে শামেলার' হাজার হাজার কিতাবে সার্চ করেও এই উক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বীনের নামে এমন জালিয়াতির কোন অর্থ হয় না।

তৃতীয় কাজটি এই করলেন যে, উম্মে দারদা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, 'তিনি নামাযে পুরুষের মতো বসতেন' আলবানী সাহেব এবং ডা. জাকির নায়েক[৩৯০] যদিও এই উক্তি দ্বারা নিজের দাবি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখজনক ভাবে এই উক্তি দ্বারা পুরুষ-মহিলার নামাযের পার্থক্যের কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হয়ে থাকলে 'উম্মে দারদা পুরুষের মতো বসতেন' এ কথা বলার প্রয়োজন কী ? যেহেতু উম্মে দারদা মহিলাদের নামাযে বসার প্রচলিত ও সাধারণ নিয়মের উল্টো করে পুরুষদের মতো বসতেন, যা ছিল একটি ব্যতিক্রমী জিনিস। তাই এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ কথা বুখারী (রহ.) এর 'তারীখে সগীরে' স্থান করে নিয়েছে।

এ ছাড়া আহলে হাদিস ভাইয়েরা নিজেদের উদ্ভাবিত আরো কিছু যুক্তি-তর্ক পেশ করে থাকেন, যেগুলোর দুর্বলতা দ্বীনের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন যে কেউ বুঝতে সক্ষম। তাই সেসব বিষয়ের অবতারণা করা হলো না।

আহলে হাদিস ভাইগণ পুরুষ-মহিলাদের অনেক ইবাদতে পার্থক্য মানেন, যেগুলোর ভিত্তি মহিলাদের সতর ঢাকার ওপর। যেমন ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা নিষেধ অথচ মহিলাদের জন্য মাথা ঢেকে রাখা ফরয। অনুরূপভাবে পুরুষগণ উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করে থাকেন অথচ মহিলাদের জন্য নিম্নস্বরে তালবিয়া পড়া জরুরি। এত শুধু হজ্বের কথা উল্লেখ করা হলো, এ ছাড়া আরো অনেক ইবাদতে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য বিদ্যমান। তাহলে নামাযের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার পার্থক্য মানতে তাদের সমস্যা কোথায় ? এই পার্থক্য তো আমাদের মনগড়া কোনো বিষয় নয়। সরাসরি হাদিস ও আসরে সাহাবা থেকে প্রমাণিত। আহলে হাদিস বন্ধুরা একদিকে হাদিস মানার দাবি করছে আবার অন্যদিকে হাদীসের উল্টা কাজ করছে, কী আজব বৈপরীত্য ?

মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো যাদের লক্ষ্য এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাদের উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের থেকে দূরে থাকার তাওফীক

[৩৯০].ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন।

দান করুন। আমীন। মহিলাদের ও পুরুষের নামাযের পার্থক্যের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন এবং হাফেয মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরীর লিখিত "নামাযে নারী ও পুরুষের ব্যবধান" গ্রন্থ দুটি দেখুন আশা করি এ বিষয়টির সঠিক সমাধান আপনারা পেয়ে যাবেন।

৯৩. পুরুষদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ! শরীয়ত কী বলে ?

ডা. জাকির নায়েক বলেন,"কুরআনে এমন কোন দলিল নেই যা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে। এমন কি কোন হাদিসও এমনও নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে না।"[৩৯১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বর্ণনায় মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, মহিলার জন্য নির্ধারিত হুজরায় নামায অপেক্ষা তার ঘরে নামায পড়া উত্তম, আর ঘরে নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্ত কোঠায় নামায অপেক্ষা নিভৃত ও একান্ত কোঠায় নামায পড়া উত্তম।"[৩৯২]

খ. একদা হযরত উম্মে হুমাইদ (ﷺ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাস, কিন্তু তোমার ঘরে নামায তোমার বাইরের হুজরায় নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার হুজরায় নামায তোমার বাড়িতে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার বাড়িতে নামায তোমার মহল্লার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায আমার মসজিদে নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর উক্ত মহিলা নিজ ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামাযের স্থান নির্ধারণ করিয়ে নিল এবং আমরণ তাতেই নামায আদায় করল।[৩৯৩]

৩৯১ .ডা.জাকির নায়েক উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর, ৪/২৩৪পৃ. পিস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
৩৯২ . সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৫৭০, হাদিসটি আলবানীর তাহক্বীক সূত্রে সহিহ।
৩৯৩ . মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবনে খুযাইমা ও সহীহ ইবনে হিব্বানের সূত্র "তারগীব-তারহীব" হাদিস নং- ৫১০, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৭হি.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

গ. হযরত উম্মে সালমা (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, গৃহাভ্যন্তরই হলো মহিলাদের জন্য উত্তম মসজিদ।[৩৯৪]
উপযুক্ত সহীহ হাদিসসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় :

(১). মহিলাদের নামাযের জন্য তাদের নিজ গৃহকোণ মসজিদ অপেক্ষা উত্তম।

(২) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

(৩.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে পন্থাকে উত্তম বলেছেন তার বিপরীতটা উত্তম ও সওয়াবের কাজ হতেই পারে না। কেউ এ ধরণের মনোভাব পোষণ করলে তা হবে চরম বেয়াদবী।

বি. দ্র. হাদিসের কয়েকটি বর্ণনা যা মহিলাদের মসজিদে আসা প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তা প্রাথমিক যুগের কথা, তখন পুরুষরাও সকল মাসআলা জানত না, তখন কয়েকটি কঠিন শর্ত সহকারে রাতের আঁধারে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে একদম পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত অনুমতি প্রত্যাহার করে তাদেরকে ঘরে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং ঐ সকল হাদিস দ্বারা বর্তমানে মহিলাদের মসজিদে গমন জায়েয বলা যাবে না।

৯৪. মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহাবীদের উক্তি :

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

ক. -"সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারিণী ও উম্মতের শ্রেষ্ঠ মহিলা আলেম আম্মাজান হযরত আয়েশা (ﷺ) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখতেন যে, মহিলারা (সাজসজ্জা গ্রহণে, সুগন্ধি ব্যবহারে ও সুন্দর পোশাক পরিধানে (মুসলিম শরীফের টিকা দ্রষ্টব্য) কী পন্থা উদ্ভাবন করেছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে

৩৯৪ . মুনযিরী, তারগীব, ১/১৪১পৃ. হাদিস ঃ ৫১১, মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং- ২৬৫৯৮

যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে।"[৩৯৫]

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ: رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ، يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ

খ. হযরত আবি আমর শাইবানী (রহ.) বলেন, আমি (এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে দেখছি যে, তিনি জুমু'আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা নিজ ঘরে চলে যাও, তোমাদের জন্য ইহাই উত্তম।"[৩৯৬] হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম ইবনে মুনযিরী (রহ.) বলেন-

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد لَا بَأْس بِهِ

-"হাদিসটি তাবরানী তার মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন, সনদে কোন অসুবিধা নেই।"[৩৯৭] এ হাদিসটিকে আলবানী পর্যন্ত এ কিতাবের তাহক্বীকে সহিহ লিগাইরিহী বলেছেন। ইমাম হাইসামী বলেন এ হাদিসের সমস্ত রাবি সিকাহ বা বিশ্বস্ত।[৩৯৮]

উল্লেখ্য, এ হলো নবীযুগের পরপরই মসজিদে গমনকারিণী মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তনে হযরত আয়েশা (রা.) এর উক্তি ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর আমল। অথচ তখনকার মহিলারা ছিলেন সাহাবী অথবা তাবেঈ, অন্য কেউ নন। পক্ষান্তরে আজ চৌদ্দ শতাব্দী পরে যখন মহিলাদের তেল, সাবান শ্যাম্পুসহ সকল প্রকার প্রসাধনীই সুগন্ধিযুক্ত। অধিকাংশ মহিলাই পর্দা করে না। যারা বোরকা পরে তাদের অধিকাংশই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল চেহারাকে উন্মুক্ত রাখে এবং তাদের বোরকা ও পোশাক হয় নজরকাড়া ফ্যাশনের। এ অবস্থা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি দিতেন, এটা বিবেকবান কেউ কি কল্পনা করতে পারে ?

৩৯৫ . সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৮৬৯, সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদিস নং- ৪৪৫, সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং.৫৬৯

৩৯৬ . ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, ৯/২৯৪পৃ. হাদিস ঃ ৯৪৭৫, মুনযিরী, তারগীব, তারগীব-তারহীব, ১/১৪২পৃ. হাদিস নং- ৫২০

৩৯৭ . মুনযিরী, তারগীব, তারগীব-তারহীব, ১/১৪২পৃ. হাদিস নং- ৫২০

৩৯৮ . ইমাম হাইসামী, মাযমাউদ যাওয়াইদ, ২/৩৫পৃ. হাদিস ঃ ২১১৯, মাকতুবাতুল কুদসী, কাহেরা, মিশর।

মহিলাদের মসজিদে গমনের ব্যাপারে হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত ঃ

ক. **হানাফী মাযহাব ঃ** সকল মহিলার জন্য জামা'আত, জুমু'আ, ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। (জুহাইলী, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : ১/১১৭পৃ.)

খ. **মালেকী মাযহাব ঃ** অতি বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আ অংশগ্রহণ হারাম। (আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ : ১/৩১১পৃ. ও ৩১২ পৃ.)

গ. **শাফেয়ী মাযহাব ঃ** অতি বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আসহ যেকোনো জামা'আতে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী। (আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ : ১/৩১১পৃ. ও ৩১২ পৃ.)

প্রিয় পাঠক! উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা যা পেলাম এর বিপরীতে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিস ও ফিকহী বর্ণনা নেই, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা অধিক সওয়াবের কাজ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণ ও পরবর্তী ফিকহবিদ ইমামগণ মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেছেন। তাহলে বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের চরম মুহূর্তে কী করে তা সাওয়াব ও আগ্রহের কাজ হতে পারে ? যে সকল আলেম বা স্কলার বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেন, তারা কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আয়েশা ও ইবনে মাসউদ (রা:) এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চেয়েও বেশি যোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে গেলেন ? অথচ এ সকল স্কলার অসংখ্য বেগানা মহিলাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ইসলামী লেকচার প্রদান করেন, কিংবা লক্ষ লক্ষ বেগানা মহিলাকে দেখার জন্য বিনা প্রয়োজনে নিজেকে উপস্থাপন করেন। যা সহীহ হাদিসের আলোকে পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ। (দেখুন : সুনানে তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং- ২৭৮২, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং- ৪১১২) বাস্তবে দ্বীন ও ইসলামের ক্ষেত্রে এরাও কি গ্রহণযোগ্য হয়ে গেলেন ?

মাসআলা ক. একই জামা'আতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে যে সকল পুরুষের সম্মুখে কিংবা পাশে কোনো মহিলা থাকবে যে সকল পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতওয়ায়ে শামী : ১/৫৭৩ পৃ., আমলগীরী : ১/৯৭পৃ.)

এ কারণেই হারাম শরীফে পুরুষদের সম্মুখে ও পাশে দাঁড়ানো থেকে মহিলাদেরকে নিবৃত্ত করতে কর্তৃপক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাকে।

মাসআলা : খ. মসজিদের যে তলায় মহিলারা জামা'আতে অংশগ্রহণ করে তার উপরতলার বরাবর স্থানে পুরুষ দাড়াবে তাদের সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামীসহ দুররে মুখতার : ১/৫৮৫, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ১/৯৭পৃ.)

উল্লেখ্য, টার্মিনাল, জংশন, এয়ারপোর্ট ও মুসাফিরদের যাত্রাবিরতির স্থানসমূহে, অনুরূপ হাসপাতাল ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে মহিলাদের নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা মূলত এ প্রেক্ষিতেই। **যেন তাওয়াফ-সাঈর জন্য আগমকারিণী, যিয়ারত ইত্যাদির জন্য বাইরে গমনকারিণীরা ও ভ্রমণরত মহিলারা সময় হলে নামায পড়ে নিতে পারে।** এ সকল স্থানে স্থানীয় আরব মহিলাদেরকে সাধরণত দেখা যায় না, তারা নিজেদের ঘরেই পড়ে নেয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা হারামাইন শরীফাইনে আগান্তুক শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ মহিলাদের জামা'আতে হাজির হওয়া দেখে এসে নিজেদের আবাসিক এলাকায় মসজিদে মহিলাদের ব্যবস্থা রাখার দাবি তোলে। অথচ সকল বালেগ পুরুষদের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে শরীক হয়ে পড়া ওয়াজিব, এর জন্যও যে কিছু করণীয় আছে তা চিন্তাও করে না। বিষয়টি এক প্রকার গোমরাহী, যা গভীরভাবে ভাবা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

৯৫. প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাস হতে আহ্বান করেছেন ডা. জাকির নায়েক ঃ

সন্ত্রাস কী ? ঃ 'সন্ত্রাস' একটি ভয়ানক অপরাধ। কাউকে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করার জন্য অন্যায়ভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আঘাত করা, বা এ সংক্রান্ত কোন প্রক্রিয়াকে সন্ত্রাস বলে। অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুসারে, সন্ত্রাস অর্থ সরকার বা অন্য কারো বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সহিংস কার্যক্রম। বাংলাদেশের সংবিধানে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-"যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে বা করা হতে বিরত রাখতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে....., তাহলে উক্ত ব্যক্তি "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।"[৩৯৯]

৩৯৯ . বাংলাদেশ সংবিধানের সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ : ১৬ নং আইন : ধারা নং- ৬ (১)।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল- সন্ত্রাস জঘন্য মারাত্মক অপরাধ। তাই কোন সৎ মানুষ সন্ত্রাস করতে পারে না বা সন্ত্রাসী হতে পারে না। সে জন্য ইসলাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী করেছে এবং সন্ত্রাস প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী আইনে সন্ত্রাসের কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

ফাসাদ-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্তক করে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

-"তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়, আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করেন না।"[৪০০]

জুলুম-সন্ত্রাস সম্পর্কে সাবধান করে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي، فَلَا تَظَالَمُوا .

-"আমি নিজের উপর জুলুম হারাম করেছি এবং আমার বান্দাদের ওপর একে হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না।"[৪০১]

ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইনে পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও ফাসাদ সৃষ্টির দণ্ড ও পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

-"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের বিপরীতমুখী হাত-পা (এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা) কেটে ফেলা হবে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে হতে বের করে দেয়া হবে (দেশান্তর করা হবে)। এটা দুনিয়াতে তাদের জন্যে চরম অপমান আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আজাব।"[৪০২]

উক্ত আয়াতে সন্ত্রাসের ধরন ও মাত্রাভেদে সন্ত্রাসীদের শাস্তির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। সন্ত্রাসীরা হত্যাকাণ্ড ঘটালে, সেক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা হবে, হত্যা

৪০০ . সূরাহ মায়িদা, আয়াত নং- ৬৪.
৪০১ . সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৬৭৪০.
৪০২ . সূরাহ মায়িদাহ, আয়াত নং- ৩৩.

ও লুণ্ঠন করলে, শূলে চড়ানো হবে, আর শুধু লুণ্ঠন করলে বিপরীতমুখী হাত-পা কর্তন করা হবে এবং শুধু ভীতি প্রদর্শন করলে, দেশান্তর বা কারারুদ্ধ করার শাস্তি প্রদান করা হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ হাদীস শরীফ ও ফিকহের কিতাবে রয়েছে।

এ ভিত্তিতেই হত্যা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا .

-"একজন মু'মিন ব্যক্তি ততক্ষণ তার দ্বীনের নিরাপত্তায় থাকবে যতক্ষণ না সে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করে।"[৪০৩]

ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত চিন্তাধারা

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসসমূহের দ্বারা সন্ত্রাসের ভয়াবহতা ও তার পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা গেল। এতে বুঝা যাচ্ছে- কোন মুসলমান সন্ত্রাসী হতে পারে না এবং যেহেতু সন্ত্রাসের ভিত্তিই হচ্ছে অন্যায় ও জুলুমের ওপর, তাই তা কখনো বৈধ হতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ডা. জাকির নায়েক প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসী বলে বর্ণনা করেছেন এবং সকল মুসলমানের সন্ত্রাসী হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে ডা. জাকির নায়েক তার সন্ত্রাস বিষয়কে Terrorism & Zihad লেকচারে বলেন-

"সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে আমি যদি মুসলমানদের ব্যাপারটা ধরি, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান এক একজন সন্ত্রাসী।"[৪০৪]

"নাউযুবিল্লাহ ! ডা. জাকের নায়েক কেমন করে প্রতিটি মুসলমানকে সন্ত্রাসী বললেন? এটা মুসলমানদের ওপর সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ এবং ইসলামের অপব্যাখ্যা বৈকি!

ডা. জাকির নায়েক সেখানে বিষয়টি আরো খোলাসা করে সন্ত্রাসীর সংজ্ঞা দিয়ে বলেন- **"সন্ত্রাসীর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সমাজে মানুষকে ভয় দেখায়।"**[৪০৫]

৪০৩ . সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৬৮৬২.

৪০৪ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৬৩, প্রকাশনায়- পিস পাবলিকেশন-ঢাকা।

৪০৫ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৬৩, প্রকাশনায়- পিস পাবলিকেশন-ঢাকা।

এরপর ডা. জাকির নায়েক পুলিশকে ভয়ভীতির জন্য ডাকাতের কাছে সন্ত্রাসী বলে ব্যঙ্গ করে বলেন- **"একজন ডাকাত যদি কোন পুলিশকে দেখে ভয় পায়, তাহলে সেই পুলিশ ডাকাতের কাছে একজন সন্ত্রাসী।"**

কত ডাহা অবাস্তব কথা! পুলিশ কি কোন ডাকাতকে অন্যায়ভাবে ভয় দেখায় বা কোন ডাকাত কি পুলিশকে সন্ত্রাসী মনে করে ? বরং পুলিশ তো আইনানুগ ব্যবস্থাই গ্রহণ করে থাকে এবং ডাকাতেরা তাদেরকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা বলেই জানে, কখনো তাদেরকে সন্ত্রাসী মনে করে না। মানুষকে বোকা বানাতে ডা. জাকির নায়েকের কী বিভ্রান্তিকর বক্তব্য !

অতঃপর ডা. জাকির নায়েক মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধের প্ররোচনা দিয়ে বলেন- "এভাবে প্রতিটি অসামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যেকটি মুসলমানের একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত।"[৪০৬]

অনুরূপভাবে ডা. জাকির নায়েক তার Islam And Terrortsm বিষয়ক লেকচার এক প্রশ্নের উত্তরে সেভাবে ডাকাত ও পুলিশের উদাহরণ টেনে বলেন-Every Muslim should be a terrorist. **"প্রত্যেক মুসলিমকে সন্ত্রাসী হতে হবে।"**[৪০৭]

এটা ডা. জাকির নায়েকের সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী মতবাদ এবং মুসলমানদেরকে বিপথগামী করার প্রয়াস। ইসলাম কখনো কোন মুসলমানকে কোন ব্যাপারে অন্যায়ভাবে মানুষকে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাসী হতে বলে না। তাই কোন মুসলমান সন্ত্রাসী হতে পারে না।

এর কারণ হলো, সন্ত্রাসের ভিত্তি হলো অন্যায় ও অবিচারের ওপর। অপরদিকে ইসলামের সকল হুকুম ও বিধান ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারো কথায় বা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ন্যায়পরায়ণতা থেকে কোনভাবে বিচ্যুত না হতে নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

৪০৬ . ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ৬৪, প্রকাশনায়- পিস পাবলিকেশন-ঢাকা।

৪০৭ . zakir-dr-by-terrorism-and-islam/.com.institutealislam.www//:http /naik

-"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী রূপে ন্যায়নীতির সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকো। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়নীতি পালন করবে না। তোমরা ন্যায়ভাবে চলো। এটাই তাকওয়ার নিকটতর পন্থা। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা করা, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।"[৪০৮]

বলা বাহুল্য, ইসলাম অসামাজিক কার্যকলাপ সন্ত্রাসের দ্বারা প্রতিহত করতে বলেনি, বরং ন্যায়সঙ্গতভাবে হিকমতের সাথে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .

-"(হে নবী)! আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে মানুষকে আহ্বান করুন হিকমত-প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা। আর তাদের সাথে মুকাবিলা করুন সেই পন্থায় যা সবচেয়ে উত্তম (অর্থাৎ উত্তম আখলাকের মাধ্যমে)।"[৪০৯]

এমনিভাবে ইসলাম যে বিভিন্ন সময় অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ ও জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে, সেটাও ন্যায়সঙ্গতভাবেই দিয়েছে। তাতে অন্যায় বা জুলুমের লেশমাত্রও নেই। এমনকি ন্যায়ানুগের দিক নিশ্চিত করার জন্যই প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও পূর্বশর্ত হিসেবে প্রথমে দ্বীনের পথে দাওয়াত দিয়ে তা গ্রহণের সুযোগ অথবা জিম্মার ধারা গ্রহণপূর্বক জিযিয়া প্রদানের অবকাশ, কোন মুসলমানে আশ্রয় গ্রহণকারী বিধর্মীকে আঘাত না করা, অযোদ্ধা দুর্বল-রুগ্ন ও অশীতিপর বৃদ্ধ পুরুষ এবং মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা না করা প্রভৃতির বিধি-নিয়ম রয়েছে। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানে কিসাস, হদ, জালদ্ প্রভৃতি দণ্ডবিধান সম্পূর্ণ ন্যায়নীতি ভিত্তিক বিধিবিধান। সুতরাং ইসলামের এ সকল বিধান বা কোন বিধানে সন্ত্রাসের কোনরকম অবকাশ নেই।

তবে ইসলামবিরোধীরা ইসলাম ও মুসলিম সমাজের ওপর কালিমা লেপনের জন্য সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে সন্ত্রাস শব্দের তকমা ব্যবহার করে। ডা. জাকির নায়েক উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা যে তাদের সেই মিথ্যা রসদেরই যোগান দিলেন! এক্ষেত্রে তার কথা যে সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহুদী ও খৃস্টান চক্রের ষড়যন্ত্রেরই আরশি হয়ে দেখা দিয়েছে।

বস্তুত পৃথিবীকে উদ্ধার করার নামে ফাসাদ-সন্ত্রাস চালানো কাফির-মুনাফিকদের কাজ। তাদের মতলব হাসিলের জন্য নানারকম সন্ত্রাস করে আর এ সন্ত্রাসী কাজকে

৪০৮ . সূরা মায়িদা, আয়াত নং- ০৮.
৪০৯. সূরা নাহল, আয়াত নং- ১২৫.

বিশ্ব পরিশুদ্ধির কাজ বলে প্রচার চালায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ – أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ .

-"যখন তাদেরকে (কাফির-মুনাফিকদেরকে) বলা হয়, তোমরা দুনিয়ার বুকে ফাসাদ করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো দুনিয়ার পরিশুদ্ধকারী। মনে রেখো, তারাই ফাসাদকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করছে না।"[৪১০]

এ কাফির-মুনাফিকদের কাজকে ডা. জাকির নায়েক কী করে মুসলমানদের কাজ বললেন এবং প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসী হওয়ার জন্য বলে বিপথগামিতার প্ররোচনা দিলেন-তা বড়ই মারাত্মক কাণ্ড। এভাবে বহু বিষয়ে ডা. জাকির নায়েক ইসলামের অপব্যাখা করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে চলেছেন। তার এসব গোমরাহী থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা কর্তব্য।

৯৬. নামাযে নাভির নিচে হাত বাঁধা নিয়ে বিভ্রান্তি ?

ডা.জাকির নায়েক হানাফী মাযহাবের নামায পদ্ধতি "নাভির নিচে হাত বাঁধা' সম্পর্কে বলেন এগুলো দ্বঈফ হাদিস সম্মত। তাই সে লিখেন-"তাহলে নামাযের সময় কোথায় হাত রাখবেন সে ব্যাপারে **মযবুত হাদীস হচ্ছে** নামাযে **"বুকের ওপর হাত রাখবেন"**।[৪১১] তারপর ডা. জাকির নায়েক নিজের বিষয়ে বলেন-"তাই আমি যখন নামায পড়ি তখন **আমার হাত রাখি** বুকের ওপর।"[৪১২]

সঠিক ফায়সালা ঃ

সম্মানিত পাঠবৃন্দ! বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়ে পূর্ববর্তী কোন মুজতাহিদ ইমামের আমল পাওয়া যায় না। বরং ইমাম আহমদসহ কোন কোন ইমাম বুকের উপর হাত বাঁধাকে মাকরুহ বলেছেন। বরং আমরা অনুসন্ধান করে পাচ্ছি যে বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামগণ বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন। যেমন প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ মুহাম্মদ ইবন মুফলিহ (ওফাত.৭৬৩ হি.) বলেন-

وَيُكْرَهُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ

৪১০ . সূরা বাক্বারা, আয়াত নং- ১১-১২.
৪১১ . ডা.জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৮৫পৃ.
৪১২ . ডা.জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৮৫-৮৬পৃ.

-"হস্তদ্বয় বুকের উপরে রাখা মাকরুহ। তিনি (ইমাম আহমদ) সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলেছেন, যদিও আহমাদ নিজেই এ হাদিস সংকলন করেছেন।"[৪১৩] তাই আহলে হাদিসদের ইমাম এবং হাম্বলী মাযহাবের দাবিদার ইবনুল কাইয়্যিম বলেন-

قال فى روية المزنى: أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما على الصدر

-"মুযানীর বর্ণনায় ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন (সালাতের মধ্যে হস্তদ্বয় রাখবে) নাভীর অল্প নিচে। বুকের উপর হস্তদ্বয় রাখা মাকরুহ।"[৪১৪] ইমাম আবূ দাউদ ইমাম আহমাদের বিভিন্ন ফিকহী মত নিজে তাঁর কাছ থেকে শুনে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত গ্রন্থে বুকে হাত রাখা সম্পর্কে ইমাম আহমাদের মত প্রসঙ্গে ইমাম আবূ দাউদ বলেন-

وَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ، يَعْنِي: وَضْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الصَّدْرِ

-"আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, হস্তদ্বয় বুকের নিকট রাখা মাকরুহ।"[৪১৫]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুফলিহ (রাহিমাহুল্লাহ) (ওফাত.৭৬৩ হি.) বলেন-

وَظَاهِرُهُ يُكْرَهُ وَضْعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ، نُصَّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ رَوَاهُ.

-"এটা হাম্বালী প্রকাশ্য মাযহাব যে, নামাযে বুকের উপর হাত রাখা মাকরুহ। যদিও ইমাম আহমাদ এ বিষয়ে হাদিস সংকলন করেছেন।"[৪১৬]

বুকের উপর হাত বাঁধার কি কোন সহিহ হাদিস আছে?

বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়ে কোন সহিহ হাদিস নেই। জাকির নায়েক নায়েক তার সপক্ষে দু'টি হাদিস পেশ করেছেন তার ব্যাখ্যা এবং সনদ কতটুকু আমি আপনাদের জন্য নীচে উপস্থাপন করলাম।

জাকির নায়েকের মতের পক্ষের হাদিস নং-১

বুকের উপর হাত বাঁধার নিম্নের সুনানে আবু দাউদের দ্বঈফ সনদের হাদিস সম্পর্কে বলেন,"**যদিও এটা মুরসাল হাদিস কিন্তু এটাকে আরো বেশী সবল হাদিস বলা হয়েছে**। মুরসাল মানে এখানে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাফসীরে বলা

৪১৩ .মুফলিহ, আ-ফুরু, ২/১৬৯পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২৪হি.
৪১৪ .ইবনুল কাইয়্যিম, বাদাইউল ফাওয়ায়িদ, ৩/৯১-৯২পৃষ্ঠা,
৪১৫ .ইমাম আবূ দাউদ, মাসাইল ইমাম আহমাদ, ৪৮পৃ. মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রু, মিশর, প্রথম প্রকাশ.১৪২০হি.
৪১৬ .ইবনে মুফলিহ, মুবদা'আ শরহে মাক্বানা'আ, ১/৩৮১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪১৮হি.

হয়েছে-এটা অন্যান্য হাদীসের চেয়ে বেশ মযবুত হাদীস।"[৪১৭] তার এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। এ হাদিসের সনদটি মুনকার তথা বাতিল। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! জাকির নায়েক তো বললেন যে তাফসীরে এটিকে মযবুত বলা হয়েছে। আচ্ছা হাদিসের ব্যাখ্যা কী তাফসীরে করা হয়? আচ্ছা যদি করা হয়েও থাকে তাহলে কোন তাফসীরে করা হয়েছে? কোনো তাফসীরেই নয়; এটি জাকির নায়েকের মিথ্যা উক্তি; তা না হলে তিনি কেন কিতাবের নাম উল্লেখ করলেন না? যা নিম্নের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হাদিস বর্ণনা ঃ তাবেয়ী হযরত তাউস (রাহিমাহুল্লাহ) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

-"রাসূল (ﷺ) নামাযরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে তা নিজের বুকের উপর বেঁধে রাখতেন।"[৪১৮]

উক্ত হাদিসের ব্যাপারে আলবানীর ভুয়া তাহক্বীক ঃ আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সহিহুল আবি দাউদ এর ৭৫৯ নং হাদিসে উক্ত হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। তাই জাকির নায়েক যেহেতু তার অনুসারী সেহেতু তিনিও তার মতের উপর ভিত্তি করে আমল করছেন। অথচ উক্ত হাদিসটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দ্বয়ীফ বা দুর্বল বা ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে মুনকার বা জাল বলাও চলে। আহলে হাদীসগণের নিকট এবং আলবানীর নিকটও মুরসাল হাদিস দোষনীয় এবং ইহা এক প্রকার হাদিসের দুর্বলতা। অথচ এখানে এসে আবার আলবানী দলের টানে, নিজের মতকে শক্তিশালী করার জন্য সে নীতি একদম ভুলে গেছেন। আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে তাউস (রাহিমাহুল্লাহ)'র মুরসাল কে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।[৪১৯] আলবানী হযরত তাউস (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অন্য মুরসাল সম্পর্কে তার কিতাবের এক স্থানে বলেন-

أخرجه ابن أبي شيبة (١ / ٢) من طريق زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:. . . فذكره. قلت: وهذا مع إرساله ضعيف؛

৪১৭ . ডা.জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ৫/৮৫পৃ.
৪১৮ . ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/৪১৮ পৃ, হাদিস নং- ৭৫৯.
৪১৯ . আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ, ৭/২১৫-১৬পৃ. হাদিসঃ .৩২২৯

-"ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) তার মুসান্নাফের ২/১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন.....হযরত তাউস (রহ.) বলেন, রাসূল (ﷺ) অনুরূপ বলেছেন.....। আমি বলবো সনদটি মুরসালসহ দ্বঈফ।"[৪২০]

অপর দিকে নাভির নিচে হাত বাঁধার উক্ত সনদটি শুধু মুরসালই নয়। উক্ত সনদের একজন অন্যতম রাবী হলেন 'সুলায়মান ইবনে মুসা', যিনি মৃত্যুর আগে অনেকদিন স্মৃতিশক্তি লোপ জনিত দুর্বলতায় পড়ে ছিলেন। তাই তাঁর হাদিস আর সহীহ থাকে নি। অনেকেরই মত তিনি তাবে-তাবেয়ী ছিলেন।[৪২১] ইমাম বুখারী (রাহ.) বলেন- مناكير "তিনি মুনকার হাদিস বর্ণনা করতেন।" ইমাম নাসায়ী বলেন- ليس بالقوى "তিনি মজবুত কোন রাবী নয়।"[৪২২] ইমাম মিয্যী বলেন-

وقال البُخاريُّ : عنده مناكير. وَقال النَّسَائي : أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث.

-"ইমাম বুখারী(রহ.) বলেন সে আমাদের নিকট মুনকার বা আপত্তিকর রাবি। ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, তিনি একজন ফকিহ ছিলেন, তিনি হাদিসে শক্তিশালী বা মযবুত রাবি নয়।"[৪২৩] তিনি আরও বর্ণনা করেন ইমাম নাসায়ী (রহ.)'র আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন 'তার হাদিস কিছুই নয়'।"[৪২৪] ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন,

وحكى بن عساكر أن أبا زرعة ذكره في الضعفاء.

-"ইমাম ইবনে আসাকীর বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই হাফেজুদ্-দুনিয়া ইমাম আবূ যারওয়া (রহ.) তাকে দ্বঈফ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[৪২৫] ইবনে হাজার আরও উল্লেখ করেছেন-

وذكره العقيلي عن البخاري أنه منكر الحديث

৪২০. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদুআহ,১২ /৩৫৯পৃ. হাদিসঃ ৫৬৫৯
৪২১. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৭৫-১৭৬ পৃ, রাবী, ৩৮৬৯।
৪২২. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ২/১৭৫-১৭৬ পৃ, রাবী, ৩৮৬৯, নীমাভী, আছারুস-সুনান, ৯১পৃ.
৪২৩.ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কালাম, ১২/৯৭ পৃ, ক্রমিক নং- ২৫৭১, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০০হি.।
৪২৪.ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কালাম, ১২/৯৭ পৃ, ক্রমিক নং- ২৫৭১, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০০হি.।
৪২৫ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৪/২২৭-২২৮পৃ. (শামিলা)

-"ইমাম উকাইলী (রহ.) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই তার হাদিস মুনকার বা বাতিল।"[৪২৬] ইবনে হাজার আরও উল্লেখ করেছেন-

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه

-"ইমাম উকায়লী (রহ.) বলেন, তার হাদিসের অনুসরণ করা যাবে না।"[৪২৭] তাই সর্বশেষ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-**"প্রতীয়মান হয় যে উক্ত হাদিসটি নিঃসন্দেহে মুনকার অথবা দুর্বল।"**[৪২৮]

এ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ নয় যে কারণে ঃ

তার কয়েকটি কারণ নিম্নে দেয়া হলো।

১. এ হাদিসটি মারফূ হাদিসের বিপরীত। উসূলে হাদিসের নীতিমালায় এ মারফূ হাদিসের মোকাবেলায় মুরসাল হাদিসের উপর আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

২. অপরদিকে সনদটি মুনকার বা আপত্তিকর, কেননা সনদে ইমাম বুখারীর ফাত্ওয়ায় মুনকার রাবী বিদ্যমান।

৩. আর তাউস (রহ.)-এর মুরসাল এমনিতেই দুর্বল পর্যায়ের, যা আহলে হাদিস আলবানী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।

৪. শরিয়তে হুজ্জাত প্রমাণে সহিহ হাদিস লাগবে, তাই আহলে হাদিসরা এ হাদিসের উপর আমল করলেও আমরা এ হাদিসের উপর আমল করতে পারছি না।

ডা. জাকির নায়েকের মতের পক্ষের ২য় দলিল বা হাদিস ঃ

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ .

-"আমি নবী করীম (ﷺ) এর সাথে নামায পড়েছি। অতঃপর (এখানে فَاءَ আতেফায়ে তা'কীবিয়াহ) তিনি তার বাম হাতের উপর ডান হাত তার বুকের ওপর[৪২৯]

৪২৬ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৪/২২৭-২২৮পৃ. (শামিলা)
৪২৭ .ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৪/২২৭-২২৮পৃ. (শামিলা)
৪২৮ .ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে নেকায়া, ১/২৪২-২৪৩ পৃ.।
৪২৯. আরবী 'সদর' বলতে পেট থেকে গলা পর্যন্ত শরীরের সম্মুখভাগ বুঝায়, দেখুন- আল্-মু'জামুল ওয়াসীত, ১/৫০৯ পৃষ্ঠায়। তাই সরাসরি বক্ষ বা বুকের উপর হাত রেখেছেন বলা যাবে না।

রেখেছেন।"[৪৩০] (মতনটি বুলূগুল মারাম, তুহফাতুল আহওয়াজী, নববীর মাজমূ শরহে মুহায্যব থেকে নেয়া)।

হাদিসের সারমর্ম পর্যালোচনা ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উক্ত হাদিসে রয়েছে যে, উক্ত সাহাবী রাসূল (ﷺ) এর পিছনে নামায পড়েছেন। فَوَضَعَ يَدَهُ অতঃপর তাঁর হাত বুকের ওপর রাখলেন।[৪৩১] فَاءَ বর্ণটি আতেফায়ে তা'কীবিয়াহ জন্য ব্যবহৃত হয়, যে ইলমে নাহু শাস্ত্র সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞানও আছে সেও জানে 'ফা' বর্ণটি একটি কাজ শেষ হওয়ার পর বিলম্ব হওয়া ব্যতীত অন্য একটি কাজ শুরু করা বুঝায়।[৪৩২] উদাহারণ স্বরুপ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)-"আর যখন তোমরা আহার কার্য সম্পাদন কর, অতঃপর (তারপর) বাইরে চলে যাও।"[৪৩৩] তাই এর অর্থ এ নয় যে, আহারকালীন রুটি হাত নিয়ে চলে যাও। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উক্ত হাদিসের গুঢ় রহস্যের দিকে তাকালে প্রকাশ্যে জানা যায় যে, নামাযের পর তিনি কোন এক প্রয়োজনের তাকিদে বুকের উপর হাত রেখেছিলেন। আর সাহাবি রাসূল (ﷺ) এর পিছনে নামাযের বর্ণনা দেননি, বরং রাসূল (ﷺ)'র সাথের নামাযের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাহলে বুঝা যায় যে, এটা কোন ফরয নামায ছিলনা বরং নফল নামায বলেই বুঝা যায়। অপরদিকে সদর শব্দ দ্বারা আরবি অভিধান শাস্ত্রে সরাসরি বক্ষ বুঝায় না। যেমন বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ 'আল-মু'জামুল ওয়াসিত' অভিধান গ্রন্থে রয়েছে-

(الصَّدْر) وَصدر الْإِنْسَان الْجُزْء الممتد من أَسْفَل الْعُنُق إِلَى فضاء الْجوف

-"মানুষের ক্ষেত্রে সাদর বা বুক হলো গলার নিচ থেকে পেটের উন্মুক্ত স্থান পর্যন্ত দীর্ঘ জায়গা।"[৪৩৪] তাই বুঝা গেল যে সরাসরিভাবে বক্ষ বলে তাকে জাহেল ছাড়া কিছুই বলা যাবে না।

---

৪৩০. ক. ইমাম ইবনে খুযায়মা, আস্-সহীহ, ১/২৪৩পৃ. হাদিস নং- ৪৭৯. মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, ইবনে হাজার আসকালানী, বুলুগুল মারাম, ১২১পৃ, হাদিস নং- ২৭৮, নববী, আল্-মাজমূ, ৩/৩১ পৃ. মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস-সুনানি ওয়াল, ১/১৬৯ পৃ, হাদিস নং- ৪২৭. আব্দুর রহমান মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৮২ পৃ, হাদিস নং- ২৫২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৪/৩৮৯ পৃ, হাদিস নং- ৭৪০.

৪৩১ . অধিকাংশ কিতাবের মতনে এভাবেই পাওয়া যায়.মেন ইবনে হাজার আসকালানীর বুলূগুল মারাম দেখুন।

৪৩২ . এ ব্যাপারে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরুপ উম্মোচন" গ্রন্থের ৪৯৫-৪৯৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে তা দেখে নেয়ার অনুরোধ রইলো।

৪৩৩ . সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৫৩.

৪৩৪ .ড. ইব্রাহিম আনিস, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১/৫০৯পৃ. দারুল দাওয়াত, মিশর।

তাই হাদিসটি সরীহ বা সুস্পষ্ট নয়, আবার সনদ সহিহও নয়, যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

সনদ পর্যালোচনা ঃ সহীহ ইবনে খুযায়মার এ হাদিসের عَلَى صَدْرِهِ "বুকের ওপর অংশটুকুর" ব্যাপারে আহলে হাদিসের ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তার "ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন" এ উল্লেখ করেছেন যে-

وَلَمْ يَقُلْ: «عَلَى صَدْرِهِ» غَيْرُ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ.....

-"عَلَى صَدْرِهِ (বুকের ওপর নবীজি হাত রেখেছেন) কথাটুকু "মুয়াম্মেল ইবনে ইসমাঈল" নামক জনৈক রাবীর নিজস্ব বৃদ্ধি, তাছাড়া সুফিয়ান ছাওরী (রাহিমাহুল্লাহ)এর অন্যান্য শাগরেদ তাদের বর্ণিত এই হাদিসে এই অংশটুকু উল্লেখ করেনি।"[৪৩৫]

অতএব বুঝা গেল এটা তার নিজস্ব বৃদ্ধি, তার হাদিসটিই সংকলন করেছেন ইমাম ইবনে খুযায়মা (রাহিমাহুল্লাহ)। সর্বশেষ প্রতীয়মান হয় যে উক্ত রাবীর এটা নিজস্ব বৃদ্ধি, কারণ তিনি হাদিসে অনেক ভুল করতেন। ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ)স্বয়ং বলেন-

مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ.

-"তিনি হযরত উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)এর বংশের গোলাম ছিল, তিনি হাফেজ ছিলেন এবং আলেম ছিলেন, তবে তিনি হাদিসে ভুল করতেন।"[৪৩৬]

ইমাম আবু হাতেম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন- الخَطَأ كثير -"তিনি বেশি ভুল করতেন। ইমাম আবু যারওয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন- فِي حَدِيثِهِ الْخَطَأ كثير -"তিনি হাদিসে অনেক ভুল করতেন।"[৪৩৭]

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেন- قال البخاري: منكر الحديث "ইমামুল হাদিস ইমাম বুখারি[৪৩৮] তাকে মুনকার বা বাতিল অগ্রহণযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।"[৪৩৯]

---

৪৩৫ .ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, ২/২৮৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ.১৪১১হিজরী।

৪৩৬.ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২০৯ পৃ, রাভী, ৯৪৪৩. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৪৩৭ . ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২০৯ পৃ, রাবী নং- ৯৪৪৩.

৪৩৮ . ইমাম বুখারি কোন মিথ্যাবাদী রাবিকেই মুনকার (আপত্তিকর) বা অত্যন্ত দুর্বল বলতেন।
খ. ইমাম যাহাবী, মা'রিফাতুর্-রেওয়াত-তাল মুতাকাল্লিম ফিহিম, ১৮০ পৃ.

বিশ্ব বিখ্যাত আসমাউল রিজালবিদ ইমাম মিয্যী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَقَال أَبو حاتم : صدوق، شديد فِي السنة، كثير الخطأ . وقَال البُخارِيُّ: منكر الحديث.

-"ইমাম হাতেম[৪৪০] বলেন, তিনি যদিও সত্যবাদী ছিলেন তবে তিনি সুন্নাহ (হাদিস) অনেক ভুল করতেন এবং এমনকি ইমাম বুখারী (রহ.) তাকে 'মুনকারুল হাদিস' অর্থাৎ পরিত্যক্ত হাদিস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।"[৪৪১] ইমাম মিয্যী(রহ.) আরও বলেন,

وَقَال غيره: دفن كتبه فَكَانَ يحدث من حفظه، فكثر خطؤه.

-"অনেকে বলেন, তার কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দাফন হয়ে যাওয়ার পর তিনি স্মৃতিশক্তি থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন, তাই অনেক ভুল করতেন।"[৪৪২]

তাই প্রমাণিত হল যে হাদিসটি মুনকার বা বাতিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং ইমাম বুখারী (রহ.) এর দৃষ্টিতে হাদিসটি মুনকার প্রমাণিত হয়। তাপর দিকে আহলে হাদীসদের মুহাদ্দীস আব্দুর রহমান মোবারকপুরী উক্ত হাদিস উল্লেখ সম্পর্কে বলেন-

قلت سلمنا ان مومل بن اسماعيل ضعيف ورواية البيهقى هذه ضعيفة-

"উক্ত হাদিসে 'মুয়াম্মেল ইবনে ইসমাঈল' নামক রাভী দুর্বল এবং ইমাম বায়হাকী (রহ.) উক্ত রাবীর কারণে হাদিসকে দুর্বল হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন।"[৪৪৩]

ইমাম বায়হাকী (ওফাত. ৪৫৮হি.) এ হাদিস সম্পর্কে তিনি বলেন-

رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَن الثَّوْرِيّ لم يذكر وَاحِد مِنْهُم على صَدره غير مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل.

-"ইমাম সুফিয়ান সাওরী থেকে তার এক জামাত ছাত্ররা এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বুকের উপর শব্দটি 'মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল' ছাড়া কেউই বর্ণনা করেননি।"[৪৪৪]

বুঝা গেল এ রাবিটিই এ মতনের শেষের শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

গ.ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৭/৪০৬পৃ. ক্রমিক.৪৯৮৭

ঘ.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ১০/৩৮১পৃ. ক্রমিক.৬৮২

৪৩৯ . ক. ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৪/২০৯ পৃ, রাভী নং- ৯৪৪৩.

খ. ইমাম যাহাবী, মা'রিফাতুর-রেওয়াত-তাল মুতাকাল্লিম ফিহিম, ১৮০ পৃ.

৪৪০. ইমাম আবু হাতেম, জার্‌রাহ ওয়া তা'দীল, অষ্টম খন্ড, রাবী, ক্রমিক, ১৭০৯

৪৪১. ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কালাম, ২৯/১৭৮ পৃ, রাভী নং- ৬৩১৯, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ- ।

৪৪২. ইমাম ইবনে মিযযী, তাহযীবুল কালাম, ২৯/১৭৮ পৃ, রাবী নং- ৬৩১৯, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ- ।

৪৪৩ . মোবারকপুরী, আবকারুল মানান, ১০৯ পৃ, জামেয়ায়ে সালাফিয়্যাহ, লক্ষীপুর, ভারত।

৪৪৪ .শিহাবুদ্দীন, মুখতাসারুল খিলাফিয়্যাতুল বায়হাকী, ২/৩৩-৩৪পৃ. মাকতুবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

নাভীর নিচে হাত বাঁধার কতিপয় হাদিসে পাক ঃ

ডা. জাকির নায়েক হানাফিদের যে হাদিসের সনদটি দুর্বল সে শুধু সে হাদিসটি শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। অথচ এ বিষয়ে এটি ছাড়াও আরও বহু হাদিস রয়েছে; সেগুলো তিনি উপস্থাপন করেননি।

এ হানাফীদের মারফূ হাদিস ঃ

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

-"আমি রাসূল (সা.) কে দেখেছি (সালাতে দাণ্ডায়মান অবস্থায়) তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রেখেছেন।"[৪৪৫]

এ সনদটি সহিহ তাতে সকলেই একমত।[৪৪৬] এ হাদিসের 'নাভীর নিচে' শব্দটি কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে আহলে হাদিসরা ফেলে দিয়েছে। তবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দয়ায় সত্যকে প্রকাশিত করার জন্য বিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি গবেষক আল্লামা শায়খ আবু আওয়ামা তাহক্বীকে দুটি পুরানো পাণ্ডুলিপি তার হস্তগত হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন।[৪৪৭]

মাওকুফ হাদিস ঃ

আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী (রহ.), ইমাম ইবনে শাহীন (রহ.), ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবরাহিম (রহ.) তার কিতাবুস্-সলাত এর সূত্রে তাঁর হাদিস গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আর সেখানে তিনি বলেন-

علي قال: ثلاثة من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الأكف تحت السرة في الصلاة

৪৪৫.ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/৩৪৩ পৃ, হাদিস নং- ৩৯৩৮ এবং ৩৯৩৯, মাতবায়ে মাকতাবাতুল রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব। মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার, ১/১৬৯ পৃ, হাদিস নং- ৪২৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। আল্লামা মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৮৪ পৃ, হাদিস নং- ২৫২। মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, আদিল্লাতে কামেলা, ২২ পৃ.। মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে নেকায়া, ১/২৪২-২৪৩ পৃ.। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বাহলুভী, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ, ১৫৭ পৃ, হাদিস নং- ৩৬৬, দামেস্ক হতে প্রকাশিত।

৪৪৬ . এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত **"নামাযে হাত বাঁধার বিধান"** দেখুন।

৪৪৭ . আহলে হাদিসদের এ হাদিস চুরির ইতিহাস এখন সবাই জানে। আমাদের কাছে মুসান্নাফে আবি শায়বার নাভীর নিচে শব্দসহ এ হাদিস রয়েছে যে কোনো সময় আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। বিস্তারিত দেখুন আমার লিখিত **"সহিহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার পদ্ধতি"**।

-"তিনটি জিনিস নবুওয়াতের মহান স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। বিলম্বে না করে যথাসময়ে তাড়াতাড়ি ইফতারি করা, বিলম্বে সাহরী ভক্ষণ করা এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধা।"[৪৪৮]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَاد بْنِ زَيْد، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

-" ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তিনি মুহাম্মদ বিন মাহবুব (রহ.) থেকে তিনি হাফস বিন গিয়াস তিনি আব্দুর রাহমান বিন ইসহাক তিনি যিয়াদ ইবনে যায়েদ তিনি হযরত আবু জুহাইফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নিশ্চয় হযরত আলী (রাযি.) বলেন, নামাযে রত অবস্থায় নাভির নিচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।"[৪৪৯]

মাকতু হাদিস ঃ

এ বিষয়ে ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) নিম্নের এ হাদিসটির সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

-"তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ওয়াকী (রহ.) থেকে তিনি রাবেঈ (রহ.) থেকে তিনি আবি মা'শারা (রহ.) থেকে তিনি বিখ্যাত মশহুর তাবেয়ী হযরত ইমাম ইবরাহীম নাখঈ (রহ.) থেকে তিনি বলেন, নামাযে নিজ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে

৪৪৮. আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৬/২৩০পৃ. হাদিস,৪৪২৭১, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ-১৪০১ হি.

৪৪৯ .ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, ফতোয়ায়ে শামী, ১/৩৫১ পৃ. । ইমাম আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/২০২ পৃ, হাদিস নং- ৭৫৬, দারুল ফিকর, বয়রুত । ইমাম আহমদ, আল্-মুসনাদ, ১/১১০ পৃ, হাদিস নং- ইমাম দারেকুতনী, আস্-সুনান, ১/২৮৬ পৃ, দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, লেবানন । মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ২/৮৭ পৃ, হাদিস নং- ২৫২ । ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/৩১ পৃ, হাদিস নং-২১৬৮, মাকতাবায়ে দারুল বায, মক্কাতুল মুকাররামা । আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/৩৯০ পৃ. । আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৪/৩৮৯ পৃ, হাদিস নং- ৭৪০, ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ২/৪৬৪ পৃ, হাদিস নং- ৭৪০ ।

নাভীর নিচে বাঁধবে।"[৪৫০] এ হাদিসটি সহিহ। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ বিষয়ে এখানে মাত্র সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছি বিস্তারিত আমার আলাদা পুস্তক দেখতে পারেন।[৪৫১]

৯৭. তাক্বলীদ কি শুধু আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য ?

জাকির নায়েক ইমামদের তাক্বলীদকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলেন "**তাক্বলীদ শুধু আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য**" অর্থাৎ কোন ইমামদের জন্য নয়।"[৪৫২]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! এ মুহূর্তে আমি ডা. জাকির নায়েকের দেয়া তাক্বলীদের সংজ্ঞাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। তা হলো এই-"**আপনি যদি আপনার ইমামমের কোন মতামত কেউ ভুল প্রমাণ করা সত্ত্বেও আপনি তা অন্ধভাবে অনুসরণ করেন তাহলে সেটাই তাক্বলীদ**।"(ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়ম নং ৫/৯২পৃ.)

তাহলে জাকির নায়েকের বক্তব্য অনুযায়ী তাক্বলীদ যদি শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হয় তাহলে তো তার প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী আল্লাহর ও তার রাসূল কি ভুল ফাতওয়া দিয়েছেন? নাউযুবিল্লাহ!

তাহলে আপনারাই বলুন যে, ডা. জাকির নায়েক মাযহাব এবং মাযহাবের ইমামদের ভুল ধরতে গিয়ে কাদের ভুল ধরেছেন?

৯৮. চার মাযহাবকে বিকৃত খৃষ্টান ধর্মের সাথে তুলনা দেয়া ঃ

ডা. জাকির নায়েক মাযহাবকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে গিয়ে বলেন-"**ইমাম আবু হানিফা তিনি নতুন করে হানাফী মাযহাব নামে কোন কিছু চালু করেন নি।** ইমাম মালেক (রহ.) মালিকী মাযহাব নামে নতুন করে কোন কিছু চালু করেন নি। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) শাফেয়ী মাযহাব নামে নতুন করে কোন কিছু চালু করেন নি। তেমনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হাম্বলি মাযহাব নামে নতুন করে কোন কিছু চালু করেন নি।.....খ্রিস্টানদের মধ্যেই এরকম একটি ভুল ধারণা চালু আছে। যিশু খ্রিষ্ট খ্রিষ্টান

৪৫০.ইমাম আবি শায়বাহ, আল্-মুসান্নাফ, ১/৩৪৩ পৃ, হাদিস নং- ৩৯৩৯, মাকতাবাতুর-রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব । ইমাম নীমাভী, আছারুস্-সুনান, ১৪৮ পৃ, । মুসলিম বাহলুভি, আদিল্লাতে হানাফিয়্যাহ, ১৫৮ পৃ, হাদিস নং- ৩৬৮, দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে জামেউত তিরমিযি, ২/৮৫ পৃ, হাদিস ঃ ২৫২ ।

৪৫১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে "সহিহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান" গ্রন্থটি দেখুন।

৪৫২. ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/১০০পৃ.

ধর্ম প্রচার করতে আসেননি; তিনি এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে।"(ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ৫/৮৮-৮৯পৃ.)

ডা. সাহেব খুব সহজেই হক্কানী চার মাযহাবের অনুসারীদের সাথে বিকৃত ধর্মের অনুসারী খৃষ্টানদের অনুকরণ বলে ঠাট্টা করেছেন। ইসলামের সাথে তার এ বক্তব্যের কোন মিল নেই। মাযহাব বিষয়ের আলোচনায় ইতিপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে তাই এ আলোচনা করে এখানে কিতাব দীর্ঘায়িত করতে চাইনা।

৯৯. কোরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃতি নারী-পুরুষ সমানাধিকার এবং ভুয়া রেফারেন্স ঃ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন-

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

-"পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ববান; এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের মাল সম্পদ থেকে যাবতীয় ব্যয় করে।"[৪৫৩]

এ আয়াতে নারীদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্বমূলক বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। আর তার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে : প্রথম কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিগতভাবে নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে পরিপূর্ণভাবে কতৃর্ত্বের উপযোগী শক্তি-সামর্থ্য, পরিচালনবৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা প্রদান করেছেন। পুরুষদের এ প্রাধান্যের কারণে নবুয়ত পুরুষদের মধে সীমাবদ্ধ হয়েছে। অনুরূপভাবে শরিয়তের নির্দেশ অনুসারে খলিফা তথা ইসলামী খিলাফতের রাষ্ট্রপ্রধান একমাত্র পুরুষই হতে পারে। এরূপভাবে বিচারপতি প্রভৃতি পদের জন্যও শুধু পুরুষই যোগ্য। দ্বিতীয় কারণ হলো- পুরুষেরা নারীদের তথা সংসারের যাবতীয় খরচাদি আনজাম দান করে-যা ইসলামী শরিয়ত তাদের প্রতি অর্পণ করেছেন। যেমন, মহিলাদের মোহরের খরচ, খাওয়া পরা, আবাসন এবং ব্যক্তিগত ও সাংসারিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ পুরুষরা বহন করে থাকে। তাই নারীদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার কর্তৃত্ব পুরুষদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। আর পুরুষদের অভিভাবকত্বে থাকা নারীর জন্যও মঙ্গলজনক। তা তাদের সম্ভ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কল্যাণকর। তেমনিভাবে এটা পারিবারিক সুষ্ঠু কাঠামো বিনির্মান ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। অবশ্য এতে নারীকে অবমূল্যায়ন

৪৫৩. সুরা নিসা, আয়াত নং. ৩৪

করার চিন্তার অবকাশ নেই। কেনন, ইসলাম মায়ের পদতলে জান্নাত এবং পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশী বলে ঘোষণা করে মাতৃকুলকে মহিমান্বিত করেছে। পক্ষান্তরে তথাকথিত পাশ্চাত্যের সমান অধিকার নারী ও পুরুষের জন্য কল্যাণকর নয়। সেই সমান অধিকার মানতে গেলে পুরুষের অনেক শক্তি ও সামর্থকে খর্ব করে ফেলা হয়। এবং নারীকে অনেক কিছু হারাতে হয়- যা তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে। দুঃখজনক যে, বিধর্মীরা তাদের সেই বিপর্যয়কর পরিণতি মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে মুসলিমদের দেশসমূহে ইসলাম বিরোধী সমানাধিকারের থিউরি পুশইন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

দুঃখের বিষয় , ডা.জাকির নায়েক তাদের দোসর হয়ে তথাকথিত সমানাধিকারের পক্ষে ওকালতিতে নেমেছেন। তিনি বিভিন্ন লেকচারে এর সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে কুরআন ও হাদিসের বর্ণনাকে পর্যন্ত বিকৃত ও পরিবর্তন করে ফেলেছেন। এ মর্মে ডা. জাকির নায়েক বর্ণিত সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াত উদ্ধৃত করতঃ এর ব্যাখ্যাকে বিকৃত করে বলেন-"লোকেরা বলেন, قَوَّامُ (কাওয়াম) অর্থ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, কিন্তু বাস্তবে قَوَّامُ শব্দটি قَامَةَ (ইকামাত) শব্দমূল থেকে এসেছে। ইক্বামাত অর্থ যেমন আপনি নামাযের পূর্বে ইকামাত দেন অর্থাৎ আপনি দাঁড়ান। সুতরাং ইক্বামাত অর্থ দাঁড়ানো। অতএব, ক্বাওয়াম শব্দের অর্থ দায়িত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নয়। এমনকি আপনারা যদি ইবনে কাসিরের তাফসীর পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন। তিনি বলেন, দায়িত্বের দিক দিয়ে এক স্তর ওপরে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে নয়।.....এ কারণে যে, স্বামী স্ত্রী অধিকার সমান। ইসলামের এ ধরনের অধিকারকে আধুনিক বলবেন নাকি সেকেলে?"[৪৫৪]

ডা.জাকির নায়েক এখানে সমানাধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নারীর তুলনায় পুরুষের ইসলাম পদত্ত বিশেষ অধিকারকে অস্বীকার করেছেন। এটা সরাসরি কোরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার শামিল। অথচ তিনি তা করেছেন ইসলামের নামে। যা দ্বারা সে সরাসরি কুফুরী করায় সে নিঃসন্দেহে কাফের সাব্যস্ত হয়েছেন। এভাবে ইসলামকে বিকৃত করার মারাত্মক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। তার ভিত্তি কেমন ঠুনকো যে, পবিত্র কোরআনের যে আয়াতের প্রেক্ষিত টেনে ডা.জাকির নায়েক এ উক্তি করেছেন, উক্ত সুরা নিসার ৩৪ আয়াতের অর্থ তিনি নিজেই করেছেন এভাবে যে, "পুরুষরা নারীদের রক্ষক ও ব্যবস্থাপক। কেননা, আল্লাহ তাদের একজনকে অধিক মর্যাদা দান করেছেন অপরজন থেকে....।"[৪৫৫] এখানে "আল্লাহ তাদের একজনকে

৪৫৪. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ১/৩৪৩পৃ.
৪৫৫. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ১/৩৪৩পৃ.

অধিক মর্যাদা দান করেছেন অপরজন থেকে"-এটা কি নারীর উপরও পুরুষের বিশেষ মর্যাদার কথা বুঝাচ্ছে না? সুতরাং আবার সে মর্যাদাকে অস্বীকার করে "পুরুষ শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে ওপরে নয়" বলা একদিকে স্ববিরোধিতা এবং অপরদিকে কোরআনের বর্ণনার স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ বৈকি!

উক্ত আয়াত ছাড়াও নারীর ওপর পুরুষের বিশেষ অধিকার ও প্রাধান্যের কথা পবিত্র কুরআনের আরও বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

-"পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"[৪৫৬] এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাফসীরবিদ সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষকে স্ত্রী লোকের তুলনায় বিশেষ উচ্চ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।"[৪৫৭] এ আয়াতে নারীর ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

১০০. ভুয়া ব্যাকরণবিদ সাজতে গিয়ে ডা.জাকির নায়েকের অবস্থা ঃ

পবিত্র কুরআনের বর্ণিত আয়াতের قَوَّامُ শব্দটি إِقَامَة শব্দমূল থেকে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন। এটা তার আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। এ দুই শব্দের بَاب (শব্দস্তর) সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অর্থও ভিন্ন। قَوَّامُ শব্দটি গুণবাচক কর্তৃবিশেষ্য, এর অর্থ-কর্তৃত্ববান, ক্ষমতাবান। এ শব্দটি নির্গত হয়েছে قام ক্রিয়া থেকে, যার ক্রিয়ামূল হচ্ছে قِيَام অর্থ-দাঁড়ানো। অপরদিকে إِقَامَة শব্দটি أَقَامَ ক্রিয়াশব্দের ক্রিয়ামূল। অর্থ-দাঁড় করানো, কায়িম করা, প্রতিষ্ঠা করা। যেমন, নামায কায়িম করাকে ইক্বামাতে সালাত বলা হয়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে-ইকামাত শব্দটি এক্ষেত্রে لَازِم (লাযিম) নয়, বরং مُتَعَدِّي (মুতাআদ্দী); আর এর অর্থ-দাঁড়ানো নয়, বরং দাঁড় করানো। তাই কাওয়াম শব্দটিকে ইকামাত শব্দের সাথে গুলিয়ে দেয়া গর্হিত কাজ-যা ডা. জাকির নায়েক করেছেন।

৪৫৬. সুরা বাক্বারা, আয়াত নং. ২২৮

৪৫৭. কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, ৩/১১২পৃ. দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ, কাহেরা, মিশর, তৃতীয় প্রকাশ. ১৩৮৪ মা'আরিফুল কোরআন, ১২৪ পৃ. সৌদি সংস্করন।

ভুয়া রেফারেন্স দিতে গিয়ে ডা.জাকির নায়েকের অবস্থা ঃ

এক পর্যায়ে ডা.জাকির নায়েক নিজে কুফুরী করে অন্যের ঘাড়ে তার কুফুরী চাপানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন ইবনে কাসিরের নামে ভুয়া তথ্য দিয়ে। সে লিখে এভাবে "এমনকি আপনারা যদি ইবনে কাসিরের তাফসীর পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইবনে কাসির এ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ আয়াতের ব্যাখ্যায় আসলে কি বলেছেন দেখি,-

أَيِ الرَّجُلُ قَيِّمٌ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَيْ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعْوَجَّتْ

-"অর্থ হচ্ছে-পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ববান অর্থাৎ সে তার সরদার ও অভিভাবক, তার প্রতি হুকুমদাতা এবং তার বক্র চালচলনের ক্ষেত্রে শাসনকারী।"[৪৫৮] আল্লামা ইবনে কাসির (রহঃ) সুরা বাক্বারার وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

أَيْ فِي الْفَضِيلَةِ فِي الْخُلُقِ والخلق وَالْمَنْزِلَةِ وَطَاعَةِ الْأَمْرِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْقِيَامِ بِالْمَصَالِحِ وَالْفَضْلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

-"নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে মর্যাদায়, শরীর গঠনে, পজেশনে, শরয়ী হুকুম পালনে খরচাদি নির্বাহে, যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় এবং ইহকালীন ও পরকালীন বিভিন্ন বিষয়ে।"[৪৫৯] ডা.জাকির নায়েক এখানে সূক্ষ্ম কারচুপি এবং মিথ্যা ও ভুয়া রেফারেন্সের গোঁজা মিলের মাধ্যমে বিজাতিদের সমানাধিকার থিউরি মুসলমানদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

১০১. তারাবিহ নামায কি যত খুশি পড়া যায়?

এক স্থানে ডা. জাকির নায়েক বলেন-**"এভাবে যতখুশি তত পড়া যাবে।"** (ডা. জাকির নায়েক, ৫/২৪৭পৃ.) অন্যস্থানে তিনি বলেন,-**"সুতরাং যত বেশী পারা যায় ততই উত্তম।"** (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার, ৫/২৫৩পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ চার মাযহাবের ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ইহা অবশ্যই পড়তে হবে আর এটি সাহাবীদের

৪৫৮. ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসির, ২/২৫৬পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৪১৯হি.

৪৫৯. ইবনে কাসির, তাফসীরে ইবনে কাসির, ১/৪৫৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৪১৯হি.

যুগ থেকে যুগ যুগ ধরে এর উপর আমল অব্যাহত রয়েছে। ইমাম আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বর্ণনা করেন-

والذى استقر عليه الأمر واشتهر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو العشرون

-"২০ রাকআত তারাবীই সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও পরবর্তী আলেমগণ থেকে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে এবং এটাই এ পর্যন্ত বহাল রয়েছে।" (মাসাবাতা বিসসুন্নাহ) ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেন-

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ " وقَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً-

-"হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) হতে এবং রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের থেকে ২০ রাক'আতের আমল বর্ণিত আছে। আর এটিই সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মোবারক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন আমি মক্কা শরীফে গিয়ে লোকদেরকে ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তে দেখলাম।"[৪৬০] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ১২শ বছর পূর্বে থেকে আজ পর্যন্ত পবিত্র হেরেম শরীফে সমস্ত মুসলিম ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ে এসেছেন। আর জাকির নায়েকের অবস্থা দেখুন।[৪৬১]

১০২. তারাবিহ নামাযে খতমে কুরআন প্রসঙ্গে

ডা. জাকির নায়েক বলেন, "এমন কোনো সহিহ হাদিস নেই যেখানে বলা হয়েছে যে, রমযান মাসের তারাবীহ নামাজে কুরআন খতম দিতে হবে।"[৪৬২]

পর্যালোচনা ঃ অথচ তারাবিহ নামাযে খতমে কোরআন সাহাবিদের সুন্নাত। সাহাবী হযরত আলী (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) খতমে কুরআনের সর্বপ্রথম ব্যবস্থা করেন। (মুয়াত্তায়ে মালেক) যদিও বা নবিজি এ রীতি চালু করেন নি তাই বলে এটি নাযায়েজ হয়ে যাবে? এটি তাহলে আরবসহ বিভিন্ন স্থানে আহলে হাদিসরা করছেন

৪৬০ .তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/১৬০পৃ. হাদিস নং ৮০৬

৪৬১ . এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" দ্বিতীয় খণ্ড এবং আমার সম্মানিত স্নেহের বড় ভাই মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদীর লিখিত 'সুন্নি নামায' গ্রন্থটি দেখুন; আমি আশাবাদী সঠিক বিষয়টি আপনাদের বুঝে আসবে।

৪৬২ . লেকচার সমগ্র, ৫/২৫১পৃ.

কেন? তাই বলবো আপনি সালাফিদের আগে ঠিক করুন; তারপর অন্যদেরকে বুঝাতে আসুন।

১০৩. জান্নাতে 'হুর' পুরুষও হতে পারে বলে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

সাবা নাম্নী এক ছাত্রী প্রশ্ন করেন-পুরুষরা জান্নাতে গেলে সুন্দরী কুমারীদেরকে হুর হিসেবে পাবে। তাহলে মেয়েরা জান্নাতে গেলে কী পাবে? এমন প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির নায়েক বলেন-"এমন প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির বলেন-প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ সঙ্গী বা সাথী। পুরুষরা পাবে বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী নারী। আর নারীরা পাবে বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট স্মার্ট সুপুরুষ। (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৩৫৯পৃ.) নাউযুবিল্লাহ!

পর্যালোচনা ঃ কি চরম বিকৃতি। 'হুর' শব্দটিইতো স্ত্রীলিঙ্গ। কারণ হুর শব্দটি حوراء 'হাওরা' শব্দের বহুবচন। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) হুর-এর অর্থ সম্পর্কে বলেন-

النِّسَاء الْبِيْض الْأَبْدَان -"শুভ্র শরীর বিশিষ্ট রমণী।"[৪৬৩] কুরআন হাদিসে এর সাথে عين য়ীন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এটিও স্ত্রীলিঙ্গ এবং এর অর্থ সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট রমণী। সুতরাং "হুরও য়ীন' শব্দদ্বয়ের ব্যবহারই হল নারী বুঝানোর জন্য। হুর শব্দটি আপনি সূরা দুখান, তূর, আর্-রাহমান, ওয়াকিয়া, মিশকাত শরীফের ৫৬টি স্থানে এবং বুখারী-মুসলিমসহ কুরআন ও হাদিসের যত স্থানে 'হুর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সবই নারীকে বুঝানো হয়েছে। 'হুর' স্ত্রী বাচক বিধায় কোন জান্নাতী রমণী অন্য কোন পুরুষকে পুরুস্কার হিসেবে পাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

এ বিষয়ে ডা. সাহেব গোমরাহী হওয়ার কারণ ঃ

ডা. জাকির এ বিষয়ে গোমরাহী হওয়ার প্রকৃত কারণ হচ্ছে তিনি আরবী অভিধান সম্পর্কে জাহেল হওয়া। যার সম্পর্কে আমি তার পরিচয় পর্বে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। তিনি তার সমর্থনে ইংরেজী সালাফী জাহেল লোকদের অভিধানবিদের সাহায্য নিয়েছেন; তারা হলেন মুহাম্মদ আসাদ এবং আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী। তাই ডা. জাকির নায়েক মুহাম্মদ আসাদের অর্থ অনুযায়ী spouse বিপরীত লিঙ্গের সাথে ও আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী Companion বা সঙ্গী হিসেবে করার কারণে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। সুতরাং যে মানুষের ধর্মীয় পরিভাষা ইংরেজী অভিধান ও

৪৬৩ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৯/৩৫৮০পৃ. হাদিস ঃ ৫৬১৯, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪২২হি.

অনুবাদের সাহায্য নিয়ে চলেন এবং কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করে থাকেন শরিয়তের মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তার উপর কিভাবে নির্ভর করা যেতে পারে?

তাহলে জান্নাতে রমণীরা কী পাবে?

মূলতঃ 'হুর' হল বেহেশতী পুরুষের পুরুস্কার। জান্নাতী রমণীরাও বিভিন্ন পুরুস্কার পাবেন। তিনিও একজন জান্নাতী পুরুষ সাথী পাবেন বলে এক বর্ণনায় রয়েছে।

হাদিসে পাকে নবিজি এ বিষয়ে কি বলেন-

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি জাকির নায়েক তাফসীরে ইবনে কাসিরের দলিল দিয়েছেন, তাই সে তাফসীর থেকে একটি দলিল এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। আল্লামা ইবনে কাসির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার তাফসীরে একটি হাদিস সনদ সহ সংকলন করেছেন এভাবে-

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عن قول الله تعالى: حُورٌ عِينٌ قَالَ: «حُورٌ بِيضٌ عِينٌ ضِخَامُ الْعُيُونِ شُفْرُ الْحَوْرَاءِ بِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ النَّسْرِ» قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قوله تعالى: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ قَالَ: «صَفَاؤُهُنَّ صَفَاءُ الدُّرِّ الَّذِي فِي الْأَصْدَافِ الَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ الْأَيْدِي» قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قوله: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ قَالَ «خَيِّرَاتُ الْأَخْلَاقِ حِسَانُ الْوُجُوهِ» قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عن قوله كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ قَالَ: «رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الْجِلْدِ الَّذِي رَأَيْتَ فِي دَاخِلِ الْبَيْضَةِ مِمَّا يَلِي الْقِشْرَ وَهُوَ الْغِرْقِئُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عُرُبًا أَتْرَابًا قَالَ «هُنَّ اللَّوَاتِي قُبِضْنَ فِي الدار الدنيا عجائز رمصا شمصا، خَلَقَهُنَّ اللَّهُ بَعْدَ الْكِبَرِ فَجَعَلَهُنَّ عَذَارَى عُرُبًا مُتَعَشِّقَاتٍ مُحَبِّبَاتٍ أَتْرَابًا عَلَى مِيلَادٍ وَاحِدٍ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمِ الْحُورُ الْعِينُ؟ قَالَ: «بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَفَضْلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَ ذَاكَ؟ قَالَ:«بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. أَلْبَسَ اللَّهُ وُجُوهَهُنَّ النُّورَ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرَ. بِيضُ الْأَلْوَانِ خُضْرُ الثِّيَابِ صُفْرُ الْحُلِيِّ مَجَامِرُهُنَّ الدُّرُّ وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا، وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ أَبَدًا أَلَا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا، طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَتَزَوَّجُ زَوْجَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ ثُمَّ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا؟ قَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهَا تُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ أَحْسَنَهُمْ

خُلُقًا، فَتَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَ خُلُقًا مَعِي فَزَوِّجْنِيهِ، يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-

"ইমাম তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সনদসহ হযরত হাসান বসরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাদিস বর্ণনা করেন যে হযরত উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ পাকের ইরশাদ حُورٌ عِينٌ.সম্পর্কে আমাকে বলুন। রাসূল (ﷺ) বলেন- حُورٌ.গৌরবর্ণ এবং عِينٌ.ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা তাদের চোখের কোটা শুভ্র পাখার ন্যায়। আমি বললাম كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ .সম্পর্কে বলুন। রাসূল (ﷺ) বলেন, তাদের লাবন্যতা ওই মোতির মত যা ঝিনুকের ভিতর থাকে, যাকে কোন হাত স্পর্শ করেনি। আমি আরজ করলাম যে. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ .সম্পর্কে বলুন, তিনি বললেন তাদের কোমলতা এরূপ হবে যেমন ডিমের ভিতরের ঝিল্লি নাজুক ওকোমল হয় যা আবরণের পরে এবং তার সাথে সংযুক্ত থাকে। আমি বললাম عُرُبًا أَتْرَابًا সম্পর্কে বলুন, রাসূল (ﷺ) বললেন, এরা ঐসব নারী যাদের মৃত্যু দুনিয়াতে বার্ধক্যে আসে, ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও চুল এলোমেলো থাকে। আল্লাহ তাদেরকে বার্ধক্যের পর আবারো সৃষ্টি করবেন। ফলে তাদেরকে কুমারী ও প্রিয় বানিয়ে দিবেন এবং সমবয়স্কা করে দিবেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! বলুন তো দুনিয়ার নারীরা উত্তম না হুর য়ীন? উত্তরে বললেন, দুনিয়ার নারীরা হুরে য়ীন থেকে উত্তম। প্রশ্ন করলাম, তার কারণ কী? উত্তর দিলেন যে, তারা নামায রোযা ও ইবাদাত করেন। আল্লাহ তাদের চেহারায় নূরের আবরণ সেঁটে দিবেন এবং তাদের শরীরকে রেশম দ্বারা আবৃত করবেন গৌরবর্ণ সবুজ কাপড় হলদে অলংকার, তাদের পাত্র হবে মুক্তার এবং চিরুনী হবে স্বর্ণের। আমি বললাম আমাদের মধ্যে কোন স্ত্রী (ক্রমাগত) দুই, তিন, চার বিবাহ হয়েছে। তার মৃত্যুর পর স্বামী কে হবে? উত্তর দিলেন হে উম্মে সালমা! তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। সুতরাং যে তাদের মাঝে বেশি চরিত্রবান হবে সে তাকে পছন্দ করে বলবে, হে আমার প্রতিপালক তার আচার-ব্যবহার আমার সাথে অত্যন্ত মধুর ছিল। এজন্য আমাকে টেনে বন্ধনে আবদ্ধ করে দিন। হে উম্মে সালমা! সচ্চরিত্র ইহ-পরকালের কল্যাণ টেনে আনে।"[৪৬৪]

৪৬৪ .তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২৩/৩৬৭পৃ. হাদিস ঃ ৮৭০, মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রু, মিশর, তাফসীরে ইবনে কাসির, ৮/২১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, সুয়ূতী, তাফসীরে আদ্-দুররুল মানসূর, ৭/৭২০পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! দেখুন রাসূল (ﷺ) 'হুর' বলতে জান্নাতে সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীদের বুঝায় বললেন; তাহলে পাঠকবৃন্দ আপনারাই বলুন আমরা কী আল্লাহর রাসূলের ব্যাখ্যা গ্রহণ করবো না ডাক্তারের?

১০৫. মক্কা-মদিনাকে ক্যান্টনমেন্টের সাথে তুলনা ঃ

ডা. জাকির নায়েক নায়েক এক ব্যক্তির প্রশ্ন মক্কা-মদিনায় অমুসলিম যেতে পারে না কেন এ প্রশ্নের জবাবে বলেন-"**আমি ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বহু স্থানে যাওয়ার অনুমতি নেই**। যেমন : ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদি।" তারপর তিনি বলেন- "ইসলামের ক্যান্টনমেন্ট বা নিষিদ্ধ এলাকা হলো মাত্র দুটো। এক. মক্কা শরীফ এবং দুই. মদিনা শরীফ।"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/২০১পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ এটি দুই হেরেমের শানে বেয়াদবীমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন। জাকির নায়েক কী এমন কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন যে কোনো ইমাম, ওলামাগণ এই পবিত্র দুই হেরমকে ক্যান্টনমেন্টের সাথে তুলনা করেছেন?

১০৬. দাঁড়ির পরিমান বিষয়ে হাদিসের মনগড়া অনুবাদ ও বিকৃতি ঃ

ডা. জাকির নায়েক বলেন-" **দাঁড়ি বড় করলেও একটা সীমা আছে। আর তা হল মুঠোর নিচেরটুকু কেটে ফেলতে হবে।**"(ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৬৩০পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ দাড়ি হল রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত। আর আমারা তা রাখতে হলে রাসূল (ﷺ) কে অনুসরণ করই রাখতে হবে। এক মুঠোর বাকি দাড়ি নবিজি কেটে ফেলেছে এ মর্মে কোন সহিহ হাদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে তিরমিযির বর্ণিত যে হাদিসটি আছে সেটিও জাল।[৪৬৫] ডা. জাকির নায়েক রাসূল (ﷺ)-এর দুটি হাদিসকে বিকৃত করে অনুবাদ করেন। প্রথম হাদিসটির বিকৃত অনুবাদ করেন এভাবে-"ইবনে উমর (ﷺ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন যে, পৌত্তলিকরা যা করে তার বিপরীত কর, **মুখে দাড়ি রাখ আর গোঁফকে ছোট করে রাখ।**"[৪৬৬] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সহিহ বুখারীর এ হাদিসটির মতনসহ বাংলা অনুবাদ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি-

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب

৪৬৫ . সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন' এর ১ম খণ্ডের ৫৪২-৫৪৫পৃষ্ঠা দেখুন।

৪৬৬ . **ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ১/৬৩০পৃ.**

-"মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, **দাড়িগুলো বৃদ্ধি কর** এবং গোঁফগুলো কেটে ফেল।"[৪৬৭] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! জাকির নায়েক তার নিজের মতকে বলবান করার জন্য দেখুন হাদিসের অনুবাদে কী কারচুপি করেছেন। দাড়ি বৃদ্ধি করার কথা নবিজী বলেছেন অথচ তিনি অনুবাদে এ কথাটিই আনেননি। অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণি সেই হাদিসটিরও অনুবাদ কারচুপি করেছেন।[৪৬৮]

১০৭. শার্ট-প্যান্ট ও টাইকে নামাযের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পোশাক বলে ভ্রান্ত মতবাদ ঃ

পর্যালোচনা ঃ ডা. জাকির নায়েক কে একজন প্রশ্ন করলেন যে, সালাত আদায়ের জন্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পোশাক কোনটি? কোর্তা, পায়জামা, প্যান্ট, শার্ট নাকি অন্যকিছু? তিনি এর জবাবে বলেন-"**কথা হলো, কোর্তা পায়জামা পরবেন নাকি প্যান্ট, শার্ট, টাই-যদি আপনি সালাতে পোশাকের নূন্যতম অংশটা পূরণ করেন, আপনি যেটাকে আরাম বোধ করবেন সেটা পরবেন।.....পোশাকটা যদি হারাম না হয়, সব শর্ত পূরণ করে, তাহলে আপনি কোর্তা, প্যান্ট, শার্ট যেটা পরে আরাম পান সেটা পরতে পারেন।**" (ডা. জাকির নায়েকের লেকচার সমগ্র, ২/৫৪পৃ.)

পর্যালোচনা ঃ ডা. জাকির নায়েক নিজেই উল্টা পাল্টা পোষাক পড়ছেন এবং মানুষদেরকেও তার মত পথভ্রষ্ট করতে চাচ্ছেন। হযরত রুকানা (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) পোষাকের বর্ণনায় বলছেন-

إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ.

-"মুশরিকদের সাথে আমাদের পার্থক্য হলো-আমরা পাগড়ীর উপর টুপি পরি।"[৪৬৯] **সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!** তাহলে আপনারাই দেখুন জাকির নায়েকের পোষাক নবিজীর এ হাদিস মুতাবেক হচ্ছে কী না। আমি আশ্চর্যিত যে জাকির নায়েক সহিহ হাদিসের অনুসারী দাবী করে টাই, কোটকে কিভাবে নামাযের পোষাকের মাঝে অর্ন্তভুক্ত করে দিলেন? পুরুষের জন্য লাল পোষাক পরিধান করা নিষেধ কিন্তু তিনি লাল শার্ট এবং টাই পড়ে অনুষ্ঠানে আসেন[৪৭০]; অথচ রাসূল (ﷺ) তা কঠিন ভাবে নিষেধ করেছেন।[৪৭১]

৪৬৭ . বুখারী, আস্-সহিহ, ৭/১৬০পৃ. হাদিস নং.৫৮৯২, সহিহ মুসলিম, ১/২২২পৃ. হাদিস নং. ২৫৯

৪৬৮ .সহিহ মুসলিম, ১/২২২পৃ. হাদিস নং. ২৬০

৪৬৯ .সুনানে তিরমিযি, ৩/৩০০পৃ. হাদিস নং. ১৭৮৪

৪৭০ .ডা. জাকির নায়েকের চিত্রটি দেখতে আপনারা **"ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার"** পেইজে লাইক দিয়ে দেখতে পারেন।

৪৭১ .সহিহ বুখারী, হাদিস নং. ৫৪২০

১০৮. বাহাসে না পেরে জাকির নায়েকের পলায়ন ঃ

ডা. জাকির নায়েক শ্রীলঙ্কা সফরে গেলে বিজ্ঞ এক আলেম তার মজলিসে একত্রিত হন। সেই আলেম বলেন আপনি আপনার এক লেকচারে বলেছেন কুরআনে ২৫ স্থানে ওসিলাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাহলে আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনি একটি আয়াত পেশ করুন যেখানে ওসিলাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন? তিনি কোনো উত্তর দিতে না পেরে শাফায়াত সম্পর্কিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। বরং প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে তিনি সেই আলেমের ই-মেইল ও ফোন নাম্বার নেন এ মর্মে তিনি ভারতে গিয়ে তাকে জানাবেন বলে অঙ্গিকার করেন। সেই আলেম তাকে বলে দেন যে কোন মুহূর্তে তার সাথে এ বিষয়ে বহসে বসতে রাজী। প্রায় দেড় বছরের অধিক হয়ে গেল এ পর্যন্ত তিনি বহসে বসবেন তো দূরের কথা বরং ই-মেইলে কোন উত্তরও দেননি। আমার প্রশ্ন জাকির নায়েকের সকল ইলম কি ভারতে রেখে আসছেন? তাই হকপন্থী সকল বিজ্ঞ আলেমরাই জাকির নায়েকের ইলমের দৌড় কতটুকু এ বিষয়টি জানেন। এ ঘটনাটি ইউটিউবে পেতে এবং তার খণ্ডসহ জানতে ডাউনলোড করুন।[৪৭২] এ ছাড়া অন্য ঠিকানায়ও এ ভিডিওটি পেতে পারেন।[৪৭৩]

১০৯. ডাক্তার জাকির নায়েকের উপর কি কুফর ফাতওয়া দেয়া যায়?

ঈমানের অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি বিষয় নিয়েও কেউ বিরূপ মন্তব্য করলে কিংবা অস্বীকার বা উপহাস অথবা অবমাননা করলে, ইসলামের বিধান মতে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং সে ঈমানহারা কাফির হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়, ইসলামের এতগুলো বিষয় পথভ্রষ্টতা ও আপত্তিকর উক্তির কারণে ডা. জাকির নায়েকের উপর কি কুফর ফাতওয়া দেয়া যায় বা তাকে কাফির বলা যায়? ভারতের লাক্ষ্ণৌর কাজী মুফতী আবুল ইরফান কাদভী সাহেব সুন্নি অনেক বেরলভী উলামা কনফারেন্সে ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত বিষয় সমূহ উত্থাপনপূর্বক তাকে কাফের বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক ইয়াযিদের ব্যাপারে "রাহিমাহুল্লাহ" (আল্লাহ তার উপর রহমত দান করুক) বলা এবং তাকে জান্নাতী বলে মন্তব্য করা, এছাড়াও ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদের প্রতি ডা. জাকির নায়েকের সমর্থন প্রভৃতির কারণে তাকে কাফির ফাতওয়া দেন। তখন এ বিষয়টি ভারতের ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে কভারেজ পায়। ভারতের পত্রিকায় এর নিউজ দেখতে লগইন করুন-

৪৭২ .আপনি ইউটিউবে গিয়ে এ নামে সার্চ করে খুজে নিতে পারেন তার এ বক্তব্যটি " জাকির নায়েক বাহাসে হারল না জিতল, আসলে সুন্নাত । Dr. Jakir nayek and Ahole sunnat_low"

৪৭৩ .আপনি ইউটিউবে গিয়ে এ নামে সার্চ করে খুজে নিতে পারেন তার এ বক্তব্যটি "Zakir Naik ki Bolti band.mp4_low

http://jafrianews.com/2009/08/23/zakir-naik-declared-kafir-by-fhle-sunnat%E2%80%8F-fatwa-in-india/

অথবা ভারতের চ্যানেল নিউজ শুনতে সার্চ দিন-

http://www.dailymotion.com/video/x2svjvz

আরো তথ্য দেখুন ভারতের নিম্নোক্ত নিউজ লিঙ্কে-

http://www.youtube.com/watch?v=9s1aebk_NTU

অপরদিকে মুম্বাইয়ের এক কনফারেন্সে ডা. জাকির নায়েকের বিতর্কিত উক্তি "আজ কে দিন মেঁ মুহাম্মদ (ﷺ) কো ভি মাননা হামারে লিয়ে হারাম হ্যায়" (অর্থ-আজকের দিনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও মান্য করা আমাদের জন্য হারাম)-এর কারণে ভারতে মুসলমানদের মধ্যে তোলপাড় হয় এবং এ কারণে অনেকে তাকে কাফির ফাতওয়া দেন। এ নিয়ে তখন ভারতে মুসলমানগণ ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে জনসভা ও মিছিল করেন। আর এরই সূত্রে ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। তখন হাইকোর্টের পক্ষ থেকে ডা. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোওয়ানা জারী করা হয় এবং মুম্বাইতে তার কনফারেন্সের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। পরিশেষে ডা. জাকির নায়েক ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে তার অনভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতঃ সেই উক্তিটি সব্‌কতে লেসানী (মুখ ফসকে বের হওয়া ভুল) বলে প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং ভবিষ্যতে এ রকম কথা না বলার অঙ্গীকার করে মুচলেকা দিয়ে হাইকোর্টে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক জামিন লাভ করেন।

এ সম্পর্কে তথ্য জানতে নিম্নের লিঙ্কে লগইন করুন-

http://www.youtube.com/watch?v=7NIiNV1s3To

এ ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অনেক সুন্নি বেরলভী আলেম ও ইমাম হুসাইন (رضي الله عنه)-এর ভক্ত-আশেকানগণের দরবার থেকে ডা. জাকির নায়েকের কাফির ফাতওয়া আসে। ফেসবুক ও কিছু কিছু ওয়েবসাইটে এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

১১০. ডা. জাকির নায়েকের বিষয়ে বিভিন্ন স্থান হতে কাফির ফাতওয়া ঃ

১. জাকির নায়েককে বেরলবী শরিফ থেকে কাফির ফাতওয়া ঃ

ভারতের ইমামে আহলে সুন্নাহ আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (رحمه الله)-এর দরবার থেকে অনেক মুফতিয়ানে কেরামের সাক্ষরসহ তাকে কাফির ফাতওয়া দেওয়া হয়।

২. জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া ঃ

দেওবন্দীদের দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ-এর পক্ষ থেকে ডা. জাকির নায়েককে দ্বল্লা ওয়া মুদ্দিলু (সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অপরকে পথভ্রষ্টকারী) আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তার গোমরাহীর ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে ফাতওয়া হয়েছে। **(ফাতওয়া বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ, ফাতওয়া নং. ৩১৩৯২, ফাতওয়া প্রদানের তারিখ : ১০ই এপ্রিল-২০১১ইং)**

৩. পাকিস্তান হতে কাফির ফাতওয়া ঃ

১. পাকিস্তানের অনেক বিখ্যাত দেওবন্দী মাদরাসা যেমন জামায়ায়ে দারুল উলূম করাচীর **পরিচালক মা'রিফুল কোরআন প্রণেতা মুফতি শফী এর ছেলে মাওলানা তাকী উসমানী**। তিনি ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে ফাতওয়া দেন-

"মানুষ মনে করে, ডাক্তার জাকির নায়েক একজন অভিজ্ঞ ধর্মবেত্তা এবং ইসলাম সম্পর্কে তার যতেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তিনি কোন অভিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার বা আলেম-মুফতি নন। তাছাড়া তিনি আইম্মায়ে মুজতাহিদ বা চার ইমামের অনুসরণ শুধু পরিত্যাগই করেননি, বরং তিনি সকল ইমামগণের সমালোচনা করে তাদের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করেন।"[৪৭৪]

২. জামেয়া বিন্নরিয়া করাচী হতে তার লেকচার শুনা থেকে সতর্কতার লক্ষে ফাতওয়া দিয়েছেন যে তার লেকচার শুনা হারাম।[৪৭৫]

৩. পাকিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা ড. তাহেরুল আল-কাদেরীও তাকে ইয়াযিদের প্রসংশার[৪৭৬] কারণে এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ের কা.ণে তাকে কাফির ফাতওয়াদিয়েছেন।[৪৭৭]

৪. অপরদিকে প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ফারুক খাঁন রেজভীও তাকে কাফির এবং তার গোমরাহী থেকে মানুষকে ধূরে থাকার আহবান করেছেন।[৪৭৮]

৪. শরীয়া ইনস্টিটিউট আমেরিকা'র ফাতওয়া ঃ

এ বিষয়ে আমেরিকার প্রখ্যাত ইসলামী সেন্টার শরীয়া ইনস্টিটিউট আমেরিকা'র পক্ষ থেকে ডা. জাকির নায়েককে নিম্ন বর্ণিত ফাতওয়া দেয়া হয়েছে-

"ডাক্তার জাকির নায়েকের অনেক কথা বার্তাই ভুল। তার অনেক চিন্তাধারা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। তা ছাড়া তিনি ইসলামের অভিজ্ঞ স্কলার নন। তাই তার তার অনেক রেফারেন্স যথার্থ হয় না।"[৪৭৯]

৫. দারুল হাদীস দাম্মাজ ইয়েমেন-এর ফাতওয়া ঃ

ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ ইসলামী মারকায দারুল হাদীস দাম্মাজ ইয়েমেন-এর পক্ষ থেকে উক্ত মারকাযের প্রধান মুফতি শাইখ ইয়াহ্ইয়া ইবনে আলী আবু আবদুর রাহমান আল-হাজূরী

৪৭৪ .তথ্য সূত্র ঃ উক্ত ফাতওয়াটি দেখতে চাইলে ইন্টারনেটে এই ওয়েব সাইটে সার্চ করুন-" www.central-mosque.com/fiqh/ zakirnaik.htm" লিখে।

৪৭৫ .তথ্য সূত্র ঃ মাসিক আদর্শ নারী, জুন, ২০১১ইং, পৃ.৬-৭

৪৭৬ .তথ্য সূত্র ঃ ইউটিউবে সার্চ দিন এ শিরোনামে তাহলেই ইয়াযিদের প্রসংশায় তিনি কী বলেছেন তা জানতে পারবেন-" Yazeed The Criminal of Karbala & the Hero of Zakir Naik_low"

৪৭৭ .তথ্য সূত্র ঃ ইউটিউবে সার্চ দিন এ শিরোনামে-" Reply to zakir naik LA on yazid topic by Dr.Tahir ul Qadri-2 "

৪৭৮ .তথ্য সূত্র ঃ ইউটিউবে সার্চ দিন এ শিরোনামে-" Zakir Naik Ki Gustakhi_low"

৪৭৯ .তথ্য সূত্র ঃ উক্ত ফাতওয়াটি ইন্টারনেটে দেখতে সার্চ করুন শিরোনামে-" http:To avoid Dr Zakir Naik in Fiqh issues!-Central Mosque.Com

الجواب على ثلاثين سؤالا تثبت على ان ذاكرا الهندى واصحاب فكره منحرفون ضلالا-

(আল-জাওয়াবু 'আলা ছালাছীনা সুওয়ালান তুছবিতু 'আলা আন্না জাকিরীন আল-হিনদিয়্যাহ ওয়া আসহাবা ফিকরিহী মুনহারিফূনা দ্বলালান) (অর্থ : ৩০ টি প্রশ্নের জবাব-রযগুলো প্রমাণ করে যে, হিন্দুস্থানী জাকির নায়েক ও তার চিন্তাধারার অনুসারীরা গোমরাহ)" নামে দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে সুদীর্ঘ ফাতওয়া প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ডাক্তার জাকির নায়েক ভুল পথে রয়েছেন এবং তিনি হক থেকে বিচ্যুত ও গোমরাহ। উক্ত ফাতওয়া স্বয়ং তাঁর কণ্ঠে আরবী ভাষায় ইন্টারনেটে http://Shaykh Yahya Al-hajooree ReFutes Zakir Naik সাইটে রয়েছে।

৬. বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের ফাতওয়া ঃ

বাংলাদেশের বিজ্ঞ সমস্ত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমগণ ডা. জাকির নায়েক কাফির হওয়ার উপরে একমত। তাকে ইয়াযিদের প্রসংশার জন্য এবং নবিজীকে হায়াতুন্নবী (ﷺ) অস্বীকারসহ বিভিন্ন বাতিল আক্বিদার কারণে তাকে কাফির হওয়ার বিষয়ে একমত হন। শহীদে মিল্লাত আল্লামা শাইখ নুরুল ইসলাম ফারুকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও তার কাফির হওয়ার মত মাই টিভি চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমদের মত প্রকাশ করেন।[৪৮০] বাংলাদেশে উচ্চস্তরের বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে কতিপয় হচ্ছেন-

১ **ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশেমী (মা.জি.আ)**

২. **আল্লামা মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আলকাদেরী (মা.জি.আ)**
সাবেক অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

৩. **আল্লামা মুহাম্মদ ছগীর উসমানী (মা.জি.আ.)**
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

৪. **আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী (মা.জি.আ)**
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

৫. **আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রাহমান (মা.জি.আ)**
ফকিহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

৬. **আল্লামা মুফতি কাযি আব্দুল ওয়াজেদ (মা.জি.আ)**
ফকিহ্, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

৪৮০ . আল্লামা ফারুকী (রহ.)-এর সে বক্তব্যটি পেতে ইউটিউবে সার্চ করুন এ শিরোনামে-"জাকির নায়েকের খারাপ দিকটা সাধারণ মুসলমানরা ধরতে পারবে না শাইখ নুরুল ইসলাম "

৭. আল্লামা কাযী মুঈন উদ্দিন আশরাফি (মা.জি.আ)
মুহাদ্দিস, সোবহানিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।
৮. আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী (মা.জি.আ)
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
৯. আল্লামা হাফেজ কাজী আবদুল আলীম রেজভী (মা.জি.আ.)
অধ্যক্ষ, কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।
১০. পীরে ত্বরিকত ছৈয়দ আল্লামা শামসুদ্দোহা বারী (মা.জি.আ)
পীর সাহেব সাজ্জাদানশীন বারীয়া দরবাশ শরীফ, চট্টগ্রাম
১১. পীরে ত্বরিকত আলহাজ্ব মাওলানা জামালুদ্দীন মমিন (মা. জি. আ)
পীর সাহেব, কুতুবীয়া দরবার শরীফ, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।
১২. হযরতুল আল্লামা আবুল কাশেম নূরী (মা.জি.আ), চট্টগ্রাম।
১৩. মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবাইর রজভী
খতিব, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।
১৪. ড. মাওলানা লিয়াকত আলী আলকাদেরী
মুহাদ্দিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
১৫. ড. মাওলানা সারওয়ার উদ্দিন আলকাদেরী
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।
১৬. মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আযহারী
মুহাদ্দিস, কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।
১৭. মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
অধ্যক্ষ, নারিন্দা আহসানুল উলূম কামিল মাদরাসা।
১৮. মাওলানা আবু সুফিয়ান খান আল কাদেরী (মা.জি.আ)
১৯. মাওলানা মুফতি বখতিয়ার উদ্দিন
মুফাস্সির, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।
২০. হাফেজ মাওলানা জাবের আল-মানছুর মোল্লা
খতিব, ঐতিহাসিক বাদুঘর শাহী মসজিদ, বি-বাড়িয়া।
২১. মাওলানা হাফেয ক্বারী মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া,
চেয়ারম্যান, আল-ফালাহ ইসলামী সংস্থা।
২২. মাওলানা গিয়াস উদ্দিন আত্-তাহেরী, বি-বাড়িয়া।
২৩. মাওলানা ইকবাল হোসাইন আল-কাদেরী
মিডিয়া বক্তিত্ব ও বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা।

এ বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামগণ তার কাফির ও পথভ্রষ্টতার বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।

বাংলাদেশের দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম ঃ

জাকির নায়েক ভ্রান্ত বিষয়ে দেওবন্দী অনেক ওলামায়েকেরামগণও অনেক বই পুস্তক লিখে তার খণ্ডন করেছেন। দেওবন্দী মাসিক পত্রিকা **"আদর্শ নারী"** তে ২০১১ সালের জুন মাস হতে ধারাবাহিকভাবে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তার খণ্ডনে মানুষকে সতর্কতার লক্ষে লিখে যাচ্ছেন এ পত্রিকার সম্পাদক মুফতি আবুল হাসান শামসবাদী। বাংলাদেশের দেওবন্দীদের ফকিহুল মিল্লাত মুফতি আবদুর রহমান এর মাসিক পত্রিকা **"মাসিক আল-আবরার"**-এ ধারাবাহিকভাবে এ পর্যন্ত তার খণ্ডনে লিখে যাচ্ছেন মুফতি ইজহারুল ইসলাম আল-কাওসারী। এ ছাড়া **"ডা. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ"** নামে মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমীর একটি গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়।

৭. বাংলাদেশের আহলে হাদিস আলেমদের ফাতওয়া ঃ

বাংলাদেশের অনেক আহলে হাদিস আলেমরাও তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে নিষেধ বা হুশিয়ার করেছেন। আহলে হাদিস ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরও তার এক লাইভ চ্যানেল অনুষ্ঠানে জাকির নায়েকের অনেক ভুল মাস'আলার কথা বর্ণনা করেছেন এবং টাই পড়া হারাম বলে ঘোষনা দিয়েছেন।[৪৮১] সমকালিন আহলে হাদিস শায়খ রাজ্জাক বিন ইউসুফও টাইকে হারাম বলতে গিয়ে জাকির নায়েকের সমালোচনা করেছেন।[৪৮২] বাংলাদেশের আহলে হাদিসদের সুপ্রসিদ্ধ আলেম ড. শায়খ আব্দুল্লাহ ফারুকী জাকির নায়েক অনেক ফাতওয়ায় ভুল দিয়েছেন বলে তিনি তার এক বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন।[৪৮৩]

ভয়ঙ্কর ফিতনাবাজ ডা. জাকির নায়েক

এ কিতাবে ডা. জাকির নায়েকের একশতরও বেশী ভ্রান্ত মতবাদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, এর কোন কোন বিষয় এত মারাত্মক যে, কোন মুসলমান সেই বিশ্বাস পোষণ করলে বা মুখে প্রকাশ করলে সে ঈমানহারা কাফির বলে বিবেচিত হবে। তবে যেহেতু ডা. জাকির নায়েকের অধিকাংশ লেকচারের প্রচার টিভিতেই হয়ে থাকে এবং আলেম-উলামাগণ এ মিডিয়া থেকে দূরে থাকেন, তাই ডা. জাকির নায়েকের এ ধরনের ভ্রান্ত ও কুফরমূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল হন না। এ কারণে তার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে সে ধরনের ফাতওয়া পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য বিভিন্নমুখী প্রচারণার কারণে ক্রমশ তার সেই ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে উলামা-মাশায়েখগণ অবগত হতে শুরু করেছেন এবং ইদানিং তার কুফুরী মতবাদের খণ্ডনও অনেক বেরলবী ও দেওবন্দী আলেমগণ শুরু করেছেন।

---

৪৮১ .ইউটিউবে সার্চ করুন এই শিরোনামে-"জাকির নায়েক সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর"

৪৮২ . এ আহলে হাদিস পণ্ডিতের বক্তব্যটি ইউটিউবে পাবেন এ শিরোনামে Dr Zakir Naik-ke kafir bola ar akasher dike thu-thu chura ek-e by Abdur Razzk

৪৮৩ . এ আহলে হাদিস পণ্ডিতের বক্তব্যটি ইউটিউবে পাবেন এ শিরোনামে "আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী এবং ডাঃ জাকির নায়েক কি নির্ভুল-শায়খ আব্দুল্লাহ ফারুক _low

১১১. ডা. জাকির নায়েকের গোমরাহী থেকে দেশকে বাঁচাতে তার পিস টিভি ও তার লেকচারের সকল ধরনের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা সময়ের দাবী ঃ

ডা. জাকির নায়েক তার এ সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য প্রচারের জন্য 'পিস টিভি' নামে টিভি চ্যানেল চালু করে পরিকল্পিতভাবে তার মাধ্যমে তার এ সব ভ্রান্ত ধর্মমত প্রচার করে চলেছেন। তার সে 'পিস টিভি' মুসলমানদের মারাত্মকভাবে গোমরাহী করছে ও বেঈমান বানাচ্ছে। এভাবে আজ পিস টিভির গোমরাহী সম্প্রচার ডিজিটাল ফিতনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যা মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিকন্তু ডা. জাকির নায়েক পিস টিভির বাংলাদেশ সংস্করণরূপে পিস টিভি বাংলা নামে ভিন্ন চ্যানেল খুলে এ দেশে তার ভ্রান্ত মতবাদ সম্প্রচারের কার্যক্রম প্রবল বেগে চালানোর ব্যবস্থা করেছেন। যাকে এ দেশের মুসলমানদের দ্বীনি ও ঈমান হরণের ভয়ানক ফাঁদ বলা যায়। ইতিমধ্যে এ ফাঁদে আক্রান্ত হয়ে বিপথগামী হয়েছেন বলে আমাদের নিকট অসংখ্য তথ্য রয়েছে। তাই এ জাকিরী ফিতনা থেকে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বাঁচাতে বাংলাদেশ সরকারের উচিত-এ দেশে ডা. জাকির নায়েকের পিস টিভি সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা। এদেশের মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য এটা আজ সময়ের বড় দাবী। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ইংল্যান্ড ও কানাডায় ডা. জাকির নায়েকের কার্যক্রম কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ভারতে ডা. জাকির নায়েক ও তার পিস টিভিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই সেভাবে বাংলাদেশে ডা. জাকির নায়েক ও তার পিস টিভিকে নিষিদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি। সেই সাথে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজগতভাবে ঈমানী কর্তব্য হচ্ছে-ডা. জাকির নায়েকের গোমরাহীর সয়লাব থেকে নিজে বাঁচতে এবং অপরকে বাঁচতে ডা. জাকির নায়েকের লেকচার শুনা বা তার লেকচারের সিডি দেখা কিংবা তার লেকচারের বই পড়া থেকে নিজেরা দূরে থাকা এবং অপরকে দূরে রাখা। মুসলমানদের জন্য তার লেকচার শুনা বা তার বই পড়া কিছুতেই যায়েজ হবে না এবং এ ব্যাপারে অন্যকেও বুঝাতে হবে।

আর বাংলাদেশে পিস টিভির সম্প্রচার এবং ডা. জাকির নায়েকের লেকচারের সিডি, বই প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ করার জন্য যার যার অবস্থান থেকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যাতে এ দেশের মুসলমাগণ তার ফিতনা থেকে বাঁচতে পারেন।

আসুন, এ ব্যাপারে নিজে সচেতন হই এবং অপরকে সতর্ক করে ঈমানী দায়িত্ব পালন করি। আল্লাহ তা'য়ালা এ জাকিরী ফিতনা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন (আমিন)।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

প্রমাণপঞ্জী

১. আল কুরআনুল হাকীম;

হাদিস

২. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (১৯৪হি-২৫৬হি.) : আস্-সহিহ, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২২ হি. (শামিলা)।

৩. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী : আত্-তারিখুল কাবীর, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ।

৪. বায্যার : আবু বকর আহমদ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি. / ৮২৫-৯০৫ ইং) : আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতু উলুমিল কুরআন, ১৪০৯ হিজরী;

৫. বাগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি. / ১০৪৪-১১২২ ইং) : শরহে সুন্নাহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৪০৭ হি / ১৯৮৭ ইং।

৬. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : দালায়িলুন নবুয়ত, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।

৭. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আস-সুনানুল কুবরা, মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।

৮. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আল-মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার,

৯. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা (২১০-২৭৯ হি. ৮২৫-৮৯২ ইং) : আল-জামেউস সহিহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।

১০. হাকিম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি. ৯৩৩-১০১৪ ইং) : আল-মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি. ১৯৯০ ইং।

১১. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি. ৮৮৪-৯৬৫ ইং) : আস্-সিকাত, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্র, ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ ইং।

১২. ইবনে খুযায়মা : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি. / ৮৩৮-৯২৪ ইং) আস-সহিহ, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি. / ১৯৭০ ইং।

১৩. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬০ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

১৪. খাওয়ারযামী : আবদুল মু'আয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ (৫৯৩-৬৬৫ হি.) : জা'মিউল মাসানিদ লি ইমাম আবী হানিফা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

১৫. দারেকুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহাদী মাসউদ ইবনে নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হি. / ৯১৮-৯৯৫ ইং) : আস সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৬ হি. / ১৯৬৬ ইং।

১৬. দারেমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি. / ৭৯৭-৮৬৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি. ।
১৭. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আসআছ সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. / ৮১৭-৮৮৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং ।
১৮. দায়লামী : আবু সূজা শেরওয়াই ইবনে শহরদার ইবনে শেরওয়াই হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. / ১০৫৩-১১১৫ ইং) : আল ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং ।
১৯. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ / হি. ৭৮৪-৮৪৫ ইং) : আত্ব ত্বাবক্বাতুল কুবরা, বয়রুত, লেবানন, দারে ছদীর ।
২০. ইবনে আবী শায়বা : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি. / ৭৭৬-৮৪৯ ইং) : আল-মুসান্নাফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রাশাদ, প্রকাশ. ১৪০৯ হি. ।
২১. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল আওসাত, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং ।
২২. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল কাবীর, মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুল উলুম ওয়াল হিকম, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং ।
২৩. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : জা'মিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ,১৪০০ হি./১৯৮০ ইং ।
২৪. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি. / ৮৫৩-৯৩৩ ইং) শরহু মা'আনিল আসার, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ ইং ।
২৫. তায়ালসী : আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি / ৭৫১-৮১৯ ইং), আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ ।
২৬. ইবনে আবদুল বার : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : আল ইসতিয়াবু ফী মা'আরিফাতিল আসহাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল ।
২৭. ইবনে আবদুল বার : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : জামি'উল বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলি, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৩৯৮ হি. / ১৯৭৮ ইং ।
২৮. 'আবদুর রায্যাক : আবু বকর ইবনে হুম্মাম ইবনে নাফে' সুনআনী (১২৬-২১১ হি. / ৭৪৪-৮২৬ ইং) : আল-মুসান্নাফ, বয়রুত, লেবানন, আল মাকতুবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি. ।
২৯. ইবনে মাযাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ কাযভীনি (২০৯-২৭৩ হি. / ৮২৪-৮৮৭ ইং) : আস্-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৯ হি. / ১৯৯৮ ইং ।
৩০. মালেক : ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবী 'আমর ইবনে হারেছ আসবাহী (৯৩-১৭৯ হি. / ৭১২-৭৯৫ ইং) : আল মুআত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহইয়াউত আত তুরাসুল আরবিয়্যাহ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৫ খ্রি: ।
৩১. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি. / ৭২১-৮৭৫ ইং) : আস-সহিহ, বয়রুত, লেবানন, দারু ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি ।

৩২. মুনযরী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'দ (৫৮১-৬৫২ হি. / ১১৮৫-১২৫৮ ইং) আত তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৭ হি. ।
৩৩. নাসায়ী : আহমদ ইবনে মাআ'ঈব (২১৫-৩০৩ হি. / ৮৩০-৯১৫ ইং) : আস-সুনান, হালব, শাম, মাকতুবুল মাতবু'আত, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং ।
৩৪. আবু নাঈম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি. / ৯৪৮-১০৩৮ ইং) : হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং;
৩৫. হিন্দি : হুসামুদ্দীন, আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী (৯৭৫ হি.) : কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং ।
৩৬. হাইসামী : আবুল হাসান নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাজমাউজ যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ ইং ।
৩৭. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং) আল-মুসনাদ, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত্ তুরাস, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং ।
৩৮. আবু ইউসূফ : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে আনসারী (১৮২ হি.) : কিতাবুল আসার, সানগালা হাল, শেখপুরা, পাকিস্তান, আল মাকতাবুল আসারিয়া / বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ।
৩৯. শাফেয়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফেয়ী কারশী (১৫০-২০৪ হি. / ৭৬৭-৮১৯ ইং) : আল-মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ।
৪০. মুহাম্মদ ঃ ইমাম মুহাম্মদ হাসান শায়বানী ঃ কিতাবুল আসার ঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন ।

-ঃ শরহে হাদিস গ্রন্থ ঃ-

৪১. বদরুদ্দীন আইনী : আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা ইবন আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইউসূফ ইবনে মাহমুদ (৭৬২-৮৫৫ হি. / ১৩৬১-১৪৫১ ইং) : 'উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্র, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং ।
৪২. যুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে আল-ওয়ান মিসরী, আযহারী মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি. / ১৬৪৫-১৭১০ ইং) : শরহুল মু'আত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি. ।
৪৩. সুয়ূতি : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি. / ১৪৪৫-১৫০৫ ইং) : শরহুস সুনান ইবনে মাযাহ, করাচী, পাকিস্তান, ক্বদীমি কুতুবখানা ।
৪৪. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : ফাতহুল বারী বি শরহে সহীহুল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ ।
৪৫. কুস্তালানী : আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (৮৫১-৯২৩ হি. /

১৪৪৮-১৫১৭ ইং) : ইরশাদুস্ সারী শরহু সহীহিল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, ১৩০৪ হি. ।

৪৬. মুবারকপুরী : আবুল 'উলা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম (১২৭৩-১৩৫৩ হি.) : তুহফাতুল আহ্ওয়াযী বি শরহে জামে'উত তিরমিযী, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

৪৭. মোল্লা আলী ক্বারী : নুরুদ্দীন ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারভী হানাফী (১০১৪-১২০৬ ইং) : মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাফাতিহ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.

৪৮. মুনাভী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি. / ১৫৪৫-১৬২১ ইং) : ফয়জুল কাদির শরহিল জামেউস সগীর, মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি. ।

৪৯. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুরী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুম'আহ ইবনে হাযাম (৬৩১-৬৭৭ হি. / ১২৩৩-১২৭৮ ইং) : শরহুন নাওয়াভী আলা সহীহিল মুসলিম, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

-ঃ ফিকাহ ঃ-

৫০. ইবনে হাজর হায়তমী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হি. / ১৫০৩-১৫৬৬ ইং) : আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রকাতু 'আলা আহলির রাফদ্বি ওয়াদ্ব দ্বলালা ওয়ায যুনদাক্বা, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১৯৯৭ ইং ।

৫১. হাসকাফী : সদরুদ্দীন মূসা ইবনে যাকারিয়া (৬৫০ হি.) : মুসনাদুল ইমামিল আ'যম, করাচি, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা ।

৫২. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : আল কিফায়াহ্ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ্, মদীনা, সৌদি আরব, আল-মকতুবাতুল ইলমিয়া ।

৫৩. খাওয়ারযামী : আবদুল মু'আয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ (৫৯৩-৬৬৫ হি.) : জা'মিউল মাসানিদ লি ইমাম আবী হানিফা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

৫৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ : মুহাদ্দিস দেহলভী (১১১৪-১১৭৪ হি. / ১৭০৩-১৭৬২ ইং) : হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১৫ হি. / ১১৯৫ ইং;

৫৫. শা'রানী : আবুল মাওয়াহিব আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে আলী আনসারী শাফেয়ী (২১০-২৭৯ হি. / ৮২৫-৮৯২ ইং) : আল-মিযানুল কুবরা, কায়রো, মিসর, মাকতাবাই মুস্তফা, আল বাবীল হালবী, ১৩৫৯ হি. / ১৯৪০ ইং;

৫৬. ইবনে নুযায়ম মিসরী : যাইন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বকর হানাফী (৯২৬-৯৭০ হি.) : আল বাহরুর রায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ ।

৫৭. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী : রুদ্দুল মুখতার, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত ।

৫৮. ইবনে হাজার মক্কী (ওফাত ৭৯৪ হি.) : ফাতোয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ, মীর মোহাম্মদ কারখানা, করাচী, পাকিস্তান ।

৮৩. ইবনে তাইমিয়া (ওফাত ৭২৮ হি.) : মাজমাউল ফাতাওয়া : মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ।

-ঃ আসমাউর রিজাল ঃ-

৫৯. আহমদ্ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি. / ৭৮০-৮৫৫ ইং) : ফাদ্বায়িলুস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ ইং ।

৬০. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ ইং) আত্-তারীখুস সগীর : ক্বাহেরা, মিসর, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, ১৩৯৭ হি. ।

৬১. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি. / ৮১০-৮৭০ ইং) : আত্-তারিখুল কাবির, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

৬২. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি. / ৮৮৪-৯৬৫ ইং) : আস্-সিকাত, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্র, ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ ইং ।

৬৩. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

৬৪. যাহাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : তাযকিরাতুল হুফফায, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ।

৬৫. যাহাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : সীয়ারু আ'লামুন আন্-নুবালা, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৩ হি. ।

৬৬. সুবকী : তাজুদ্দীন ইবনে আলী ইবনে আবদুল কাফী (৭২৭-৭৭১ হি.) : ত্বকাতুশ শাফিআতিল কুবরা, হাজর লিত্ তাবাআতি ওয়ান নাশার, ১৪১৩ হি. ।

৬৭. সুয়ূতি : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি. / ১৪৪৫-১৫০৫ ইং) : ত্বকাতুল হুফ্ফায, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি. ।

৬৮. ইবনে 'আদী : আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুবারক, আবু আহমদ জুরযানী (২৭৭-৩৬৫ হি.) আল কামিল ফী মাআরিফাতি দ্বো'ফায়িল মুহাদ্দিসীন, কায়রো, মিসর, মাকতুবাতু ইবনে তাইমিয়া, ১৯৯৩ ইং ।

৬৯. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাকরীবুত তাহযীব, শাম, দারুর রশীদ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং ।

৭০. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাহযীবুত তাহযীব, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং ।

৭১. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : লিসানুল মিযান, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুল আলামী, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং ।

৭২. মিয্যী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি. / ১২৫৬-১৩৪১ ইং) : তাহযিবুল কামাল, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং ।

-ঃ সিরাত গ্রন্থ ঃ-

৭৩. আহমদ্ ইবনে হাম্বাল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি. / ৭৮০-৮৫৫ ইং) : ফাদ্বায়িলুস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ ইং ।

৭৪. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : দালায়িলুন নবুয়ত, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।

৭৫. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আয্ যুহদুল কাবীর, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুল কুতুবুছ ছাক্বাফিয়া, ১৯৯৬ ইং।

৭৬. জুরজানী : আবুল কাসেম হামযা ইবনে ইউসূফ সাহামী (৪২৮ হি.) : তারিখে জুরজান, বয়রুত, লেবানন, 'আ-লামুল কুতুব, ১৪০১ হি. / ১৯৮১ ইং।

৭৭. ইবনে জাওযী : আবুল ফরয আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবাইদুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি. / ১১৬-১২০১ ইং) : আল 'ইলালুল মুতানাহিয়া ফীল আহাদীসিল ওয়াহীয়্যা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি. ।

৭৮. ইবনে হাজর হাইতমী : আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হি. / ১৫০৩-১৫৬৬ ইং) : আল খায়রাতুল হাসান ফী মানাক্বিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা আন-নু'মান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৩ হি. / ১৯৮৩ ইং।

৭৯. হাসকাফী : সদরুদ্দীন মূসা ইবনে যাকারিয়া (৬৫০ হি.) : মুসনাদুল ইমামিল আ'যম, করাচি, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা।

৮০. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৮১. যাহাবী : শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : সীরুল ও আ'লামুন আন নুবালা, বয়রুত, লেবানন, মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৩ হি.;

৮২. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি. / ১৩০১-১৩৭৩ ইং) : আল বেদায়াতু ওয়ান বেদায়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪০১ হি. ।

-ঃ তাফসীর ও উলুমুল কোরআন ঃ-

৮৩. ইসমাঈল ইবনে কাসীর (ওফাত ৭৭৪ হি.) : তাফসীরে কুরআনুল আজীম : দারুল খায়ের, বয়রুত;

৮৪. আল্লামা মাহমুদ আলূসী (ওফাত ১২৭০ হি.) : রুহুল মা'য়ানী, এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান;

৮৫. ফিরযাবাদী : তাফসীরে ইবনে আব্বাস : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৮৬. ইমাম খাযেন (ওফাত : ৭৪১হি.) : তাফসীরে খাযেন, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৮৭. ইমাম কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী (ওফাত. ৬৮৫হি.) : তাফসীরে বায়যাভী, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত।

৮৮. আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : (ওফাত. ১১২৭ হি.) ঃ তাফসীরে রুহুল বায়ান : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত;

৮৯. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (ওফাত. ৬০৬হি.) : তাফসীরে কাবীর : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

(১ম খণ্ড সমাপ্ত)

সমাপ্ত

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১। ইলমে ত্বরিকত (তাসাওউফ শিক্ষার গুরুত্ব)।

২। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন (১ম খণ্ড)।

৩। রফে ইয়াদাইনের সমাধান (নামাযে বার বার হাত উত্তোলনের শরয়ি বিধান)।

৪। সহিহ্ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান।

৫। হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান।

৬। আমি কেন মাযহাব মানব ?

৭। পৃথিবীর সবচেয়ে ভুয়া তাহক্বীকারী আলবানীর স্বরূপ উন্মোচন।

৮। আকায়েদে আহ্লে সুন্নাহ (ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা।)

৯। ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন (১ম খণ্ড)।

১০। দেওবন্দী ও আহ্লে হাদিসদের দৃষ্টিতে নবীজি নূর।

লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন (২য় ও ৩য় খণ্ড)।

২। আহ্লে-হাদিসদের স্বরূপ উন্মোচন।

৩। রাসূল (দ.)'র নূরের সৃষ্টি নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান।

৪। আযানের আগে ও পরে সালাত ও সালাম।

৫। রাসূলের 'হাযির-নাযির' নিয়ে বাতিলদের গাত্রদাহ কেন?

৬। রাসূল (দ.)'র মেরাজ।

৭। ইসলাম ও প্রচলিত তাবলীগ জামাত।

৮। শরিয়তের দৃষ্টিতে আউলিয়ায়ে-কেরামগণের যেয়ারতে সফর।

৯। কোরআন সুন্নাহ্র আলোকে ঈদে-মিলাদুন্নবী মুসলমানদের সেরা ঈদ।

১০। কুরআন সুন্নাহের আলোকে শবে-ই বরাতে মর্যাদা।

১১। সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু মহানবি হযরত মুহাম্মদ (দ.)।

১২। শরিয়তের দৃষ্টিতে ফাতিহা কী ও কেন?

১৩। ফরয নামাযের পর মুনাজাত।

১৪। হানাফী ও আহ্লে-হাদিসের ২৫ টি মাসআলার বিরোধ মীমাংসা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ইমাম হাসান হোসাইন ইসলামিক পাঠাগার, ২১নং নারিন্দা, লেইন, ঢাকা। (০১৮১৭-০৩৬৫৬১)

মুহাম্মদিয়া কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আল-মদিনা প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। (০১৮১৯-৫১৩১৬৩)

তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয় মাদ্রাসা সংলগ্ন, চট্টগ্রাম।

রশিদ বুক হাউস, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা। (০১৭৭৮-৮৫২১৯০)

গাউছিয়া পাঠাগার, গাউছুল আযম জামে মসজিদ, শাহজাহানপুর, ঢাকা।

তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, মুহাম্মদপুর আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন, ঢাকা। (০১৮১১-৮৯৬৫০)

মুজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা। (০১১৯৯-৪৩৫৭৩৮)

প্রীণ ইসলামী লাইব্রেরী, চকবাজার, কুমিল্লা। (০১৯১৩-৯৭৯৮২১)